শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

ইতিপূর্বে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার' উপন্যাসে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের কাহিনী লিখিয়াছি। 'অশ্বত্থের অভিশাপ' সেই বংশেরই আর এক পর্বের কাহিনী।

এই কাহিনীর মানব-নায়ক জোড়াদীঘির সর্বজন, অন্য নায়ক এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ।

এই প্রাচীন বৃক্ষটি কাটিবার ফলে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম উজাড় হইয়া গেল—ইহাই উপন্যাসখানির বর্ণিত বিষয়। মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়া এক অখণ্ড সত্তা। একস্থানে আঘাত পড়িলে অন্যত্র ব্যথা লাগে, একের নাশে অপরের সর্বনাশ, ইহাই 'বক্তব্য বিষয়'। এই গ্রন্থকে কোনো ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের কাহিনী মাত্র মনে না করিলে বাধিত হইব।

উৎসর্গ

শ্রীসুরুচি দেবী-কে

১

একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্রকাণ্ড। প্রাচীন। পেশীবহুল তাহার প্রকাণ্ড প্রাচীন কাণ্ড ফুলিয়া ফুলিয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উর্ধ্বে উত্থিত। কাণ্ডটি কিছুদূর উঠিয়া, অনেকগুলি বলিষ্ঠ শাখায় বিভক্ত; আরও খানিকটা উঠিয়া শাখাগুলি আবার অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত; প্রশাখাগুলি অবশেষে অসংখ্য উপশাখায় পরিণত, আর সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করিয়া অজস্র শিষ-ওয়ালা মসৃণ পাতা একটু বাতাসের আভাস পাইবামাত্র থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে—পাতাল ফুঁড়িয়া আলোক-উদ্‌গ্রীব বাসুকির ফণা বহির্গত, তাহার সহস্র শীর্ষের সহস্র জিহ্বা মুক্ত আকাশের আলোকের জন্য, বাতাসের জন্য, জীবনের স্পর্শের জন্য লালায়িত।

অশ্বত্থ বৃক্ষটি যে কত প্রাচীন তাহা কেহ জানে না। সকলেই তাহাকে একইভাবে দেখিতেছে। প্রাচীনতম ব্যক্তিরাও তাহার কোনো পরিবর্তন দেখিতে পায় না। তাহারা তাহাদের পিতা-পিতামহের নিকটেও ইহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধির সংবাদ পায় নাই। পিতামহ ভীষ্মের মত এই বৃক্ষটি তাহার প্রসারিত ছায়ার তলে গ্রামটিকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আকাশ পৃথিবীর মতোই এই বৃক্ষটি সকলের দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয়, সকলের প্রশ্নাতীত, সকলে তাহাকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছে। তাহার অধিকার ও বয়সের প্রশ্ন কে করিবে? পিতামহের অধিকার ও বয়স লইয়া কি প্রশ্ন চলে।

পরিবর্তনবহুল ও ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবন অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তিতকে সমীহ করে, ভক্তি করে, একপ্রকার ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় সে অনুভব করে

শাশ্বতের প্রতি। আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্বত মানুষের কাছে ভীতি-ভক্তির আকর। অশ্বত্থ গাছটিও সেই শ্রেণীর। গ্রামজীবনের সে প্রধান প্রতিষ্ঠান। হিন্দু মুসলমান, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। এমন সম্ভ্রম, এমন সমীহা গ্রামের জমিদারগণও পাইবার কল্পনা করিতে পারে না। বৃদ্ধেরা প্রণাম করিয়া যায়, মুসলমানেরা সেলাম করে, অক্ষয়-তৃতীয়ার তিথিতে স্ত্রীলোকেরা নৈবেদ্য আনিয়া তাহার মূলে স্থাপন করে, কাণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেয়; মুসলমানেরা ইদের দিনে শির্নি আনিয়া দেয়, তাহারা বলে ওখানে প্রাচীনকালে কোনো পীরের দেহ সমাহিত। ষষ্ঠীপূজায় বালকেরা গাছে উঠিয়া নিশান বাঁধিয়া দেয়, মায়েরা বলে—দেখিস, সাবধান, পড়বি। ছেলেরা ভয় পায় না, হাসে; পিতামহের কোল হইতে কবে কে পড়িয়াছে? গাছটার অন্তরাত্মা যেন খুশি হইয়া উঠে। সে বালকদের ঘর্মিত ললাটে স্নিগ্ধপত্রের ব্যজনী দুলাইয়া বাতাস করিতে থাকে। আর এক পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ার দিনে। গ্রামের সবগুলি প্রতিমা এখানে আনিয়া সমবেত করা হয়, মেয়েরা ধান দূর্বা খই ছিটাইয়া সাশ্রুনেত্রে এক বৎসরের জন্য পার্বতীকে বিদায় দেয়। তাহারা কৌটা খুলিয়া খানিকটা সিঁদুর দেয় পার্বতীর পায়ে, খানিকটা দেয় অশ্বত্থের গুঁড়িতে, আবার সেই প্রসাদী সিঁদুর সযত্নে কৌটায় তুলিয়া নেয়, পরস্পরের সিঁথিতে ও কপালে সস্নেহে লিপ্ত করিয়া দেয়। সহস্রপত্র অশ্বত্থবৃক্ষ নিশ্চল। পিতামহ নিস্তব্ধভাবে পৌত্রীর স্বগৃহ-পরিত্যাগ দেখিতে থাকে। তারপরে বাহকেরা প্রতিমা বহন করিয়া নদীর ঘাটে চলিয়া যায়। শীতকালে ইহারই তলদেশে বসে পৌষের মেলা। কত যাত্রী, কত ক্রেতা বিক্রেতা, কী সে জনতা আর কোলাহল। গাছটি মনে মনে খুশি হইয়া উঠে। গ্রামের জীবনচক্র এই অশ্বত্থটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়।

আর ঋতু-চক্রেরও কেন্দ্র এই গাছটি। শীতান্তে পাতা ঝরিতে ঝরিতে অবশেষে আর একটি-পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। তখন শীর্ণ রিক্ত শাখা, প্রশাখা এবং উপশাখা একখানি প্রেতের জাল বুনিয়া আকাশে সঞ্চালিত করে ও দিনের সূর্য এবং রাতের চাঁদ ধরা পড়ে। ফাল্গুনের প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে

স্বচ্ছ সবুজের আভা দেখা দেয় শাখায় শাখায়—তারপরে শিল্পীর সমস্তগুলি রঙের ঘোড়দৌড় সুরু হইয়া যায় এবং অবশেষে চৈত্রের প্রারম্ভে একদিন দেখা যায় নূতন কিশলয়ের কচি লালের আভাসে বৃহৎ অশ্বত্থ নবোদিত অরুণের প্রভায় দিঙ্‌ মণ্ডল আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান। সহস্র পত্র, সহস্র শির অবনমিত করিয়া সারা দীর্ঘদিন থর থর ঝর ঝর সর সর মর মর সমীরিত, প্রকম্পিত এবং মর্মরিত। গুঁড়ির কোটরে শালিখ আর ময়নার বাসা। তাহাদের নবজাত শাবকের কচি ঠোঁটের আরক্ত আভাস নবীন পাতার গৌরবে উঁকি মারে। ডালে ডালে কাকের আশ্রয়। সন্ধ্যাবেলা তাহারা কা কা রবে ফিরিয়া আসে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। অপরাহ্ণের শেষে শাখাশ্রয়ী নিম্নমুখী বাদুড়ের দল দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে আহারান্বেষণে চলিয়া যায়—শেষ রাত্রে তাহারা একে একে ফিরিতে থাকে। সকালবেলা ছেলের দল জুটিয়া তাহাদের মুখচ্যুত বাদাম লইয়া কাড়াকাড়ি করে। রাত্রিবেলা শিয়ালের দল জোটে গাছের নীচে, শটি, ভাটি, আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে। তাহাদের শিবাধ্বনি দূর-দূরান্তের মাঠের শিবাধ্বনির প্রথম সঙ্কেত। অশ্বত্থের ঘন ছায়ার প্রলেপে বালকের দল জুটিয়া ডাণ্ডাগুলি খেলে, দূরের পথিক ক্ষণকাল জিরাইয়া লয়। বর্ষার ঘনশ্যামল পাতার রঙে একপোঁচ করিয়া পীতাভা মিশিতে মিশিতে শীতের প্রারম্ভে শুষ্ক পীত পত্র উত্তর বাতাসে খসিয়া খসিয়া ভাসিয়া যায়। অশ্বত্থের ঋতুচক্রের আবর্তন সমাপ্ত।

কিন্তু এই প্রাচীনের মজ্জায় মজ্জায় নবীনের কী রসপ্রবাহ। এই অশ্বত্থ একাধারে প্রবীণ ও নবীন। সে বুঝি ভীষ্মের মতোই ইচ্ছামৃত্যু। পিতামহ ভীষ্মের মতোই সে প্রবীণ তবু চিরকুমার। গ্রামের লোকের চোখে সে আর বৃক্ষ নয়—সে দেবতা। গ্রামটির নাম জোড়াদীঘি।

২

জোড়াদীঘির ছ'আনির কাছারিতে বড়ই গোল বাধিয়া গিয়াছে। এইমাত্র নায়েব যোগেশ ডাকঘর হইতে একখানি চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাকে

ঘিরিয়া জমারনবিশ, গুমারনবিশ প্রভৃতি আমলাগণ নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে —মাঝখানে খোলা চিঠিখানা পড়িয়া, কাহারো মুখে কথা নাই। হুঁকাবর্দার তামাক সাজিয়া আনিয়াছে—অন্যদিন তামাক লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, আজ সেদিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিল না, বেচারী ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা কল্কেতে সজোরে ফুঁ দিতেছে, কল্কের জলন্ত আভায় তাহার নাসিকাগ্র ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছে।

যোগেশ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল—এখন কি করা যায়?

কিন্তু কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় চুলের মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে লাগিল। পঞ্চানন জমারনবিশ। কি একটা কারণে তাহার ঘাড় দেহের সহিত শক্ত হইয়া জুড়িয়া গিয়াছে। সে ঘাড় ফিরাইতে পারে না, ঘাড় ফিরাইয়া কথা বলিতে হইলে সমস্ত দেহটাকে ফিরাইতে হয়। লোকে তাহাকে ঘাড়টান পঞ্চানন বলে। ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—ছোটবাবু যদি আসেন তবে তো বড়ই মুস্কিল।

বদ্যিনাথ গুমারনবিশ। তাহার বয়স অপেক্ষাকৃত কম। সে বলিল—না, না, হুজুরকে এই ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে দেওয়া যেতেই পারে না।

ম্যালেরিয়ার উল্লেখে সকলে যেন মুক্তির আভাস দেখিতে পাইল। যোগেশ প্রসন্ন হাসিতে বদ্যিনাথকে পুরস্কৃত করিয়া বলিল—ঠিক বলেছে বদ্যিনাথ, হুজুরকে এমন বিপদের মধ্যে কখনই আসতে দেওয়া যেতে পারে না।

ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—তবে সেই কথাই ভালো ক'রে লিখে দেওয়া যাক্।

তখন সকলে মিলিয়া যৌথ-অধ্যবসায়ে পত্ররচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

ব্যাপার আর কিছুই নহে। ছ'আনির জমিদার নবীননারায়ণ কলিকাতায় থাকেন। গ্রামে বড় আসেন না। সম্প্রতি তিনি পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, শীতের প্রারম্ভে গ্রামে আসিবেন। সেই সংবাদেই এই গোলযোগের সূত্রপাত। গ্রামত্যাগী জমিদার গ্রামে আসিলে কর্মচারিগণ বড়ই অস্বস্তি

অনুভব করে। কলিকাতা হইতে জমিদার টাকা চাহিয়া পাঠাইলে কোনো রকমে একখানা পত্রদ্বারা জানাইলেই হইল যে, হুজুর, এবার দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ, ফসল ভালো হয় নাই। তারপর নিজেদের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বন্যা, অজন্মা, পঙ্গপাল প্রভৃতি যে কয়টা ব্যাঘাত আছে তন্মধ্যে যে-কোন একটাকে বা সবগুলাকে 'রিকুইজিশন' করা চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি জমিদারবাবু আসিতে চান—তবে ম্যালেরিয়া আছে। কলিকাতাবাসী জমিদারের গ্রামের টাকার প্রতি লোভ থাকিলেও গ্রামের ম্যালেরিয়াকে বড় ভয়।

বদ্যিনাথ সকলের হইয়া কলম ধরিয়াছে—আর সকলে নিজ নিজ 'কনট্রিবিউশন' যোগ করিয়া দিতেছে। প্রথমে হুজুরের শ্রীচরণযুগলের মহিমা ও প্রবল প্রতাপের উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশে হুজুরের শুভাগমনের সম্ভাবনায় গ্রামস্থ ছোট বড় প্রজাসাধারণের আনন্দের সংবাদ দান করা হইল। হুজুরের কর্মচারিগণ যে তৃষিত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া আছে—সে উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইল না। তার পরেই আসিল 'কিন্তু', 'কিন্তু হুজুর, এদেশে ম্যালেরিয়ার বড়ই মহামার পড়িয়া গিয়াছে, যাহাকে ধরিতেছে তাহার আর রক্ষা নাই; ব্যাধির প্রারম্ভেই রুগীর চক্ষু জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া, জল জল হাঁকিতে হাঁকিতে রুগী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেছে, বদ্যিনাথের বাস্তবোচিত অবাস্তব বর্ণনায় লেখকবর্গেরই ভয় করিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চিন্ত হইল যে, এই পত্র পড়িবার পরে নবীননারায়ণ কিছুতেই আর আসিবেন না।

যোগেশ বলিল—বদ্যিনাথ, তোমার খাসা হাত। এমন লেখা শিখলে কোথায়?

বদ্যিনাথ মাইনার ইস্কুলে পড়িবার সময়ে গোরুর উপরে প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল।

ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—এবার কয়েকজন মৃত ব্যক্তির নাম লিখে দাও।

তখন সকলে মিলিয়া অনেকগুলি নাম বসাইয়া দিল—যাহাদের অনেকে

জন্মায় নাই, অনেকে বহুদিন হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছে—আর অনেকে এখনও সুস্থদেহে গ্রামে বিচরণ করিতেছে। তবে কিনা নবীননারায়ণ গ্রামে আসেন না, তাই তাঁহার ধরিবার উপায় নাই।

পত্ররচনা যখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে নীলাম্বর-খুড়া লাঠি ঠুক ঠুক করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রত্যহ বিকালে একবার করিয়া আসে—বেড়াইতেও বটে, আবার মাসিক বৃত্তির টাকার তাগিদেও বটে। অন্যদিন হুকা পাইতে তাহার বিলম্ব ঘটে—আজ আসিয়াই বেকার হুঁকাটি চাকরের হাত হইতে লইয়া লাঠিখানা দেয়ালের কোণে রাখিয়া ফরাসের একান্তে বসিল এবং দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া টান দিতে শুরু করিল। কিছুক্ষণ পরে হুঁকাটি পুনরায় চাকরের হাতে দিয়া নীলাম্বর সবলের দিকে তাকাইল এবং বুঝিল অভাবিত একটা কিছু ঘটিয়াছে। তখন দু'চারবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া শুধাইল, ব্যাপার কি? সবাই যে চুপ?

যোগেশ সমস্যার উল্লেখ করিল। সমস্তটা শুনিয়া নীলাম্বর বলিল—তবে শোনো।

এই বলিয়া সে আসন পরিবর্তন করিয়া জাঁকিয়া বসিল। নীলাম্বরের অনেকগুলি মুদ্রাদোষ ছিল। প্রথমত, সে কথা বলিবার সময় এক চক্ষু উন্মুক্ত ও অপর চক্ষু মুদ্রিত রাখিত। মুদ্রিত চক্ষুতে চিন্তা করিত, আর উন্মুক্ত চক্ষু দিয়া শ্রোতাদের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিত। দ্বিতীয়ত, সে কথা বলিবার সময় বাক্যের মাঝে মাঝে 'হুঁ' অব্যয়টি প্রয়োগ করিত। তৃতীয়ত, স্থানে স্থানে গীতার এক-আধ ছত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়া দিত, আজ শ্রীনীলাম্বর ঘোষ যাহা বলিতেছে, তাহা নূতন বা অদ্ভুত নয়, বহুকাল পূর্বে শ্রীভগবান্ তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ ও নিজের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্য অনুভব করিয়া সে একপ্রকার দৈব আনন্দ উপলব্ধি করিত। বসন্তের দাগ-কাটা কালো মুখ স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া নীলাম্বর বলিতে লাগিল—হুঁ, ওতেই যথেষ্ট হবে, ম্যালেরিয়ার কথা শোনবার পরে, হুঁ, আর কিছুতেই সে এদিক মাড়াবে না।

যোগেশ বলিল—কি জানি, কুইনাইন বেঁধে নিয়ে যদি আসে—

নীলাম্বর হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল—হুঁ, তাকে আসতে দেবে কে! বৌমা যে শহরের মেয়ে। সে একবার এই চিঠি দেখলে কি আর রক্ষা আছে? মনে নাই, 'ভবিষ্যামি যুগে যুগে?'

গীতার এই উক্তির সহিত নীলাম্বরের যুক্তি সহজবোধ্য না হইলেও শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হইল। গীতার এমনি মহিমা। বিশেষ, সকলের মনে পড়িয়া গেল, বধূমাতাঠাকুরাণী শহরের মেয়ে। তাহারই জন্য নবীননারায়ণ গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে—সেই শহরবাসিনীই এ যাত্রা নবীনের আগমনের অন্তরায় হইবে। এই আশ্বাসে তাহারা শহরবাসিনী বধূমাতাঠাকুরাণীর প্রতি ভক্তি মিশ্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিল। যদিচ ইতিপূর্বে সর্বদা তাহারা এই শহরবাসিনীকে অন্তরালে নিন্দা করিতে ছাড়িত না।

পত্র শেষ করিয়া যথোচিত শিরোনামা, 'মালিক ভিন্ন খুলিতে নিষেধ' খামের পশ্চাদ্দিকে সাড়ে চুয়াত্তর লিখিয়া তখনই ডাকঘরে প্রেরণ করা হইল। আজ নীলাম্বরের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। না চাহিতেই বৃত্তির টাকা সে পাইল। নীলাম্বর লাঠিখানা লইয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সকলেই যে যাহার বাড়ি চলিল। কেবল যোগেশের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচ খচ করিয়া বিঁধিতে থাকিল—কুইনাইন বেঁধে নিয়ে যদিই বা আসে? সে ভাবিতে লাগিল—ম্যালেরিয়ার চেয়ে আরো কিছু মারাত্মক কারণ লিখিলে কি ভালো হইত না?

৩

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অতর্কিতে একদিন নবীননারায়ণ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশ, পঞ্চানন প্রভৃতি কর্মচারীর দল শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অবিলম্বে তাহারা শঙ্কার উপরে হাসির যবনিকা টানিয়া হুজুরের শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া গদগদ বচনে জানাইয়া দিল যে, তাহারা দিবারাত্রি তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল।

নবীননারায়ণ তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—যাক্, তোমাদের তো ম্যালেরিয়ায় ধরেনি। ভালোই হয়েছে, তবু আমি কিছু কুইনাইন সঙ্গে এনেছি, দরকার হ'লে নিতে পারো।

গ্রামের বহু লোকে রক্তচক্ষু হইয়া ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে অথচ তাহারা দিব্য সুস্থ আছে—ইহা তাহাদের পক্ষে লজ্জার কথা ভাবিয়া তাহারা যখন ইতস্তত করিতেছে, বদ্যিনাথ বলিল—হুজুর, আমার খানিকটা কুইনাইন চাই, বাড়িতে সবাই শয্যাশায়ী।

যোগেশ ইতিপূর্বে বদ্যিনাথের লিপিচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিল, এখন তাহার বাগ্মিতায় ঈর্ষা বোধ করিয়া ভাবিতে লাগিল—ইস, কি ভুলই না হইয়া গেল, খানিকটা কুইনাইন চাহিয়া লইতে ভুল হইয়া গেল কেন?

কিন্তু নবীননারায়ণের আগমনে তাহার সমস্ত কর্মচারীই যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এমন বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাহার পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চাকর খানসামার দল মনে মনে খুশিই হইয়াছিল। গ্রামের লোকেও দুঃখিত হয় নাই। জমিদার বলিয়াও বটে, তা ছাড়া, সবাই নবীননারায়ণকে মনে মনে ভালোবাসিত; তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত, লেখাপড়া শিখিলে কি হয়, আমাদের ছোটবাবুর মনটা ভালো। নবীন যখন গ্রামে আসিতেন, দুঃস্থদের খাজনা মাপ দিতেন, কর্মচারীদের অবহেলায় যাহাদের পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতেন, যাইবার সময়ে চাকর-খানসামাদের মুক্তহস্তে বকশিশ দিয়া যাইতেন।

পরদিন সকালে নবীননারায়ণ যোগেশকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইলেন; লাঠিয়াল মিলন সর্দার লাঠি হাতে খানিকটা পিছনে পিছনে চলিল। নবীন গ্রামের মধ্যে বা গ্রামের চারিদিকে কোনোখানে অজন্মা বা ম্যালেরিয়ার কোনরূপ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তখন কার্তিক মাসের শেষ। মাঠে মাঠে আমন ধানের ক্ষেত শস্যভারে নত। কাটা শুরু হয় নাই, কিন্তু কাটিলেও চলে। চৈতালির ক্ষেতে মটর, মসুর, সরিষার ভূমিসংলগ্ন সবুজ প্রলেপ। শিশিরে ধরাতল সিক্ত, কুয়াশার মশারিখানা তখনো সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া যায় নাই। নদী

ও পুকুর পূর্ণপ্রায়। পুকুরে শাপলা, নদীতে জেলের নৌকা। অদূরে বিলের জল খাল বাহিয়া যেখানে নদীতে আসিয়া পড়িতেছে সেখানে মাছ ধরিবার জন্ম জাঙাল দেওয়া হইয়াছে, বাধাপ্রাপ্ত জলের একটানা গোঙানি কানে আসিতেছে।

নবীন চলিতে চলিতে বাজার, ইস্কুল ও সরকারী ডাক্তারখানা বাঁয়ে রাখিয়া নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নদীর মধ্যে কচুরিপানা জমিয়াছে। তাহার উপরে গোটা দুই বক এক-পায়ে বদ্ধ-দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে। কাছেই গোটা দুই পানকৌড়ি ক্ষণে ক্ষণে মাথা ডুবাইয়া দিয়া গভীরের রহস্য আবিষ্কারে মগ্ন। সমস্ত প্রকৃতি ফোটোগ্রাফের ভেজা প্লেটের মতো আবছা। নবীন অনেকক্ষণ সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। যোগেশ ভাবিতে লাগিল—এত কি দেখিবার আছে?

নবীন ফিরিবার সময় যে পথটা ধরিলেন তাহার পাশেই গ্রামের অশ্বত্থ-বৃক্ষটি। গাছটাকে নবীন অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু আজ যেন আবার নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। অনেকক্ষণ গাছটাকে আপাদমস্তক ও তাহার চারিধার নিরীক্ষণ করিয়া যোগেশকে শুধাইলেন—এটা কার এলাকা?

যোগেশ সোৎসাহে বলিল—আঁজ্ঞে হুজুরের। যোগেশের ভাবটা এমন, যেন সে সংবাদটা মাত্র দিল না, জমিখণ্ডও জমিদারকে উপহার দিল।

নবীন কেবল বলিল—ইস্ অনেকটা জমি পতিত পড়ে আছে।

যোগেশ বলিল—আঁজ্ঞে, অনেকটা বইকি, প্রায় তিন বিঘে। যোগেশ কিছু বাড়াইয়াই বলিল। আর কোন কথা হইল না। নবীন বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

নবীননারায়ণের ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। সে জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদার। একরূপ বাল্যকাল হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন। এরূপ অবস্থায় তাহার লেখাপড়া শেখা দূরে থাকুক, অল্প বয়সেই উচ্ছন্ন যাওয়া উচিত ছিল। গ্রামে থাকিলে, লেখাপড়া না শিখিয়া জাল-জুয়াচুরিতে পারদর্শী হইয়া

অত্যাচারী দুর্দান্ত জমিদার হইয়া উঠিত, আর শহরে গিয়া পড়িলে নৈশ অত্যাচারের ফলে অল্পদিনেই লিভার পাকিয়া চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাহাকে সাধনোচিত ধামে যাইতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে অদৃষ্টের এই দু-তরফা সাঁড়াশী-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। লেখাপড়ার ভূত যে কেমন করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিল, তাহা না জানে সে নিজে না জানে তাহার আত্মীয়স্বজন; কারণ জোড়াদীঘির জমিদার-বংশের ঘাড়ে কালে কালে অনেক প্রকার ভূত ভর করিয়াছে, ওই একটি আধুনিক ভূত ব্যতীত। জোড়া-দীঘির জমিদারদের মধ্যে সে-ই প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল এবং শত্রুমিত্রকে চমৎকৃত করিয়া সগৌরবে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে গ্রামের সহিত তাহার স্থায়ী যোগ ছিন্ন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম সে ভাবিত লেখাপড়া শেষ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, লেখাপড়া যখন শেষ হইল তখন দেখিতে পাইল গ্রামের সহিত তাহার রক্তের সম্বন্ধ থাকিলেও আত্মার সম্বন্ধ আর নাই। বিমাতা নগরীর ক্রোড়ে লালিত হইতে হইতে কখন্ আত্ম-অগোচরে বিমাতাকেই মাতার স্থান দিয়া ফেলিয়াছে। অথচ গ্রামের প্রতিও তার একটা অন্ধ আকর্ষণ আছে। সে মনে মনে অনুভব করে, ষড়ানন কার্তিকেয়ের মতোই সে একাধিক মাতার স্তন্যে লালিত।

এতৎসত্ত্বেও হয়তো একদিন সে গ্রামে স্থায়ীভাবে ফিরিত। কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক হইল তাহার পত্নী মুক্তামালা। মুক্তামালা শহরের মেয়ে। বিবাহের পরে গ্রামে যাইবার নাম শুনিয়া সে সভয়ে বলিয়া উঠিল—ওমা, সে আমি পারবো না। তাহার বড় দোষ দেওয়া যায় না। সে যে-সমাজের মানুষ তাহারা গ্রামের বর্ণনা পুস্তকে মাত্র পড়িয়াছে। তখনো গ্রামের নন্দন-কল্প দৃশ্য সিনেমায় দেখাইবার রেওয়াজ হয় নাই। মুক্তামালা তাহার আত্মীয়-পরিজনের মুখে শুনিয়াছে, গ্রামে গাছে গাছে সাপ, উঠানে সাপ, এমন কি খাটের পায়া বেষ্টন করিয়া সাপ বিরাজ করে; সে শুনিয়াছে, গ্রামে দিনে শিয়াল ডাকে, রাত্রে কাক; সেখানে কেবল জল কাদা খাল বিল বাঘ ভালুক চোর ডাকাত আর ছোটলোক। কাজেই তাহার পক্ষে ভীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে

যখন গ্রামে যাইতে রাজি হইল না, অগত্যা নবীনকেও স্থায়ীভাবে শহরে বাস করিতে হইল। কিন্তু রক্তের মধ্যে সর্বদা সে জোড়াদীঘির আহ্বান শুনিতে পাইত।

৪

নবীন মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, অশ্বত্থ গাছটাকে কাটিতে হইবে। গাছটার প্রতি তাহার যে কোন আক্রোশ ছিল তাহা নয়—কিন্তু ওই গাছটা অযথা তিন তিন বিঘা জমি অনাবাদী করিয়া রাখিয়াছে। গাছটা কাটিলে তিন বিঘা জমি উঠিবে। তাহার কিছু আয় বৃদ্ধি হইবে সত্য—কিন্তু ততোধিক সত্য, লোকের অন্নকষ্ট খানিকটা লঘু হইবে। সে সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিল, শুধু এই গাছটা নয়, তাহার বিস্তৃত জমিদারির মধ্যে যেখানে যত বড় গাছ ও জঙ্গল আছে ক্রমে ক্রমে সব কাটিতে হইবে, খাস পতিতগুলিকে হলযোগ্য করিয়া প্রজার আয়ত্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে প্রজাদের আয় বাড়িবে, জমিদারের খাজনা বাড়িবে—সকল পক্ষেরই মঙ্গল। দেশের জন-বৃদ্ধির তাল খাদ্য-বৃদ্ধির তালকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—দেশের পক্ষে ইহা একটা গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যা খাতায়পত্রে তাহাকে অনেকদিন হইল পীড়িত করিতেছে—আজ সেই পীড়ন সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে লাগিল। নবীননারায়ণ অর্থনীতির ছাত্র, ওই সূত্রেই সে এম্‌-এ পরীক্ষার চৌকাঠ লঙ্ঘন করিয়াছে।

তাহার এত সহজে অশ্বত্থ গাছটা কাটিবার সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় জোড়াদীঘির প্রতি তাহার একপ্রকার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের ইতিহাস ও ভাববস্তুর সহিত তাহার আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ কাটিবার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিত না। সে বিকালবেলা যোগেশকে ডাকাইয়া তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিল। মনিবের সঙ্কল্প শুনিয়া তাহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না, পাশের দেয়ালে ঠেসান দিয়া কোনমতে সে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ যদি তাহাকে বলিত যে, জমিদার তাহার মুণ্ডুটি স্কন্ধচ্যুত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাতেও সে এত

বিস্মিত হইত না, কারণ চাকুরি আরম্ভ করিবার সময়েই মনে মনে সে মুণ্ডুটা জমিদারের উদ্দেশে দান করিয়া রাখিয়াছে। যোগেশ কোনো কথা বলিল না দেখিয়া নবীন মনে করিল যে তাহাদের কোনো আপত্তি নাই, তাই সে সংক্ষেপে বলিল—যাও, গিয়ে করাতি ঠিক ক'রে ফেলো। এই বলিয়া পুনরায় সে এগাথা ক্রিষ্টির নবতম কাহিনীর প্রবল স্রোতে আত্মবিসর্জন করিল।

যোগেশ কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারিতে আসিয়া ঢুকিল। তাহার কম্পনে কেহ আর বিশেষ উদ্বেগ বোধ করে না, যেহেতু সে সর্বদাই কোনো না কোনো কারণে কাঁপিতেছে—হয় জ্বরে, নয় ভয়ে, নয় ব্রাহ্মণীর প্রতাপে। কিন্তু আজিকার কম্পনে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যদিন বুকের কাঁপুনি কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখের বকুনিতে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু আজ সে বকুনি কোথায়? অনেকক্ষণ যখন সে নীরব হইয়া থাকিল তখন ঘাড়টান পঞ্চানন তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইবার উপলক্ষে সমস্ত দেহ-কাঠামখানাকে ফিরাইয়া শুধাইল, নায়েব, ব্যাপার কি?

যোগেশ কথা বলে না। তখন সকলে মিলিয়া সাধাসাধি শুরু করিলে যোগেশ সভয়ে মৃদুস্বরে নবীনের সঙ্কল্প সকলকে জ্ঞাপন করিল। কথাগুলি সে অতি মৃদু স্বরে বলিল, পাছে বাহিরের আকাশ বাতাস শুনিতে পায়। তাহার কথা শুনিবামাত্র কর্মচারীদের হাতের কলম আপনি খসিয়া পড়িল, তাহাদের উন্মুক্ত মুখ বন্ধ হইল না, কাছারি নীরব, মাছি দুটার ভনভনানি শ্রুত হইতে লাগিল, তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও কুইনাইনের প্রতিক্রিয়ার মতো ভন ভন করিতে লাগিল, বাক্‌পটু বদ্যিনাথ কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময়ে নীলাম্বর ঘোষ লাঠি ঠুক ঠুক করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। দেয়ালের কোণে লাঠিগাছকে যথাস্থানে রাখিয়া ফরাসের একান্তে বসিয়া ধূমায়মান হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। কেহ কোনো কথা না বলাতে এবং হুঁকার কোনো দাবীদার না থাকাতে সে একমনে তাম্রকূট সেবনের অবকাশ পাইল—এমন অবকাশ জীবনে অল্পই মেলে। নেশা জমিয়া উঠিলে আর কল্কের আগুন নিভিয়া আসিলে সে মনে মনে একপ্রকার উদারতা অনুভব করিয়া হুঁকাটি সকলের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—নাও। কিন্তু কেহই

হুঁকা লইবার তৎপরতা দেখাইল না। তখন সে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—শুনেছো, শশাঙ্কর কীর্তি? টোলে এসেছে, কোথায় লেখাপড়া করবে না ছাই—ওপাড়ার গোয়ালছুঁড়িটার সঙ্গে—

কিন্তু ওপাড়ার গোপবালার সহিত শশাঙ্কর রহস্যভেদের আগ্রহ কেহই প্রকাশ করিল না। টোলের ছাত্র শশাঙ্ক গ্রামের আলোচনার একটি রহস্যময় ব্যক্তি, কিন্তু আজ তাহাতে কাহারো আগ্রহ নাই। তখন বিস্মিত নীলাম্বর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিল—তোমাদের হ'ল কি? এবার সে দুইটি চোখই খুলিয়াছে, এতক্ষণে কেবল এক চোখে পর্যবেক্ষণ চলিতেছিল।

ভগ্নজানু দুর্যোধনের পার্শ্ববর্তী অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের মতো অর্ধশায়িত যোগেশের পাশে পঞ্চানন ও বদ্যিনাথ নীরব। তখন নীলাম্বর আবার প্রশ্ন করিল—তোমাদের হ'ল কি?

সকলকে নীরব দেখিয়া অগত্যা সে ব'লিল, তবে যাই একবার ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। সে যখন উঠিতে যাইতেছিল তখন যোগেশ নীরবতা ভঙ্গ করিল, বলিল—খুড়ো, একটু ব'সে যাও।

নীলাম্বর বসিল। তখন যোগেশ ভয়ে রাগে, খেদে দুঃখে মিলাইয়া তাহাদের নীরবতার কারণ তাহাকে জ্ঞাপন করিল। সে যাহা শুনিল তাহা কল্পনারও অতীত। এতক্ষণে সে তাহাদের বাক্যহীনতার মর্ম বুঝিল—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলিবার আর কি থাকিতে পারে?

বদ্যিনাথ বলিয়া উঠিল—দেখবেন, এ গ্রাম উচ্ছন্ন না গিয়ে পারে না, শেষে কিনা বুড়ো অশথে হাত! এর চেয়ে যে দশানির বড়বাবু অনেক ভালো।

নীলাম্বর তাহার মতকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজার গুণে ভালো। বড়বাবু অবশ্য জাল, মিথ্যা মামলা, খুন জখম, ঘর জ্বালানো মাঝে মাঝে করেন, কিন্তু জমিদারি রাখতে গেলে ওসব করতে হয়। কিন্তু অশ্বত্থ গাছে হাত দেবার সাহস তাঁরও নেই।

তারপরে সে ছোটবাবুর চরিত্রের সমস্ত দোষ ইংরাজি বিদ্যার ঘাড়ে

চাপাইয়া বলিল—আসলে ইংরাজি পড়াটা কিছু নয়, আমি কতবার বলেছি যে ইংরাজি পড়েই দেশটা গেল।

এবারে নীলাম্বর ঘোষ কিছু ন্যুনোক্তি করিল। ইংরাজি বিদ্যার বিরুদ্ধে সে কেবল মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে নিজেও ইংরাজি পাঠ লয় নাই, ছেলে দুটিকেও ইংরাজি শিখিতে দেয় নাই। এখন তাহারা বড়বাবুর জাল ও মিথ্যা মামলার প্রধান সাক্ষী। ছেলে দুটির ইংরাজি জ্ঞানের অভিশাপ হইতে মুক্ত উন্নত চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত পিতার বসন্তের-দাগ-কাটা কালো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিব্রত যোগেশ বলিল—ছোটবাবুর হুকুম করাতি জোগাড় করবার—এখানে আমি ও কাজের জন্য করাতি পাবো কোথায় ?

বদ্যিনাথ বলিল—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম ক'রে আনাতে বলো।

তাহার কথায় এত দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর বদ্যিনাথকে সমর্থন করিয়া বলিল—হুঁ, করাতিরা তো ইংরাজি পড়েনি, হুঁ, যে এমন কাজ করতে রাজি হবে।

পঞ্চানন এতক্ষণ নীরব ছিল। এবারে সে বলিল—ছোটবাবুর যে রোখ, হয়তো নিজেই গিয়ে কুড়ুল ধরবে।

নীলাম্বর সরোষে এবং আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল—ধরুক না একবার···

আবেগের প্রচণ্ডতায় তাহার কাশি আসিল—খক্ খক্ খক্। অধিক কথা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু আবেগের সহিত মিলাইয়া লইলে ওইটুকুই যথেষ্ট।

খক্ খক্ খক্—কাশি আর থামিতে চায় না। নীলাম্বরের একটা পৈতৃক কাশি ছিল, বিনা চিকিৎসায় সে সযত্নে পুষিয়া রাখিয়াছে।

খক্ খক্, 'বৃক্ষাণাং অশ্বত্থোঽহং' – হাক্ থুঃ—যুগপৎ তাহার কণ্ঠাভ্যন্তর হইতে অনেকটা কাশির ও গীতার অর্ধজীর্ণ একটা শ্লোকাংশ বাহির হইয়া আসিল। তখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করিল—হুঁ।

এবারে সে উঠিয়া পড়িল। বলিল—নাঃ এমন ম্লেচ্ছের বাড়িতে আসাও পাপ।

নাড়া খাইয়া তাহার পকেটে গোটা তুই টাকার শব্দ হইল। এ সেই ম্লেচ্ছদত্ত বৃত্তির অবশিষ্ট।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে যোগেশের মনে হইল, এখনো যে সংসার টিকিয়া আছে তাহা ওই নীলাম্বর ঘোষের মতো লোক আছে বলিয়াই। আর একই বিধাতা নীলাম্বর ও নবীননারায়ণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ভাবিয়া সে একপ্রকার দার্শনিক বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিল।

আজ বৃহস্পতিবার, জোড়াদীঘির হাটবার। বিকালের দিকে হাটতলায় ক্রেতা-বিক্রেতার সমাবেশ হইয়াছে। চারিপাশের গ্রাম হইতে লোকে ডালা ভরিয়া তরিতরকারি আনিয়াছে; জেলেরা মাছ আনিয়াছে, অধিকাংশই বিলের কই এবং মাগুর; দূরের গ্রাম হইতে চাষীরা বস্তাবন্দী চাল আনিয়াছে—পুরাতন চাল, নতুন চাল এখনো ওঠে নাই; শহর হইতে কয়েকখানি খেলনা ও মনোহারির দোকানও আসিয়াছে। বাজারে কয়েকখানি ছোটবড় স্থায়ী দোকান আছে। দোকানীরা নিজ নিজ দোকানের জিনিসগুলি ভালো করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে—ক্রেতার দৃষ্টি যাহাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখনো কেনা-বেচা পুরা দমে শুরু হয় নাই।

ভজহরি সাহার দোকানের কাছে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। শহর হইতে গাড়ি বোঝাই দিয়া চাল, ডাল, নুন, তেল ও চিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সমস্ত জিনিস নামানো হইয়াছে, কেবল একটা চিনির বস্তা কেমন করিয়া যেন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। বস্তায় প্রায় আড়াই মণ চিনি আছে। অনেক চেষ্টাতেও বস্তাটিকে দোকানঘরে তোলা যাইতেছে না। আর যাইবেই বা কেমন করিয়া? সকলেই পরামর্শ দিতেছে, কাজে বড় কেহ অগ্রসর হইতেছে না। কেহ বলিতেছে ঠেলিয়া তোলো, কেহ বলিতেছে কাটিয়া তোলো, কেহ কেহ বা শুধুই বিলাপ করিয়া বলিতেছে—ভিজিয়া সব সরবৎ হইয়া গেল। বাস্তবিক জায়গাটা কর্দমাক্ত, বস্তার নীচের দিকটা ইতিমধ্যেই ভিজিয়া

উঠিয়াছে। পরামর্শের সিকিভাগ কাজ হইলে বস্তা এতক্ষণ ঘরে উঠিত। বৃদ্ধ ভজহরি সাহা নিকটে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া আছে। সে অনেকক্ষণ ঘোষণা করিয়াছে, যে বা যাহারা চিনির বস্তা দোকানে তুলিয়া দিতে পারিবে তাহাদের পেট ভরিয়া সন্দেশ খাওয়াইবে। তবু কেহ অগ্রসর হয় নাই। সন্দেশ তাহারা সকলেই কখনো না কখনো খাইয়াছে—কিন্তু আড়াই মণ চিনি জলে ভিজিলে কি পদার্থ হয় কখনো দেখে নাই, কাজেই বস্তা উদ্ধারে তাহাদের বড় উৎসাহ নাই।

এমন সময় কানু ঘোষ ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিল, শুধাইল—কি হয়েছে ?

ভজহরি বলিল—বাবা কানু, আড়াই মণ চিনি গেল।

কানু স্বাভাবিক স্বরে বলিল—তোলোনি কেন ? কানুর কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তুলবে কে ? বাবা, আড়াইমণি বস্তা, ওকি তোমার আমার কাজ !

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল—না বাবা, চিনির বলদ হওয়া আমাদের সাধ্য নয়। কানুর মুখে একবার হাসির আভা ফুটিল, কিন্তু তখন হাসির সময় নয়। সে গামছাখানা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—সা মশায়, ভয় নাই।

ভজহরি বলিল—বাবা, একটু কষ্ট ক'রে বস্তাটা তুলে দাও, পেট ভরে সন্দেশ খাইয়ে দেবো।

কানু বলিল—আর-একজন কেউ এসো তো।

কিন্তু কেহই আগাইল না। কেনই বা আগাইবে ? একজন লোককে একাকী আড়াইমণি বস্তা তুলিতে তাহারা কখনো দেখে নাই—সে সুযোগ তাহারা নষ্ট করিতে মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

ভজহরি ব্যাপার দেখিয়া বলিল—বাবা কানু, তুমি একা পারবে না কি ?

পারবো বই কি—বলিয়া কানু প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বাস্তবিকই কানু ঘোষ পারিবে। ও-রকম জোয়ান জোড়াদীঘিতে আর দ্বিতীয়টি নাই। তাহার বয়স বছর পঁচিশ; কালো দেহ পাথর কুঁদিয়া কাটা;

পেশীবহুল দেহ মেদবাহুল্যবর্জিত; লোহার শাবলের মতো দুই বাহুর দার্ঢ্য। সে ঈষৎ নত হইয়া বস্তার দুটি কোণ ধরিল—জনতা ফাঁক হইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন সে সবলে বস্তা ধরিয়া গোটা দুই ঝাঁকানি দিয়া একটানে পিঠের উপরে তুলিয়া ফেলিল। জনতার আশা সফল হইল—কিন্তু একটু আশাভঙ্গও যে হয় নাই এমন বলা যায় না। তাহারা আশা করিতেছিল বস্তা-চাপা পড়িয়া কানুর একটা দুর্দশা হইবে, তেমন কিছুই ঘটিল না। আশাভঙ্গের দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া জনতা কানুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সে এক পা দুই পা করিয়া দোকানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমন সময়ে হঠাৎ একটি ঘটনায় সমস্ত ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত পথে মোড় ঘুরিয়া গেল। ভিড় ঠেলিয়া বিজয় বৈরাগী প্রবেশ করিল এবং কানুকে ওই অবস্থায় দেখিয়া বলিল উঠিল—বাবা, গোয়ালাদের কানু এবার দেখছি গোবর্ধন ধারণ করেছে! তাহার মন্তব্যে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কানুর কষ্ট-পেষিত মুখমণ্ডলের পেশীতে হাসির তরঙ্গ দেখা দিল। সে বস্তার ভার বিস্মৃত হইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কানুর হাসি শুনিবামাত্র জনতা দূরে সরিয়া গেল। কানু কোনো রকমে বস্তাটা ভজহরির দোকানের বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হো হো হা হা হী হী আর থামিতেই চায় না। হাসির সঙ্গে তাহার হাত পা ছুটিতে আরম্ভ করিল—যাহাকে পাইল কিল চড় লাথি বসাইয়া দিল। কানুর ওই এক মুদ্রাদোষ। বিজয় বৈরাগী সরিবে সরিবে করিতেছিল—কিন্তু তার আগেই কানু তাহার উপরে গিয়া পড়িল—বলিল—তবে রে বাইসিকেলের বৈরাগী······হো হো হো হা হা······কিল, চড়, লাথি······

ম'লাম, বাবা, ম'লাম, কানাই হয়ে তুই বৈরাগী বধ করবি···

কানুর হাসি আরো বাড়িয়া যায় এবং সে অধিকতর উৎসাহে হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করে।

অবশেষে বিজয় কোনো রকমে কানুর কবলমুক্ত হইয়া সবেগে দৌড় মারিল।

২

বৈরাগীর চিমটা ঝুলি পড়িয়া রহিল, তাহার দীর্ঘ চুল খুলিয়া গিয়া বাতাসে উড়িতে লাগিল; কানু পিছে পিছে ছুটিল।

কানুর মস্ত একটা মুদ্রাদোষ ছিল এই যে, হঠাৎ হাসি পাইলে যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহাকে মারিতে শুরু করিত—কিল চড়, লাথি; তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না; আর তাহার সবল দেহের আঘাতে অনেক সময়ে আহত ব্যক্তির সকল প্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। গ্রামের লোকে পারৎপক্ষে তাহাকে না হাসাইতে চেষ্টা করিত, কিংবা সে হাসিতে আরম্ভ করা মাত্র দূরে সরিয়া যাইত। আবার কানুরও এমন অভ্যাস যে, অল্প কারণেই তাহার হাসি পায়। কানুর হাসি গ্রামের এক সমস্যা।

কানু ছুটিতেছে আর বলিতেছে—তবে রে বাইসিকেলের বৈরাগী—বেটার পায়েই যেন বাইসিকেলের গতি।

বিজয় বৈরাগী এক সময়ে সংসারী ছিল। তখন সে খেলনা বিক্রয় করিত, শহর হইতে নূতন নূতন মনোহারি জিনিস আনিয়া বেচিত; একবার গাঁয়ের মেলাতে ছায়াবাজি আনিয়া দেখাইয়া বেশ দু'পয়সা কামাইয়াছিল। তারপরে কেন জানি না হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া সে বৈরাগী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং ভিক্ষার সৌকর্যার্থ সে একখানা পুরাতন সাইকেল কিনিয়া ফেলিল। সাইকেলের ভিক্ষুক একটা নূতন ব্যাপার। ইহাতে ভিক্ষার হাঁটাহাঁটি যেমন সহজ হইয়া গেল, ভিক্ষার পরিমাণও তেমনি বাড়িল। সাইকেল হইতে নামিয়া ভিক্ষা চাহিলে না দিয়া পারা যায় না, এবং পদাতিক ভিক্ষুকের চেয়ে তাহাকে কিছু বেশিই দিতে হয়; সম্প্রতি সাইকেলখানা তাহার গিয়াছে কিন্তু খ্যাতিটা এখনো যায় নাই।

এদিকে কানুর তাড়া খাইয়া বিজয় বৈরাগী দিক্‌-বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে হাটের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছিল এবং কি করিতেছে বুঝিবার আগেই একজন লোকের ঘাড়ে গিয়া পড়িল—

—পাষণ্ড কোথাকার—

বিজয়.মুখ তুলিয়া দেখিল. টোলের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্য বলিতে লাগিলেন, পাষণ্ড কোথাকার! আর একটু হ'লেই পদস্খলন ঘটেছিল আর কি···

দূর হইতে বিজয়ের নূতন দুরবস্থা দেখিয়া কানু থামিল, বলিল, বেশ হয়েছে, বেটা এবার কেশরীর মুখে পড়েছে।

সারদা ভট্টাচার্যের মুখে ও মাথায় প্রচুর চুল, দাড়ি ও গোঁফের সমাবেশের জন্য গাঁয়ের লোকে আড়ালে তাঁহাকে কেশরী বলিত।

বিজয় বলিতেছে, দোহাই বাবাঠাকুর, আমি ইচ্ছে ক'রে পড়িনি।

ভট্টাচার্য বলিলেন, না, আমিই ইচ্ছে ক'রে তোমার স্কন্ধে গিয়ে পড়েছি, কেমন?

ভট্টাচার্য বাক্যের মাঝে মাঝে এক আধটা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া গৌড়ীয় ভাষাকে শোধন করিয়া লন।

বিজয় বলিল—বাবাঠাকুর, কানুকে জানো তো? তারই হাসির তাড়ায় আমি তোমার ঘাড়ে এসে পড়েছি। বুড়ো অশথের শপথ ক'রে বলছি বাবা, এই হচ্ছে গিয়ে সত্যি কথা—নইলে আমি কেন—

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না, বুড়ো অশ্বত্থের নাম শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—পাষণ্ড, নাস্তিক, বেটা ইংরাজি পড়া কালাপাহাড়···

এসব অভিধা নিজের বিরুদ্ধে ভাবিয়া বিজয় বলিল—সত্যি বাবা, বুড়ো অশথের শপথ—আমি ইংরিজি পড়িনি—

ভট্টাচার্য বলিয়া উঠিলেন—বুড়ো অশথ! অশথের দোহাই আর দিতে হবে না। আর এক মাস পরে ওখানে তিসির চাষ হবে। সেই তিসির তেল যাবে বিলেতে—সাহেব বিবিরা খানা খাবে!

তিসির তেল যে সাহেব বিবিদের খানার উপকরণ ইহা বিজয়কে বিস্মিত করিলেও কি করিয়া অশথ গাছে তিসি ফলিবে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ভট্টাচার্য আপন মনে বক বক করিতে করিতে জগু সরকারের দোকানে প্রবেশ করিলেন।

জগু সরকার মহাজন ও ব্যবসায়ী। বাজারের মধ্যে তাহার দোকানখানিই সবচেয়ে বড়। লোকটার দেবে-দ্বিজে ভক্তি যেমন প্রবল, দেনদাবের সঙ্গে ব্যবহার তেমনি নির্মম; কণ্ঠী ও তিলকে যেমন সে উদার, হিসাবপত্রে তেমনি সে সূক্ষ্ম। লোকটা অতিশয় ধূর্ত, সবাই তাহাকে ভয় করে। এমন লোক বেশি কথা বলে না, জগু সরকার স্বল্পভাষী। লোকটা অজীর্ণের রুগী, আহার অত্যন্ত পরিমিত, তন্মধ্যে সাগু বার্লির ভাগই বেশি। বোধ করি, তজ্জন্য সে দুঃখিত নয় খরচ কম হয় বলিয়া সে খুশিই। শুষ্ক আমশির মতো লোকটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেবল চোখ দুইটি রোগের তাড়নায় ও লোভের জ্বালায় উজ্জ্বল।

জগু সরকারের ফরাসের উপরে যোগেশ, ঘাড়টান পঞ্চানন এবং নীলাম্বর ঘোষ বসিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলিতেছিল। জগু নিজেও ছিল বটে, তবে সে চুপ করিয়া ছিল, কারণ তাহার ধারণা অপব্যয়ের সূত্রপাত বাক্য হইতেই শুরু হয়। পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় তাহারা আরো দু'এক জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যোগেশ বলিল—আমি এখন করাতি পাই কোথায়? চারদিকে লোক পাঠিয়েছিলাম, কেউ রাজি নয়।

নীলাম্বর এক চোখ বুঁজিয়া উত্তর করিল—হুঁ, লোকের মনে এখনো দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে। হুঁ, সবাই তো কলেজে পড়েনি।

তারপরে একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলিল—গাছ তো গাছ মাত্র নয়, যে-কাঠে জগন্নাথ মূর্তি সৃষ্টি, গাছ হচ্ছে সে-ই কাঠ।

জগন্নাথের উল্লেখে জগু সরকার একবার মাথায় হাত ঠেকাইল।

এমন সময় সারদা ভট্টাচার্য প্রবেশ করিলেন। বিজয়ের হঠকারিতায় তিনি ক্রুদ্ধ; তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয়, বিশ্বজগতের উপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

জগু বলিল—বসতে আজ্ঞা হোক ঠাকুর মশাই।

যোগেশ বলিল—দেরি হল যে?

ভট্টাচার্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন—ত্বরাতেই বা কি আবশ্যক। আজ অশথ যাবে, কাল হরিবাড়িটা, পূজাপার্বণ তো গিয়েছেই—

নীলাম্বর সুযোগ বুঝিয়া বলিল—হুঁ, 'একবর্ণা ভবেৎ পৃথ্বী।'—

—ভবেৎ কেন? ঘট্‌তে আর অবশিষ্ট কি? শেষে কিনা বিজয় বৈরাগী বেটা আমার দেহের উপরে এসে পড়ল।—এই বলিয়া তিনি ঘটনাটাকে সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন।

ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—ওটা ইচ্ছে ক'রে করেনি।

—না, ইচ্ছে ক'রে নয়! এর পরে বল্‌বে ছোটবাবু অশ্বত্থবৃক্ষও ইচ্ছে ক'রে কর্তন করেনি।

পঞ্চানন বলিল—এখন আপনারা পাঁচজন এসেছেন, যাতে এই অধর্ম না হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া শুধাইলেন—ভজহরি কই?

যোগেশ তাহার অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করিয়া বলিল—খবর পাঠিয়েছে, এখনই আস্‌ছে।

সত্যই দু'এক মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধ ভজহরি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভজহরি বৃদ্ধ হইয়াছে—তবুও তাহার একহারা সরল দেহ এখনো বেশ সতেজ। লোকটি ব্যবসায়ী হইলেও গ্রামে তাহার সাধুখ্যাতি আছে। গ্রামের সকলেই মায় জমিদারগণ অবধি তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে।

ভজহরি আসিয়া ভট্টাচার্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ফরাসের একান্তে বসিল।

নীলাম্বর প্রশ্নের সূত্রপাত করিয়া বলিল—হুঁ, এবার সবাই মিলে একটা সমাধান করুন। এমন কাজ কখনো হ'তে দেওয়া যায় না।

ভজহরি বলিল—ছোটবাবুকে একবার বুঝিয়ে বল্‌লেই—

তাহার বাক্য শেষ হইবার আগেই নীলাম্বর বলিল—অসম্ভব।

ভজহরি নিজের তর্কের সূত্র না ছাড়িয়া বলিল—তাঁকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে কি ?

নীলাম্বর বলিল—তা হয়নি বটে, কিন্তু বাবা সে গুড়ে বালি।

—কেন ? ছোটবাবু লেখাপড়া জানা লোক, বুঝোলে তিনি কি বুঝবেন না ?—ভজহরি বলিল।

সারদা ভট্টাচার্য একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অস্যার্থ বলিয়া বুঝাইয়া বলিল—অজ্ঞকে বোঝানো যায়, বিজ্ঞকে বোঝানো যায়, কিন্তু যে নরাধম জ্ঞানের কণামাত্র পেয়েছে ব্রহ্মারও সাধ্য নয় তাকে বোঝানো।

ভজহরি বলিল—না হয় তো না হবে, কিন্তু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

নীলাম্বর অগ্রসর হইয়া বলিল—হুঁ, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? সে এরূপ সমাধান আশা করে নাই। তাহার ইচ্ছা ব্যাপারটা লইয়া একটা ঘোঁট পাকাইয়া উঠিবে, আনাগোনা শলা-পরামর্শ, বাগ্‌বিতণ্ডা চলিবে, আর সকলে মিলিয়া সেই উত্তাপে হাত-পা সেঁকিতে থাকিবে—ইহাই ছিল তাহার আশা। কিন্তু সবসুদ্ধ ব্যাপারটা কেমন যেন আপোষের পন্থা ধরিল। তাই তাহার অপ্রসন্নতা।

কিন্তু ভজহরির কথা কেউ ঠেলিতে পারে না, বিশেষ কথাটায় যুক্তিও আছে।

আলোচনা যখন এই অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, যোগেশ বলিল—তাহলে ঠাকুর মশাই, আপনি গিয়ে কাল একবার ছোটবাবুকে—

এইবার জগু নীরবতা ভঙ্গ করিল—সে বলিল, ভজহরি দাদার যাওয়াই উচিত।

যোগেশ পুনরায় বলিল—বেশ, সঙ্গে ভজহরি দাদাও যাবেন।

জগু বলিল—না, ভজহরি দাদা একাই যাবেন।

জগু বেশি কথা বলে না—কাজেই ইহার বেশি বলিল না। কিন্তু তাহার কথার অন্তরালে যে চিন্তা লুকায়িত তাহা এইরূপ। জগু নিজে ধার্মিক না

হইলেও ধর্মের সাংসারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন। এ বিষয়ে তাহার কোনরূপ মোহ নাই। সে জানে সে ভণ্ড ধার্মিক, আর ভজহরি যথার্থ ধার্মিক। ভণ্ডামির পুরস্কারস্বরূপ সে টাকা ও প্রতিপত্তি পাইয়াছে, কিন্তু সত্যকার ধর্মেরও তো একটা পুরস্কার আছে। জগুর বিশ্বাস, সংসারে ধর্মের এখনো এতটুকু প্রেস্টিজ আছে যে, লোকে অনিচ্ছাতেও ধার্মিককে সমীহ করে। তাহার উপদেশ কেহ গ্রাহ্য করে না বটে, করা উচিতও নয়, কিন্তু তাহার কথাটুকু অন্তত মন দিয়া শোনে। সত্য কথা সত্যই তো আর কেহ বলে না—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি সত্যবাদীকে উপহাস করে। জগু বুঝিয়াছে ছোটবাবুর কাছে ভজহরি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি কথাটা শুনিবেন—আর কেহ গেলে শুনিতেও চাহিবেন না। সংসারে অর্থের ও বিত্তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রয়োগের স্থান আছে—কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র ধর্মের, কাজেই এখানে ভজহরির যাওয়া আবশ্যক। তাহার সঙ্গে অপর কেহ গেলে ভজহরির গুরুত্ব নষ্ট হইবে বলিয়াই জগুর বিশ্বাস। গঙ্গোদক নর্দমা দিয়া প্রবাহিত হইলে তাহার পবিত্রতা কি আর থাকে।

ভজহরি সবিনয়ে বলিল—বেশ, আপনাদের যখন অনুমতি, আমিই যাবো। ভালো কথা বুঝিয়ে বল্‌তে ক্ষতি কি।

এইরূপে মূল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেলে অবান্তর কথা ও তামাক আসিয়া পড়িল। কানু ঘোষের দৈহিক শক্তি ও বিজয় বৈরাগীর অবিমৃষ্যকারিতাই প্রধান প্রসঙ্গ। ভজহরি বলিল—কানু শক্তিও রাখে যেমন খেতেও পারে তেমনি। বস্তাটা তুলে দিয়ে এক জায়গায় ব'সে পাঁচ সের রসগোল্লা খেয়ে নিলো।

নীলাম্বর বলিল—বয়সকালে সবাই পারে। ওর আর বয়স কি? হুঁ, তাছাড়া পরের পয়সায় পাঁচসের তো একসের মাত্র।

ভট্টাচার্যের এই সব অর্বাচীন প্রসঙ্গ মুখরোচক লাগিতেছিল না, সায়ং-সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণপ্রায় এই অজুহাতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন; যোগেশ, পঞ্চানন, নীলাম্বর প্রভৃতি যাহারা অন্য পাড়ায় থাকে তাহারাও বাহির হইয়া পড়িল।

যোগেশ আর একবার কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য বলিল—ভজহরি দাদা, ছোটবাবু সকাল সাতটার মধ্যেই বাইরে এসে বসেন।

ভজহরি বলিল—আমার ভুল হবে না, ভাই।

৭

পরদিন ভোরবেলা ভজহরি দাস নবীননারায়ণের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। নবীননারায়ণ বিস্তৃত ফরাসের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। ভজহরিকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল—আসুন দাস মশাই, খবর কি?

নবীননারায়ণকে প্রণাম করিয়া ফরাসের একান্তে বসিতে বসিতে ভজহরি বলিল—খবর আর কি বাবা, একবার দেখা করতে এলাম। শুনেছি তুমি এসেছো কিন্তু সময় পাইনি, কেবলি কলুর ঘানি টেনে মরছি। তোমার শরীর ভালো তো বাবা? বৌ-মা কুশলে আছেন?

নবীননারায়ণ যথাযোগ্য উত্তর দিল। ভজহরি বলিল—বৌমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে হয়। এ গ্রাম ভালো হোক মন্দ হোক তাঁরই তো বটে। না আসলে চলবে কেন?

নবীননারায়ণ বলিল—এবারে গরমের সময়ে আনবো ভাবছি, এখন সময়টা ভালো নয়।

ভজহরি দাস বলিল—এ সময় না এনে ভালোই করেছো। ম্যালেরিয়া জ্বর কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

নবীননারায়ণ বলিল—কিন্তু যোগেশ যেমন মহামারীর কথা লিখেছিল, তেমন কিছুই নয়।

এই কথায় দু'জনেই হাসিল—আসল রহস্য কাহারো অজ্ঞাত নয়।

তারপরে নবীননারায়ণ বলিল—আর ম্যালেরিয়া হবেই বা না কেন? গ্রাম যে আগাছায় ভ'রে গেল।

ভজহরির আসল প্রসঙ্গ উঠাইবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিল,

বলিল—কিন্তু বাবা, বুড়ো অশথ তো আগাছা নয়। ওটাকে নাকি কাটবার সিদ্ধান্ত করেছ?

না কেটে করি কি? দেখছেন তো কতখানি জায়গা আট্‌কে রয়েছে?

ভজহরি বলিল—কিন্তু সেটা কি উচিত হবে বাবা?

নবীন বলিল—কেন নয়? বিশেষ ওটা তো আমারি এলাকা বটে।

তাহার যুক্তি শুনিয়া ভজহরি জিভ কাটিয়া বলিল—বাবা, এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়। এলাকা তোমারি অবশ্য। কালীবাড়িও তো তোমারি এলাকায়, তাই ব'লে কি মা-কালী তোমার প্রজা? তিনি কি আঁচলে খাজনা বেঁধে তোমার কাছারিতে আসেন? না বাবা, এ তোমার যোগ্য কথা নয়। দেবস্থানের মালিক দেবতা, জমিদার যেই হোন না কেন।

নবীননারায়ণ বুঝিল কথাটা সত্যই বে-সুরো হইয়া গিয়াছে, তাই সে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—না, না, আমি তা বলিনি। দেখুন, ওই অশথ গাছটার জন্যে দু'তিন বিঘে জমি ওখানে অনাবাদী প'ড়ে আছে। এদিকে লোকে চাষের জমি পায় না। দাস মশাই, দেশের লোকসংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে—অথচ জমি তো আর বাড়ছে না—খাদ্যাভাব হবে যে তাতে আর বিচিত্র কি?

ভজহরি বলিল—কিন্তু ছোটবাবু, আমি তো তা দেখিনে। আমাদের এদিকে লোক ম'রে শেষ হয়ে গেল। জমি অনাবাদী প'ড়ে আছে। যার পাঁচ বিঘে জমি হ'লে চলে, তার হাতে পনেরো বিঘে জমি আছে। চাষ করতে পারে না, ফেলে রেখেছে। ধানের দাম এবারে পাঁচ সিকে হয় তো আমাদের ভাগ্য।

নবীননারায়ণ বলিল—আমি আমার এদিকের কথা বলছিনে, অন্য অঞ্চলের কথা বলছি।

—কিন্তু বাবা, অশথ গাছটা তো এই অঞ্চলের, অন্য অঞ্চলের অভাবে ওটাকে কাট্‌তে যাবে কেন?

—সব অঞ্চল মিলিয়েই তো এই দেশ। দেশে যখন জমির অভাব তখন বনে-জঙ্গলে জমি অনাবাদী প'ড়ে থাকা কি অপরাধ নয়? আপনি ভাববেন না যে কেবল এই গাছটা কাটতেই আমি সঙ্কল্প করেছি। আমার এলাকায় যেখানে

যত আগাছা জঙ্গল আছে সব কেটে ফেলে চাষের জমি বাড়িয়ে দেবো। তাতে প্রজাদের স্থবিধে—আমার আয়ও দু'পয়সা বাড়বে।

ভজহরি তাহার কথা মন দিয়া শুনিল, বলিল—তোমার কথা ঠিক, কিন্তু আরো একটা বিষয় ভাববার আছে।

এই বলিয়া সে তর্কের মোড় ফিরাইয়া লইয়া আরম্ভ করিল—লোকের যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি ভক্তিরও দরকার, সেইজন্যই তো দেবস্থান। চাষের জন্য যেমন বৃষ্টির আবশ্যক, মানব-জমিন আবাদের জন্য তেমনি আবশ্যক ভক্তির। ওই বুড়ো অশথ, কালীবাড়ি, হরিবাড়ি অনেকটা ক'রে জমি অধিকার ক'রে আছে বটে, কিন্তু ওগুলো না থাক্‌লে কি এখানকার মানব-জমিন মরুভূমি হয়ে যেতো না? তখন তোমার চাষ-আবাদ করতো কারা? আমি, বাবা, তোমার মতো পণ্ডিত নই, ভুলভ্রান্তি ক'রে থাকি তো বুঝিয়ে দাও।

নবীননারায়ণ কি বুঝাইবে? দু'জন এক সমতলে অবস্থান করিলে তবেই মিলন সম্ভব। আর দ্বন্দ্ব—তাহার জন্যও এক সমতলের আবশ্যক। কিন্তু নবীননারায়ণ ও ভজহরি যে উচ্চাবচ সমতলে অবস্থিত, কে কাহাকে বুঝাইবে? নবীননারায়ণ মানবজীবনকে অর্থনীতির আতস কাচের মাধ্যমে দেখিতে অভ্যস্ত। আতস কাচ দৃষ্টিকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে পড়িলে অগ্নিকাণ্ড ঘটা অসম্ভব নহে। পৃথিবীময় যে আজ অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে তাহার কারণ অর্থনীতিক দৃষ্টির আতস কাচ মারাত্মক কোণ রচনা করিয়া মানুষের মনের যত হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার উত্তাপকে সংহত করিয়া ইতিহাসের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু এসব কথা ভজহরির মতো লোককে সে বুঝাইবে কেমন করিয়া? ভজহরি যে স্তর হইতে কথা বলিতেছে তাহাতে নবীননারায়ণের পক্ষে তাহা বুঝিয়া ওঠাও অসম্ভব। অথচ দু'জনেই সমাজের কল্যাণ চায়। মানুষের মন হইতে কল্যাণকামিতা কিছু কমিলে সমাজের সত্য সত্যই কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নবীননারায়ণকে নীরব দেখিয়া ভজহরি বলিতে লাগিল—বাবা, বুড়ো অশথ তো গাছ নয়, গ্রামের দেবতা, জোড়াদীঘির পিতামহ ভীষ্ম। কত পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ওখানে মিশেছে, কত সুখ-দুঃখের ও যে সান্ত্বনা! ও যে আর দশটা গাছের মতো গাছ মাত্র একথা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। তোমার প্রস্তাবে আজ সবাই চম্‌কে উঠেছে। না বাবা, ও-কাজে বিরত থাকো। বুড়ো অশথ কাটলে গাঁয়ের অমঙ্গল হবে।

নবীননারায়ণ নীরব হইয়া থাকিল। একবার তাহার দৃষ্টি দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে পড়িল। ভজহরি তাহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—দশটা বাজে! ছোটবাবুর বোধকরি স্নানের সময় হ'ল।

তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কেহই কথা বলে না। অবশেষে সে বলিল—আজ তাহলে উঠি।

নবীননারায়ণ ক্ষুদ্র একটি 'আচ্ছা' শব্দ মাত্র বলিল। ভজহরি তাহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। নবীননারায়ণ সেই শূন্য, সুবৃহৎ, টিক্‌টিকি-ডাকা কক্ষের মধ্যে একাকী তাকিয়া মাথায় দিয়া ছাদের দিকে তাকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সারা দীর্ঘদিন তাহার মনের মধ্যে ভজহরি দাসের কথাগুলি পাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল। যে অশথ গাছটা কাটিতে তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইবার কারণ নাই, তার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের এত আপত্তির কারণ কি? গ্রামবাসীদের আপত্তি বই কি, কারণ নবীননারায়ণ বুঝিয়া লইয়াছে যে, ভজহরি সকলের প্রতিনিধি হইয়াই আসিয়াছিল। ভজহরির সাধুতার খ্যাতি সে অবগত আছে। সে ছাড়া অপর কেহ আসিলে স্বার্থসিদ্ধির সন্দেহ তাহার মনে উদিত হইত। গাছটা তাহার কাছে গাছই—অঙ্গারের বিকার মাত্র! গ্রামের লোকদের চোখে কি তাহার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা আছে? তাহা কিভাবে সম্ভব? এই কথাটাই সে বুঝিতে পারে না।

ভজহরির আরো একটা কথা তাহার মনে পাক খাইতে লাগিল—মানব-জমিন আবাদের পক্ষে ভক্তির আবশ্যক আছে। নবীননারায়ণ জানে,

অবশ্যই আছে—কিন্তু ভক্তির সঙ্গে ওই গাছটার কি সম্পর্ক? নবীন-নারায়ণের মন গ্রামের সহিত ভাবসূত্রে গ্রথিত থাকিলে কথাটা সহজেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু শহরের দীক্ষায় ও ভিন্নমুখী শিক্ষায় সে সূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন। জ্ঞানের বর্মে সজ্জিত হইয়া সে কোমল পল্লীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, লোহার স্পর্শে গ্রামের স্পর্শ-কাতর দেহ যে বিক্ষত হইয়া যাইবে এ প্রশ্ন তাহার মনে একেবারেই উঠিল না। প্রেমে যে আলিঙ্গন করিবে বর্মমুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বিচিত্র সন্দেহ ও বিচিত্রতর সঙ্কল্পে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া সে সুবৃহৎ অট্টালিকার শূন্য কক্ষে কক্ষে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আদর্শ-বাদের অঙ্কুরোদ্‌গমের পক্ষে শূন্য অট্টালিকার মতো প্রশস্ত স্থান আর অল্পই আছে। ইহার ঘটাকাশে যুগপৎ অনন্ত ও সান্ত সম্মিলিত, অনন্তের উদারতা ও সান্তের আশ্রয়, একের মহিমা ও অপরের নৈভৃত্য, শান্তি ও মোহ এখানে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

ঝাঁ-ঝাঁ-করা দুপুরের রৌদ্র-বিমূঢ় প্রহরে শূন্য ঘরগুলি খাঁ খাঁ করিতে থাকে, আর বিভ্রান্ত নবীননারায়ণ রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কক্ষের পরে কক্ষ অতিক্রম করিয়া পায়চারি করে—সমস্যার কূল পায় না, তল পায় না।

কিন্তু সে কি জানে এই নির্জনতায় আদর্শবাদের অঙ্কুরের সঙ্গে সগোত্রভাবে বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুরও উদ্‌গত—স্বয়ং শয়তানের হস্তে রোপিত। মানুষে আদর্শ-বাদের অঙ্কুর চয়ন করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুরও সংগ্রহ করে, না করিয়া তাহার উপায় নাই। তাই প্রত্যেক আদর্শই অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুবাণ বহন করে। কোন্ আদর্শবাদ না অল্পবিস্তর বিষমিশ্রিত?

নবীননারায়ণ সমস্যার সমাধান পাইল না বটে, কিন্তু অশথ গাছটা কাটিবার সঙ্কল্প হইতেও তিলমাত্র বিচ্যুত হইল না। পৃথিবীর মঙ্গল করিবার মহৎ সঙ্কল্প যাহার মাথায় চাপিয়াছে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে! আদর্শবাদের দোহাই দিয়া অত্যাচারী হইয়া ওঠা সবচেয়ে সহজ—তখন অত্যাচারকে অত্যাচার

নিবারণের উপায় বলিয়াই মনে হয়। মানুষের উপকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যত মানুষ মারা হইয়াছে, এত আর কিসে? হায় আদর্শবাদ! হায় মানুষ!

৮

সংবাদটা ক্রমে গ্রামের সর্বজনের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রথমে কানে কানে রটিল, তারপরে কানাঘুষায় রটিল, তারপরে মুখে মুখে রটিল, এবং অবশেষে সকলেই জানিল ছোটবাবু অশথ গাছ কাটিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রথমে কথাটা কেহ বিশ্বাস করে নাই, সবাই ভাবিয়াছিল ছোটবাবুর নাম করিয়া একটা মিথ্যা খবর রটানো হইয়াছে, তারপর ভাবিল ব্যাপারটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তারপরে ভাবিল কোনো স্বার্থপর ব্যক্তি জায়গাটা দখল করিবার মতলব করিয়াছে—কিন্তু এমন ধর্মদ্রোহী স্বার্থপর গ্রামে কে আছে? অবশেষে খবরের সত্যতা সম্বন্ধে কাহরো আর সংশয় রহিল না।

দেহের বেদনার স্থানে হাতটা যেমন আপনিই গিয়া পড়ে, তেমনি পরদিন ভোর বেলায় লোকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে অশথতলায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। মাণিক খুড়ো তাহার বালাপোষখানা গায়ে জাড়াইয়া বাঁধানো শানের উপরে বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। এই বালা-পোষখানার ইতিহাস গ্রামের সকলেই জানে। অনেককাল আগের কথা, মাণিক খুড়োর বয়স তখন অল্প, তিনি নদীর ধারে সকাল বেলা বসিয়া মাছ ধরিতেছিলেন —এমন সময়ে মস্ত এক বজরা করিয়া কোন্ এক মহারাজ যাইতেছিলেন। মাছ আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া মাণিক খুড়ো এক খালুই তাজা পাব্দা মাছ মহারাজার হাতে ধরিয়া দিলেন।

মাণিক খুড়ো বলে—তোমরা ভেবো না, নোকর, বরকন্দাজ—স্বয়ং মহারাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমি স্বয়ং মহারাজার হাতে দিলাম।

লোকে শুধায়—কি ক'রে জানলেন যে, তিনি মহারাজা?

মাণিক খুড়ো তাহার উত্তর না দিয়া বলে—মহারাজ পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করলেন—আমি পৈতে দেখিয়ে বললাম, ব্রাহ্মণ, মাছ

বেচা আমার ব্যবসা নয়, মহারাজের ভোগের জন্য দিলাম। মহারাজ বললেন, ব্রাহ্মণের যোগ্যই কথা বটে। কিন্তু আমিও তো ব্রাহ্মণ, দান প্রতিগ্রহ করবো কেন? কিছু তো নিতে হবে, এই ব'লে তিনি গায়ের বালাপোষখানা খুলে আমার হাতে দিলেন। বালাপোষের ভাঁজ থেকে কস্তুরীর গন্ধ ছুটলো। দেখো, শুঁকে দেখো—

তাঁহার আহ্বানে আগে লোকে নাক বাড়াইয়া দিত—কিন্তু কোথায় সে রাজকীয় গন্ধ? তেলের দুর্গন্ধ ছাড়া কেহ কিছু পাইত না। এখনো মাণিক খুড়ো গল্পটি বলিবার সময়ে শ্রোতাদের আহ্বান করে—কিন্তু কেহ আর নাক বাড়ায় না। তাহার এক দুশ্চিন্তা, মৃত্যুর পরে এই বালাপোষখানার উত্তরাধিকারী কে হইবে? মাণিক খুড়ো নিঃসন্তান। শীতের রোদ মাণিকের হংসডিম্বের মতো মসৃণ টাকের উপরে পড়িয়া ঝক ঝক করিতেছে, তাকাইলে চোখ ঝলসিয়া যায়।

মাণিক বেশ করিয়া বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া লইয়া বলিল—এমন সুন্দর জিনিসটা আমার পরে ভোগ করবার লোক নেই—

শ্রোতাদের মধ্যে হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, কর্তা, আপনার মৃত্যুর আগেই তো ওখানা ছিঁড়ে যেতে পারে।

মাণিক অজাতশত্রু লোক, কেবল ওই বালাপোষটার সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। বালাপোষের মর্যাদা রক্ষার্থ বলিল—বেটা রজক, তুই বালাপোষের মর্ম বুঝবি কি? এ কি কাপড়, শাড়ী, পিরান যে মাসে একবার ক'রে তোর বাড়ি যাবে? বালাপোষের সম্মানই আলাদা—সে কখনো ধোপার বাড়ি মাড়ায় না।

বালাপোষ ধোপার বাড়ি যায় কিনা জানি না—তবে মাণিক খুড়োর বালাপোষ সম্বন্ধে একথা সর্বৈব সত্য।

তারপরে যুক্তিটার চরম আঘাত হানিয়া খুড়ো বলিল—গায়ের রং দেখো না, যেন কালি মেখে এসেছে।

বাস্তবিকই তাই। শ্রীচরণ রজক অস্বাভাবিক কালো, এমন বার্নিশ-করা

কালো সচরাচর দেখা যায় না। কেহ তাহার রং লইয়া ঠাট্টা করিলে সে কালো মুখে হাসির উগ্র শুভ্রতা ফুটাইয়া উত্তর দেয়, আজ্ঞে কর্তা, আমি নিজে কালো কিন্তু পরের কাপড় ফরসা করি, আর কতজন আছে যারা নিজেরা ফরসা কিন্তু পরের কাপড় কালো ক'রে বেড়ায়। তাদের কাজের চেয়ে আমার কাজটা কি ভালো নয়?

শ্রীচরণ ধীরে বলে, ধীরে চলে, সকলেই তাহার কাছে কর্তা, আর গাঁয়ের বারো আনা লোককে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম না করিয়া পথ ছাড়িয়া দেয় না।

শ্রোতারা অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল—ওসব থাক্, এখন অশথ গাছের কথা বলো খুড়ো।

মাণিক উৎসাহিত হইয়া আরম্ভ করিল :

সে অনেকদিন আগের কথা, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল, তখন গ্রামের কী-ই বা ছিল? থাকবার মধ্যে ছিল কয়েক ঘর জোলা আর জেলে, এই যে বাড়িঘর দালান কোঠা দেখছ তার কিছুই ছিল না—

তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া বলে—চৌধুরীবাবুদের অবস্থাও আজকার মতো ছিল না, না ছিল জমিদারি. না ছিল দর-দালান, সামান্য কিছু ব্রহ্মত্র জমি মাত্র ছিল, আর ছিল এই বুড়ো অশথ—

এই বলিয়া অশ্বত্থ গাছটির দিকে একবার তাকায়—

আর ছিল ওই নদী, কিন্তু নদী এখন যেখানে, সেখানে ছিল না। এই গাছের তলা দিয়ে নদী বয়ে যেতো, এখন নদী এখান থেকে দু-শ' গজ স'রে গিয়েছে। আর অতদিনের কথাই বা বলি কেন? আমরাই ছেলেবয়সে দেখেছি—নদী ওই ওখানে ছিল—আর বর্ষাকালে জলের ঢেউ এসে লাগতো গাছটার গুঁড়িতে—কি বল হরিচরণ?

এই বলিয়া মাণিক খুড়ো শ্রোতাদের মধ্যে সমবয়সী এক বৃদ্ধের দিকে তাকায়, হরিচরণ সমর্থনসূচকভাবে মাথাটা নাড়ে। আবার আরম্ভ হয়—

ওঃ সে কি জলের ডাক! রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে ভয় করতো, মনে হ'ত বাড়িঘর বুঝি ভেসে গেল। দিনের বেলায় দেখতাম ইলিশমাছ ধরার সে

কি ধুম! ছোট ছোট জেলেডিঙি, এমন বিশ-পঞ্চাশখানা। আমরা স্নান করতে গিয়ে জোড়া জোড়া টাটকা ইলিশ কিনে আনতাম, পাঁচ পয়সা ছয় পয়সা জোড়া। সে কি তার স্বাদ!

কথাটা এমনভাবে বলিত যেন সে বাল্যকালের ইলিশের স্বাদ এখনো জিহ্বায় অনুভব করিতেছে। গল্পের সূত্রটাকে তাহার বাল্যকাল হইতে টানিয়া আবার মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে লইয়া গিয়া শুরু করিত—

একবার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ চলেছেন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে—এই নদীপথই ছিল সোজা পথ, পদ্মা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হ'ত। নবাবের বজরা যখন জোড়াদীঘির কাছে এসেছে, তখন সন্ধ্যা, এমন সময়ে এলো বিষম আশ্বিনে ঝড়। আশ্বিনে ঝড় আর আজকাল দেখিনে, ছেলেবেলায় দেখতাম আশ্বিনে ঝড়, সে এক সর্বনেশে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। প্রত্যেকবারই পুজোর আগে একদফা ক'রে ঝড় হ'ত। বিষম ঝড়ে পড়লো নবাবের বজরা, বানচাল হয় আর কি! মাঝিমাল্লা পাইক বরকন্দাজ নৌকা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে কাছি ধ'রে নৌকাখানাকে টেনে রাখতে চায়—পারবে কেন? এমন সময় গাঁয়ের লোকজন এসে হাজির হ'ল—আর এলেন রূপনারায়ণ চৌধুরী—(আবার গলা খাটো করিয়া) চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ। তখন সকলে মিলে কাছি দিয়ে বজরাখানাকে এই অশথের গুঁড়ির সঙ্গে আচ্ছা ক'রে ক'ষে বেঁধে ফেল্‌ল। ব্যস্! ঝড়ের আর সাধ্য কি কিছু করে। নবাবের বজরা রক্ষা পেলো—নবাব রক্ষা পেলেন। সে রাতটা নবাব এখানেই কাটালেন। পরদিন ভোরবেলায় তিনি চৌধুরীর পরিচয় নিলেন। তাঁকে নিজের গায়ের শালখানা খুলে বক্‌শিস করলেন। সে শাল ছোটবেলায় আমরা দেখেছি। আর এই যতদূর দেখতে পাচ্ছ—এই বলিয়া হাত দিয়া চারদিকের দিগন্ত পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া বলিলেন—এই সমস্ত জমিদারি নামে মাত্র খাজনায় চৌধুরীবাবুকে লিখে দিলেন। তারপর থেকেই তো চৌধুরীদের উন্নতি।

মাণিক খুড়ো বলিয়া চলে—নবাবের সঙ্গে আর একখানা নৌকায় ছিলেন এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত। হাঁ, নবাব গুণী লোকদের আদর ক'রে সঙ্গে রাখতেন, সেই

ব্রাহ্মণপণ্ডিত চৌধুরীবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—দেখো বাবা, এই বৃক্ষটা তোমাদের গাঁয়ের দেবতা! এই গাছ যতদিন তোমাদের গাঁয়ে থাকবে তোমাদের সকলের বাড়বাড়ন্ত হবে, গাঁয়ের লোক দুধে ভাতে থাকবে, তাদের বংশ লোপ পাবে না, গাছটাকে তোমরা দেবতার মতো পূজো ক'রো। এর গায়ে হাত দেবার কথাও কখনো মনে ক'রো না। তারপর নবাবের বহর ডঙ্কা বাজিয়ে নিশেন তুলে যাত্রা করলো।

তারপর একটু থামিয়া আবার আরম্ভ হয়—সেই থেকে সবাই বুড়ো অশ্বত্থকে গাঁয়ের দেবতা ব'লেই মনে করে। আর করবেই বা না কেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গেল। তারপর থেকেই জোড়াদীঘি সব গাঁয়ের রাজা, আর জোড়াদীঘির চৌধুরীরা এদিকের সকলের রাজা! সেই বংশের একজন আজ বুড়ো অশথকে কাটবার কথা ভাবছে! এই বলিয়া মাণিক কপালে হাত ঠেকাইয়া সর্বনাশের ও দুরদৃষ্টের ইঙ্গিত করে। তাহার শ্রোতার দল কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারে না।

৯

অবশেষে যোগেশ অনেক সন্ধান করিয়া একদল করাতি সংগ্রহ করিল। তাহারা পদ্মাপারের লোক, অশথ গাছের মাহাত্ম্যের ধার ধারে না। গাঁয়ের লোক তাহাদের মারিয়া খেদাইয়া দিত—কিন্তু সাহস করিল না, করাতিরা জমিদারের আশ্রিত। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া টোলের পড়ুয়া শশাঙ্ককে মুখপাত্র করিয়া দশ আনির জমিদার কীর্তিনারাণয়বাবুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

কীর্তিনারায়ণ বৈঠকখানায় ছিল। অতিকায় জলহস্তী যেমন নলখাগড়া-বেষ্টিত কর্দমশয্যায় সুখ-আলস্যে গড়াইতে থাকে, প্রশস্ত ফরাসের উপরে কীর্তিনারায়ণ তেমনি খালি গায়ে গড়াইতেছিল। পাশে একটি নাতিবৃহৎ পানের ডিবা, পঞ্জিকা, কয়েকদিনের সঞ্চিত বাংলা সংবাদপত্র। সেই আসন্ন শীতেও পাঙ্খাবর্দার টানাপাখা টানিতেছিল। পাঙ্খাবর্দার বলে—বড়বাবু বড়

হিসাবী, শীতকালেও পাখা টানাইয়া লন। কথাটা সত্য। শীতের দুপুরে আহারান্তে লেপ কম্বল গায়ে দিয়া ফরাসে তিনি শুইয়া পড়েন, পাঙ্খাবর্দার পাখা টানিতে থাকে। লোকটা পাখা টানিবার জন্য নিষ্কর জমি ভোগ করে—শীতকালে যে সে অবকাশ ভোগ করিবে হিসাবী কীর্তিনারায়ণের তাহা অসহ্য। তাই সে অতিরিক্ত লেপ কম্বলের দ্বারা কৃত্রিম তাপ সৃষ্টি করিয়া তাহা নিবারণের জন্য পাখা টানাইয়া থাকে। বড়বাবু সত্য সত্যই হিসাবী।

সকলে গিয়া ঘরের মেঝেতে বসিল। শশাঙ্ক বাবুকে প্রণাম করিয়া একখানি জলচৌকিতে উপবেশন করিল। শশাঙ্কর বয়স ত্রিশের কাছে। অনেক দিন হইল টোলে পড়িতেছে। পড়া কবে শেষ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে সবিনয়ে উত্তর দেয়—জ্ঞানসমুদ্রের কি শেষ আছে? কেবল জলে নামিয়া সাঁতার আরম্ভ করিয়াছি।

তাহার নাকটি টিকালো, চোখ দুইটি ছোট, মাথা একেবারে নিষ্কেশ হইলেও যথাস্থানে একটি শিখা সমুত্থিত। এমন টাকের মধ্যে টিকি গজাইল কিরূপে জিজ্ঞাসা করিলে সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে—মরুভূমিতে খেজুর গাছ গজায় কিরূপে? তারপরে বলে—ব্রহ্মতেজ বাবা! ব্রহ্মতেজ! জ্ঞানের উত্তাপে মাথায় টাক পড়িয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণের টিকি তো না গজাইয়া পারে না! ব্রাহ্মণের লক্ষণের মধ্যে তাহার শিখা ও উপবীতই প্রধান চিহ্ন, একমাত্র-চিহ্ন বলিয়াই অনেকে মনে করে।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—শশাঙ্ক, তারপরে খবর কি?

শশাঙ্ক পোষমানা পোয্যের মতো মৃদু হাসিয়া বলিল—কর্তা সবই তো জানেন, এখন আপনি রক্ষা না করলে যে সব যায়!

বিস্মিত কীর্তি শুধাইল—কি হয়েছে?

তখন শশাঙ্ক তাহাদের আগমনের কারণ নিবেদন করিল। কীর্তিনারায়ণ সবই জানিত, সব খবরই রাখিত, তবু না-জানার ভাণ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আবার শুনিয়া লইল। তারপরে বলিল—ওটা তো ছোটবাবুর এলাকা, আমি কি করবো?

শশাঙ্ক বলিল—সবই কর্তার এলাকা। আপনার অসাধ্য কি?

এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ খোসামুদিতেও কীর্তিনারায়ণ মনে মনে খুশি হইল। খানিকটা গড়াইয়া লইয়া কাত হইয়া শুইয়া একটা পান লইয়া মুখে পুরিল।

কীর্তিনারায়ণ ও নবীননারায়ণ পরস্পরের যেন বিপরীত, বিরুদ্ধ ধাতুতে তাহাদের দেহ ও মন গঠিত। নবীননারায়ণকে বলা যাইতে পারে চাঁদের পূর্ণিমার দিক, আর কীর্তিনারায়ণ ঘোরতর অমাবস্যা। একজনের গায়ের রং শুভ্র, ছিপছিপে গড়ন, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, আচার-ব্যবহারে কথায় বার্তায় ভদ্র; আর একজন ঘন মসীবর্ণ, স্থূলায়ত অবাধ্য তাহার দেহভার, একপ্রকার বুদ্ধি আছে বটে, যাহাকে লোকে কুবুদ্ধি বলে, আচার ব্যবহারে গ্রামের আতঙ্ক—সংক্ষেপে কীর্তিনারায়ণ গ্রাম্যতা দোষের ঘনীভূত পিরামিড। সে মনে মনে নবীনকে বিষম হিংসা করে—এবং সেই হিংসা অবজ্ঞার আকারে যখন তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যেবার নবীননারায়ণের এম্-এ পাশ করিবার খবর গ্রামে আসিল কীর্তিনারায়ণ গ্রামের মধ্য-ইংরাজি ইস্কুলঘর আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল। সকলে সভয়ে শুধাইল—কর্তা, এ কি রকম হ'ল? কীর্তি হাসিয়া উত্তর দিল—চৌধুরী বংশের প্রথম ছেলে এম্-এ পাশ করলো—তাই আনন্দে আতসবাজি পোড়ালাম! ক্ষতি কি? তারপরে সেই ছাই সংগ্রহ করিয়া সাড়ম্বরে সর্বাঙ্গে মাখিল—সকলকে ডাকিয়া বলিল—দেখো, নবীনের এম্-এ পাশের আনন্দে আমি জ্ঞানের দিগম্বর সাজিয়াছি। এরপরেও যদি লোকে বলে আমি নবীনকে ভালোবাসি না—তবে শালাদের—

ইস্কুল পুড়িয়া যাইবার সংবাদ পাইয়া নবীননারায়ণ পাকা দালান তুলিয়া দিলেন। কীর্তি বলিল—দেখো, কাজটা করেছিলাম ব'লেই তো পাকা কোঠাবাড়ি পেলে!

অশথ গাছ কাটিবার বিবরণ সে যথাসময়ে শুনিয়াছিল এবং, সত্য কথা বলিতে কি, সে মনে মনে খুশিই হইয়াছিল। গাঁয়ের লোকে নবীননারায়ণকে ভালোবাসে, এবারে সেই ভালোবাসায় টোল খাইবে ইহাতে সে অত্যন্ত খুশি হইয়াছিল—তাহা ছাড়া আরো একটা হিসাব তাহার মনে ছিল।

পাছে গাছ কাটায় কোনো বাধা জন্মায় তাই সে কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিল—শশাঙ্ক, আমি কি করবো বলো। সেও গাঁয়ের জমিদার, তার উপর এম্-এ পাশ।

শশাঙ্ক বলিল—আপনিই বা কি কম? আর এতে যে গাঁয়ের অমঙ্গল হবে—কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেছেন 'বৃক্ষাণাং অশ্বত্থোঽহং'—

কীর্তি বলিল—আরে এম্-এ পাশ যে করেছে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে তার মোকাবিলা হয়ে গিয়েছে—তাকে গিয়ে বোঝাও না কেন?

শশাঙ্ক ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—আজ্ঞে, এম্-এ তো ম্লেচ্ছের বিদ্যা—

কীর্তি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—রাজত্বই তো ম্লেচ্ছের!—ওরে, জোরে টান্।

পাঙ্খাবর্দার জোরে পাখা টানিতে লাগিল। তারপরেও শশাঙ্ক ও আর সকলে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিন্তু অশথ গাছের প্রসঙ্গ আর উঠিল না। সকলে একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল—অবশেষে শশাঙ্ক একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে কীর্তিনারায়ণ খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সেই হাসির শব্দে বৈঠকখানার বাগানের গাছে বসা গোটা দুই চড়াই পাখী ভয়ে উড়িয়া গেল, কেবল কার্নিসে বসা পায়রার দল কিছুমাত্র ভীত না হইয়া 'বক্ বকম বক্' বকিয়া যাইতে লাগিল—

তাহারা কীর্তিনারায়ণের হাসির সঙ্গে পরিচিত।

১০

আজ বুড়া অশথ কাটা শুরু হইবে। অতি প্রত্যূষে গ্রামের নরনারী অশথতলায় গিয়া সমবেত হইল। জনতার অধিকাংশই স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছেলের দল আছে, যুবক ও বৃদ্ধের সংখ্যাও অল্প নহে।

মেয়েরা নৈবেদ্য লইয়া গিয়া অশথের মূলাপদে রাখিল। কৌটা হইতে

সিঁদুর গাছের গুঁড়িতে মাখাইয়া দিল—সেই উৎসৃষ্ট সিঁদুর সধবাগণ পরস্পরের কপালে ও শাঁখায় মাখিয়া লইল এবং নিজের নিজের সিঁদুর-কৌটায় ভরিয়া রাখিল। অবশেষে পুরুষগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল—পিছনে পিছনে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে মেয়েরা তাহাদের অনুসরণ করিল।

রোদ উঠিলে করাতির দল কোমরে নগদ টাকা বাঁধিয়া এবং মাথায় গামছা জড়াইয়া অশথতলে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা তিনবার বৃক্ষকে সেলাম করিয়া লইয়া কুড়ুল ধরিল।

ঠক্ ঠক্—ঠকা ঠক্—ঠক্ ঠক্। কুড়ুলের শব্দ। সেই শব্দ দূরে দূরান্তে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া দিল—ঠক্ ঠক্, ঠকা ঠক্। সমস্ত গ্রামের হৃৎপিণ্ড ওই সর্বনাশের তালে কম্পিত হইতে লাগিল—ঠক্ ঠক্, ঠকা ঠক্। অন্তহীন তালে তালে কোনো সর্বনাশের হাতুড়ির আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াই চলিল—ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্।

গ্রামে মুমূর্ষার নীরবতা। জনসংখ্যা তেমনি আছে—তবু যেন কেমন নির্জন। পথ লোকবিরল, ঘাটে স্ত্রীলোক নাই, মাঠে কৃষক নাই, হাটে ক্রেতা-বিক্রেতা না থাকিবার মধ্যে। যাহার চলাফেরা নিতান্ত না করিলে নয় সে ছায়ার মতো সন্তর্পণে যাতায়াত করিতেছে, মেয়েদের স্বাভাবিক মুখরতা কেমন রুদ্ধ, বালকরা খেলা ছাড়িয়াছে, এমন কি শিশুও যেন আজ কিসের আশঙ্কায় উদ্যত কান্নাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র গ্রামে আজ একটিমাত্র শব্দ—ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্···সর্বনাশের ঘোড়সোয়ারেরর অশ্ব-ক্ষুরের ধ্বনি।

অবশেষে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময়ে মর্মভেদী অন্তিমরব করিয়া জোড়াদীঘির বৃদ্ধ অশথ ভূপতিত হইল। বৃদ্ধেরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিল—স্ত্রীলোকেরা অশ্রুধারা অবারিত করিয়া দিল—বালকের দল ঘটনার সম্যক্ মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর বৃদ্ধ অশথ বৃক্ষ পিতামহ

ভীষ্মের মতো জীবন-সংগ্রামের অবসানে স্বেচ্ছামৃত্যুর শরশয্যায় শয়ান হইয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা কাকের দল গ্রামান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের চিরদিনের আশ্রয় আজ নাই। তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া কা কা রবে চীৎকার করিতে লাগিল। একখানি নিরেট কালো মেঘের মতো তাহারা কিছুক্ষণ আকাশে বৃত্তাকারে ভাসিয়া বেড়াইল, তারপর বৃত্তকে দীর্ঘতর করিয়া চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে নূতন বাসার সন্ধানে প্রস্থান করিল।

তারায় ভরা রাত্রি আসিল—ভীষ্মের শরশয্যার সাক্ষী তারার দল অশ্বত্থের শেষ শয্যার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোর রাত্রে আহার-সন্ধানী বাদুড়ের দল ফিরিয়া দেখিল, অশথ নাই। তাহারা আতঙ্কে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহাদের মুখ হইতে নখরক্ষত বাদাম খসিয়া পড়িল। অবশেষে তাহারাও নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল।

ভোরবেলা জোড়াদীঘির লোকেরা চাহিয়া দেখিল, যেখানে অশথ ছিল সেখানে এক বিরাট শূন্যতা, সেখানে এক নূতন আকাশ।

শোকের অপরিহার্যতার অবসানের জন্যই হোক আর কৌতূহলের জন্যই হোক ভূপতিত অশথের চারিদিকে জনতা জুটিয়া গেল। বালকেরা গাছের ডালে উঠিয়া তালে তালে নাচিতে লাগিল—আরো ছোটর দল একটা, দুট', আরো একটা বলিয়া বাদাম কুড়াইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। পাখীর বাসা ভাঙিয়া পড়িয়া অনেকগুলি পক্ষিশাবক মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল—সারা রাত্রি শেয়ালের দল সেগুলিকে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়াছে। একজন একটা শাবককে সযত্নে তুলিয়া লইল; কেহ বলিল—মরিয়াছে, কেহ বলিল—না না, এখনো যেন আছে; তখন দুইজনে মিলিয়া তাহাকে বাঁচানো যায় কিনা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

রহিম খোঁড়া একটা ডালের কোটরের দিকে তাকাইয়া বলিল—ওঃ বাবা, ওই সেই গর্ত! মনে পড়লে এখনো ভয় করে! সকলে জিজ্ঞাসু হইয়া

বলিল—ব্যাপার কি? রহিম বলিল—মনে নেই? পা-টা তো গেল ওই জন্যেই। কয়েক বছর আগের কথা, আমি আর বাদল—এইখানে ব্যাখ্যা করিয়া বলে, সে এখন পাটের হাকিম, তখন আমরা দু'জনে এক ক্লাসে পড়ি, দু'জনে শালিখের বাচ্ছা পাড়বার জন্যে উঠেছি গাছে। ওই গর্তটায় ছিল শালিখের বাসা। যেই না ওই ডালটার কাছে গিয়েছি—ওঃ বাবা! এখনো গা-শিউরে ওঠে—সে কী কালো! যমরাজার মহিষটাও বুঝি অত কালো নয়—এক মস্ত সাপ! আমি বললাম—বাদল, বাদল বললে—রহিম! দে লাফ, দে লাফ—দু'জনে দুই লাফ! মাটিতে প'ড়ে সেই যে আমার পা মচকালো—আর সারলো না।—এই বলিয়া সে একটা লাঠি দিয়া গর্তটার মধ্যে খোঁচা দেয়। না—আর সাপ বাহির হয় না। সে ভাবে, এখন যদি একবার বাহির হয় তবে দেখিয়া লই। তারপরে ভাবে, এখন বাহির হইবে কেন? এখন যে আমি প্রস্তুত। কপাল খারাপ না হইলে আর এমনটি হয়!

বুড়োরা ছেলেদের বলে—যা, যা, এখান থেকে সব যা। ছেলেরা যাইতে চাহে না। তাহাদের ইচ্ছা, বুড়োরা একটু সরিলেই ডাংগুলি খেলিবার জন্য কয়েকটা ডাণ্ডা কাটিয়া লইবে। চমৎকার ডাণ্ডা হইবে—যেমন মজবুত, তেমনি সরল।

জনতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে—সবাই চলিয়া যায়, কেবল কয়েকটি বালক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অশান্ত বাতাসে মুমূর্ষু গাছের পল্লবগুলি শির শির করিয়া কি যেন বলিতে থাকে; তাহাতে করুণা আছে ক্রোধ নাই, বিষাদ আছে দুঃখ নাই; জোড়াদীঘির জন্য দুশ্চিন্তা আছে, নিজের জন্য উদ্বেগ নাই; শরশয্যাগ্রস্ত ভীষ্মেরও কি ঠিক এইরূপ মনোভাব ছিল না? হেমন্তের আকাশ সোনার রোদের স্বর্ণভৃঙ্গার ভরিয়া পিপাসার বারি আনিয়া উপস্থিত করে। অশত্থ সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বেদনার শরভিন্ন প্রেমের অমৃতময় পানীয়ের জন্য তাহার অন্তিম প্রতীক্ষা!

সকাল বেলায় নবীননারায়ণ একাকী বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে তাহার নায়েব যোগেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিল। নবীন অল্প কয়েকদিনেই বুঝিয়া লইয়াছে যে, যোগেশ অতি সামান্য কারণেই চঞ্চল হইয়া পড়ে। নবীন শুধাইল—যোগেশ, ব্যাপার কি? কিন্তু যোগেশের মুখে কথা সরে না, কেবলি হাঁফায়, আর চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া সেগুলিকে আরো অবিন্যস্ত করিয়া তোলে। তখন নবীন আবার বলিল—বাড়িতে কোনো গোলমাল হয়েছে কি? নবীন ইতিমধ্যেই জানিয়াছে যে, যোগেশ এ সংসারে তাহার স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তবু যোগেশ কথা বলে না। তখন অনেক কষ্টে তাহার নিকট হইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করিল তাহাতে বুঝিতে পারিল যে দশানির কীর্তিবাবু মজুর ও লাঠিয়াল লইয়া আসিয়া অশথতলার জায়গাটা দ্রুত ঘিরিয়া লইতেছে। যোগেশ আসিবার সময়ে স্বয়ং স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছে।

খবরটা শুনিয়া নবীন বই রাখিয়া উঠিয়া বসিল, যোগেশকে বলিল—তুমি যাও—আর শোনো, একবার মিলন সর্দারকে পাঠিয়ে দাও।

যোগেশ সরিয়া পড়িল, এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলন সর্দার আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

নবীন বলিল—মিলন, দশানির বড়বাবু অশথতলা ঘিরে নিচ্ছেন। জমিটা তবে কি বেহাত হয়েই যাবে?

মিলন শুধু বলিল—আচ্ছা, ছোটবাবু। তারপরে যেমন ছায়ার মতো আসিয়াছিল, তেমনি ছায়ার মতো সরিয়া গেল। নবীননারায়ণ আবার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল।

কীর্তিনারায়ণের কতকটা পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। লোকটার দৌরাত্ম্যে গ্রামের লোক অস্থির। তাহার প্রতাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায় কিনা বলিতে পারি না, তবে ঋণী ও মহাজন যে এক ঘাটে স্নান

করে তাহা নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে গ্রামের লোকের বুক ঢিপ ঢিপ করে, কেবল যখন তাহার ঘুমের মধ্যে তালে তালে তাহার নাসিকাগর্জন নিদ্রার দেয়ালে চাঁদমারিগুলি ছুঁড়িতে থাকে, গ্রামের লোক একটু স্বস্তি অনুভব করে। সে গর্জন এমন বিকট যে তাহার পাঙ্খাবর্দারের ধারে-কাছেও তন্দ্রা আসিতে সাহস পায় না, সে জাগিয়া বসিয়া পাখা টানিতে বাধ্য হয়।

নবীননারায়ণ অশথ গাছ কাটিবে জানিতে পারিয়া কীর্তিনারায়ণ মনে মনে খুব খুশি হইয়াছিল। ওই জমিটার উপর অনেকদিন হইতেই তাহার লোভ। কিন্তু গাছটা থাকিতে জমিটা দখল করা যায় না। লোকটা মোটেই ধর্মভীরু নয়—তবে সংস্কার বলিয়া একটা ভয় তাহার ছিল। কিন্তু আর কেহ যদি গাছটা কাটিয়া ফেলিয়া সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে, তবে জমিটা দখল করিতে আর বাধা কি? সে মনে মনে খুব হাসিয়াছিল। সে ভাবিল যে, নবীন করিবে পাপ, আমি লইব জমি—চমৎকার 'ডিবিশন অব লেবার'। সেইজন্যই গাছ কাটিতে কোনরূপ আপত্তি সে করে নাই, গ্রামের লোক যখন তাহার কাছে আসিয়াছিল কোনরূপ উৎসাহ সে প্রকাশ করে নাই—বরঞ্চ ভাবিয়াছিল এইবারে গ্রামের লোকে বুঝুক আমাদের মধ্যে অধিকতর চতুর কে।

যেদিন রাত্রে অশথ গাছ পড়িল, কীর্তি তাহার লাঠিয়াল সর্দার আবেদ আলিকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনিল—শুধাইল, আবেদ, তোর দলবল সব আছে?

আবেদ বলিল—হুজুর, সবাই হাজির। এইতো আজ সকালে ধূপোলের হাট লুটে এলাম। ধনঞ্জয়, রামভুজ, ইদ্রিস, তেওয়ারি—সবাই কাছারিতে হাজির।

কীর্তিনারায়ণ শুধাইল—কতজন হবে?

আবেদ মনে মনে সংখ্যা গণনা করিয়া বলিল—তা হুজুর, জন দশেক তো বটে

তখন কীর্তিনারায়ণ গলা খাটো করিয়া বলিল—দেখ, কাল সকালে, খুব

সকালে, পূবদিক ফরসা হবার আগে গিয়ে অশথতলা ঘিরে নিতে হবে। বেড়া বাঁধবার জন্যে মজুর আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। তোরা তৈরি থাকিস্।

তারপরে একটু উচ্চস্বরে বলিল—পারবি তো? ওদিকে কিন্তু মিলন সর্দার আছে।

কীর্তি জানিত আবেদের কোমল স্থান কোথায়—তাই সে মিলন সর্দারের উল্লেখ করিল। তারপরে বলিল—ভয় নেই, বন্দুক নিয়ে, আমি কাছেই থাক্‌বো।

সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষেও আবেদের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—হুজুর আবার কেন? আমরাই কি পারি না?

কীর্তি বলিল—পারিস বই কি—তবু কাছে একটা বন্দুক থাকা ভালো আর মিলন সর্দারকে জানিস তো!

আবেদের মনিব যে তাহার চেয়ে মিলন সর্দারকে বড় লাঠিয়াল মনে করে ইহা আবেদ আর সহ্য করিতে পারিল না। সে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। কীর্তি আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল—ফিঙে ডাকবার আগেই উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।

আবেদ একটা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সে-রাত্রে আবেদের ঘুম আসিল না। শয্যায় জাগিয়া কেবল সে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল—কখন্ প্রথম ফিঙা ডাকিবে, কখন্ ভোরের বাতাস বহিবে, কখন্ পূব আকাশ ধূসর হইয়া উঠিবে। তাহার মনিব অবধি মিলনকে তাহার চেয়ে বড় ওস্তাদ মনে করে—তবে গ্রামের লোকের আর দোষ কি। একে একে তাহার দীর্ঘ লাঠিয়াল জীবনের ইতিহাস মনে পড়িত লাগিল।

আবেদ আলি লোকটি বেঁটে, মাংসপেশীগঠিত দৃঢ় শরীর; মাথার সম্মুখে তাহার টাক পড়িয়াছে। বহুকাল হইল সে কীর্তিবাবুর অধীনে লাঠিয়ালের কাজ করিতেছে—এখন সে দলের সর্দার। তাহাকে কীর্তিবাবুর সমস্ত অপকীর্তির দক্ষিণ হস্ত বলা চলে—কিংবা দক্ষিণ হস্তের যষ্টি বলিলেই যথার্থ হয়।

লোকটা পাকা লাঠিয়াল বটে, কিন্তু ছ'আনির মিলন সর্দারের কাছে নাবালক—বয়সে এবং লাঠি-বাজিতে। তাহার বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিলন সর্দারকে লাঠিখেলায় পরাজিত করিবে। মাঝে মাঝে সে সুযোগ জুটিয়াছে—কিন্তু প্রত্যেকবারই সে পরাজিত হইয়াছে—আবার প্রত্যেক পরাজয়ের সঙ্গে তাহার রোখ যেন দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

মিলন সর্দার নবীননারায়ণের পিতার আমল হইতে ছ'আনির বাড়িতে সর্দারি করিতেছে। তখন তাহার বয়সও এখনকার চেয়ে অল্প ছিল—আবার লাঠিবাজির সুযোগও ছিল বেশি। নবীননারায়ণের আমলে লাঠিবাজির সুযোগ বড আসে না; একে তো সে শহরে থাকে, তার উপর লাঠিবাজি তাহার পছন্দ নয়। মিলন এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু গাঁয়ের লোকে জানে মিলন সর্দার কত বড় লাঠিয়াল। আগেকার আমলে যেদিন সে দলবল লইয়া গ্রাম শাসন করিতে বাহির হইত, তাহাদের ডাক শুনিয়া লোকের হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। গভীর রাত্রে সেই ডাকের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া লোকে বলাবলি করিত—সর্দার দল লইয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সবাই মিলন সর্দারকে ভয়ের চেয়ে ভালোবাসিত বেশি। সে লাঠিয়াল হইলেও স্নেহপরায়ণ সামাজিক জীব ছিল। গ্রামের সকলের সঙ্গেই তাহার আত্মীয়তা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় যখন সে মধুর সুরে নাম-গান করিত—অসংখ্য শ্রোতা জুটিয়া যাইত আশেপাশে। আবেদের কাছে এ সমস্তই তাহার বিরুদ্ধে একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র বলিয়া বোধ হইত।

আবেদের মনে পড়িয়া গেল, একবার সে দলবল লইয়া হাট গোপালগঞ্জ লুটতে গিয়াছিল—মিলন সর্দার প্রতিপক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনেক দিনের সাধ ছিল সর্দারের সঙ্গে লড়িবে—আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু দু'চার মিনিট যাইতেই সর্দারের প্রচণ্ড লাঠি তাহার মাথায় আসিয়া পড়িল। সব কেমন অন্ধকার হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইলে দেখিল সর্দার তাহার মাথা কোলে লইয়া জল দিতেছে—আর চারিদিকের জনতার মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি। তখন তাহার মনে হইল তাহার জ্ঞান না ফিরিলেই ছিল

ভালো। তাহার মনে হইল পৃথিবী কেন দ্বিধা হইয়া যায় না। সেদিনের অপমানের শোধ লইবার জন্য আর একদিন সর্দারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছিল—সর্দার কোনো কথা না বলিয়া মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। আবার দর্শকের মুখে সেই ব্যঙ্গের হাসি।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ তাহার চরম সুযোগ উপস্থিত। কাল দেখা যাইবে কত বড় ওস্তাদ! কাল হয় আবেদ আলি থাকিবে, নয় মিলন সর্দার থাকিবে—দু'জনে একত্র আর কখনো জোড়াদীঘির মাটিতে পদার্পণ করিবে না। এই সব কথা মনে পড়িয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পূর্বদিক ফরসা হইয়াছে কিনা। না, রাত্রিটা এত অনাবশ্যক দীর্ঘ কেন? তাহার রাত্রি আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। প্রতীক্ষমানতা অনাবিল বার্ধক্যের ধর্ম। প্রতীক্ষমানতাই জীবনের চরম শিক্ষা, বিধাতা বার্ধক্যের শুভ্র ললাটে প্রতীক্ষাপরায়ণতার নির্মল কিরীট পরাইয়া দিয়াছেন। যৌবন প্রতীক্ষা করিতে জানে না।

ছ'আনির নায়েব যোগেশ বাড়ি হইতে জমিদারের কাছারিতে আসিবার সময়ে দেখিতে পাইল, অশথতলায় মস্ত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একদল মজুর খটাখট্ করিয়া বাঁশ পুঁতিয়া জায়গাটা ঘিরিয়া লইতেছে; আবেদ আলি লাঠিয়ালের দল লইয়া দণ্ডায়মান আর স্বয়ং কীর্তিবাবু বন্দুক হাতে উপস্থিত—ইতস্তত দর্শকের দল। সে ছুটিয়া আসিয়া খবরটা নবীননারায়ণকে জ্ঞাপন করিল—এ সংবাদ আমরা পাঠককে আগেই দিয়াছি।

১২

মিলন সর্দার তাহার ছোটভাই সোনা এবং উমীর, কালু প্রভৃতি ছয়জন লাঠিয়ালকে লইয়া অশথতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গা খালি, মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরা, হাতে লাঠি তাহারা দেখিল দশানির মজুরেরা

ইতিমধ্যেই বেড়া দিয়া অনেকটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—আর কাছেই আবেদ আলি তাহার লাঠিয়ালের দল লইয়া প্রস্তুত।

মিলন সর্দারের দলটিকে দেখিতে পাইবা-মাত্র আবেদ আলি হাঁকিয়া উঠিল—সর্দার হুঁশিয়ার! মিলন তাহার কথার উত্তর না দিয়া নিজের দলের প্রতি ইঙ্গিত করিল। তখন তাহাদের ছয়জনের দেহ ছয়টি সরল উন্নত শাল বৃক্ষের মতো বাতাসে দুলিয়া উঠিল, আর সেই সারিবদ্ধ ছয়টি শাল বৃক্ষ অগ্রসর হইয়া চলিল—তাহাদের মাথার উপরে লাঠি ঘুরিতেছে। মিলন সর্দারের দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই মজুরের দল খন্তা হাতুড়ি ফেলিয়া পলায়ন করিল—আর ঠিক সেই সময়েই আবেদ আলি সদলবলে হুঙ্কার ছাড়িয়া রণাঙ্গনে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই দলই সমান শিক্ষিত—এখনো তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরত্ব আছে, দুই দলের লাঠি চক্রাকারে মাথার উপরে ঘুরিতেছে। হঠাৎ যেন বাঁশের লাঠি মাথার উপরে বাঁশের ছাতায় পরিণত—বাঁশের ছাতা ক্রমে লাঠির ছায়াবাজিতে পরিণত। ভালো করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু দুই দল ঘেঁসিয়া আসিতেই লাঠির ঠকাঠক জানাইয়া দিল যে, লাঠিগুলি পাকা বাঁশে তৈয়ারি। সমবেত দর্শকের জনতা অদূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। তাহারা লাঠিয়ালদের আপেক্ষিক গুণ ও কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে লাগিল—কখনো বা বাহবা, কখনো বা সাবাস দিতে লাগিল—কখনো বা হায় হায় করিয়া উঠিল।

"ও কার লাঠি গেল?"

"তেওয়ারির।"

"ঠিক হয়েছে, বেটা রাজপুত কি না।"

"বাহবা, সোনা, বাহবা—"

"হবে না কেন? সর্দারের ভাই তো বটে।"

"দেখো দেখো—আবেদের আস্পর্ধা দেখো—ও যাচ্ছে মিলন সর্দারকে আক্রমণ করতে।"

"ইস্, ওই দেখো ভাই, কালু মাথায় চোট পেয়েছে, একেবারে ব'সে পড়লো।

"ও কে পড়লো—ইদ্রিস না?"

"তোর কেন বাপু হাল ছেড়ে লাঠি ধরা!"

"ওই দেখো—আবেদ আর সর্দারে লেগে গিয়েছে!"

ঠকাঠক্—ঠক ঠক!

"বাঃ বাঃ!"

"আবেদও কম যায় না।"

"কিন্তু তাই ব'লে কি সর্দারের সঙ্গে···"

এমন সময় জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল—

"মরলো, মরলো, আবেদ এবার মরলো!"

সত্যই তাহার হাতের লাঠি ছুটিয়া পড়িয়া গিয়াছিল আর মিলন সর্দারের ভীম লাঠি তাহার মাথার উপরে উদ্যত। আর এক মুহূর্ত······

"গেলো গেলো, আবেদ গেলো!"

ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের শব্দ হইল, পর মুহূর্তেই মিলন সর্দারের গুলীবিদ্ধ দেহ মাটিতে পড়িল। ধোঁয়া মিলাইবা মাত্র সকলে দেখিল মিলনের দেহ মাটিতে পতিত, রক্তে জায়গাটা ভাসিয়া যাইতেছে, সে গতপ্রাণ।

আবেদ চীৎকার করিয়া উঠিল—"কর্তা—একি করলে, একি করলে! আমার দুষমনকে তুমি মারতে গেলে কেন? আমি কি ছিলাম না? এখন আমি কি ক'রে মুখ দেখাবো!"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না, মিলনের ভাই অতর্কিতে তাহার মাথায় আসিয়া বজ্রের বেগে লাঠির আঘাত করিল। আবেদ মাটিতে পড়িল। তাহার দেহটা বার দুই নড়িয়া উঠিল, পা দু'খানি বার দুই সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হইল—তার পরে সব নিস্তব্ধ।

এক মুহূর্তের মধ্যে জোড়া খুন। কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দর্শক ও লাঠিয়ালের দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। যাহারা হাজার জীবিতকে ভয় করে নাই—দুইটি মৃতকে তাহাদের এত ভয়। মৃতকে মানুষের এত ভয় কিসের?

সবশেষে নিরুপায় কীর্তিনারায়ণ ফিরিয়া চলিল। মৃত্যুর জন্য তাহার আক্ষেপ নয়। আবেদ যে জমির দখল না দিয়া মরিল সেইজন্য তাহার উপরে কীর্তির একটা অন্ধ আক্রোশ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, বেটা কথা দিয়া শেষে এমনভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল! একবার পাইলে তাহাকে দেখাইতাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় কই? হায়, হায়, সংসারে তাহা হইলে এমন স্থানও আছে যেখানে কীর্তিবাবুর শাসন চলে না। হঠাৎ কীর্তিনারায়ণ যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে বুঝিতে পারিল সংসারে সে সর্বশক্তিমান নয়।

সেই কর্তিত অশথ বৃক্ষের মূলে দুইটি সদ্য-নিহত মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল। আবেদের কপাল হইতে রক্ত গড়াইয়া আসিয়া তাহার ঈষন্মুক্ত অধরোষ্ঠের মধ্যে পড়িল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দীর্ঘকালের সঞ্চিত রক্তের তৃষ্ণা কি আজ তাহার নিজের রক্ত পান করিয়া নিবৃত্ত হইল? দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ হইতে দুইটি সর্পিল রক্তের ধারা আসিয়া একত্র যুক্ত হইল—তার পরে সেই যুক্ত ধারা গড়াইয়া গিয়া উন্মূলিত অশ্বত্থ-শিকড়ের গর্তে প্রবেশ করিল। লাঞ্ছিত অশ্বত্থ গ্রামের রক্ত পান করিল। গ্রামের প্রথম রক্ত।—কিন্তু ইহাই শেষ নয়।

১

কোথায় যেন কি একটা যোগ আছে, অরণ্যের হীনতম কীট হইতে সমাজের মহত্তম মানুষের মধ্যে, পথের নগণ্যতম ধূলিকণা হইতে আকাশের বৃহত্তম জ্যোতিষ্করাজ্যের মধ্যে। সমস্ত বিশ্বটা যেন অন্তহীন মাল্যাকারে গ্রথিত বিনা সূতার মালা। কিন্তু বিনা সূতায় গাঁথা বলিয়াই যে ঘনিষ্ঠতা অল্প এমন নয়, বরঞ্চ বাহিরের বন্ধনের উপরে নির্ভর করিতে হয় না বলিয়াই যোগটা গভীরভাবে আন্তরিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিপদ এই যে, মানুষের চোখে ভিতরের বন্ধনটা তেমন করিয়া ধরা পড়ে না, তাই তাহাকে অস্বীকার করিবার একটা ঝোঁক মানুষের যেন আছে। নতুবা গ্রামের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষকে কাটিলে গ্রাম ধ্বংস হইতে পারে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু ওই অশথ গাছটিকে বিশ্বমাল্যের একটি গুটি বলিয়া যদি জানিতাম, তবে হয়তো ব্যাপারটাকে এমন অসম্ভব মনে হইত না।

কিন্তু ধ্বংসের লীলার ফলে এমন সর্বনাশ কি নিত্য নিয়ত চলিতেছে না? গিরিশিখরের অরণ্যজাল মানুষের হাতে বিধ্বস্ত হইতেছে—নগ্নীকৃত গিরিশিখর আর তেমন করিয়া আষাঢ়মেঘের কামধেনুকে দোহন করিতে পারিতেছে না, নধর অরণ্যই যে মেঘধেনুর বৎসতর, ফলে ধরণী কি ক্রমে অনুর্বর হইয়া পড়িতেছে না? নগ্নীকৃত মালভূমির বৃষ্টিধারাবাহিত বালুকণায় নাব্য নদী কি কালক্রমে অগভীর ও অনাব্য হইতে হইতে অবশেষে নদীনির্মোক মাত্রে পরিণত হইতেছে না? প্রকৃতিকে আঘাত করিলে সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া যে মানুষের উপরে পড়ে—একথা মানুষে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে, যে মানুষ এখনো সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, মানুষকে আঘাত করিলে সে

আঘাত ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকেই আহত করে? একজনকে আঘাত করিলে সে আঘাতে সমস্ত সমাজ পীড়িত হয়। এমন মানুষকে প্রকৃতির আঘাতের কথা বুঝাইতে চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কি?

মানুষই যে বিধাতার চরম সৃষ্টি, সমস্ত বিশ্বটাই যে তাহার ভোগের জন্য সৃষ্ট, এমন একটা আত্মসর্বস্ব তত্ত্ব মানুষের মনে কেন উদ্ভূত হইল জানি না। হয়তো মানুষ বিশ্বমাল্যের দুর্লভতম অক্ষ, হয়তো মানুষ বিশ্বমাল্যের সুন্দরতম মাণিক্য, হয়তো বা তাই। কিন্তু তাহাতেই বা কি আসে যায়? মাল্যের সত্তা তো দুর্লভতম সুন্দরতমের উপর নির্ভর করে না—দুর্বলতম গ্রন্থির উপরেই মাল্যের অস্তিত্বের নির্ভর।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশ্বব্যাপারের দীনতম ঘৃণ্যতমকেও লোপ করিয়া দিবার যৌক্তিকতা যদি না থাকে, তাই বলিয়া কি সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি মারাত্মক পশুকে লইয়াও ঘর করিতে হইবে? রোগের বীজাণুও তো এই বিশ্বব্যাপারের অঙ্গ—তবে তাহাকেই বা বর্জন করা চলে কোন্ যুক্তিতে? যুক্তিটা আজিও মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিভাবে বাঁচিলে যথার্থ বাঁচা হয়? জীবন-শিল্প যাহার প্রকৃত নাম, তাহা কি মানুষ আজ শিখিয়াছে? যেদিন সে জীবন-শিল্প-পারঙ্গম হইবে সেদিন নিশ্চয় সে দেখিতে পাইবে, সাপ বাঘ প্রভৃতি অরণ্যের শ্বাপদ ও মারাত্মকতম ব্যাধির বীজাণুর স্থানও বিশ্বে রহিয়াছে এবং অপরকে ব্যাহত না করিয়াই রহিয়াছে। এই অমৃততত্ত্ব আবিষ্কার করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা এবং ইহাই মানুষের অমরত্বলাভ। এতদধিক অমরত্ব যদি থাকে, তবে তাহা কল্পনা মাত্র। কেবল এই আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই বাস্তব ও কল্পনার যুক্তবেণী গ্রথিত।

কিন্তু এই আবিষ্কারের আজও অনেক বিলম্ব। তাই সে গ্রামের একটি নিরীহ অশত্থ বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া মনে করে গ্রামের উন্নতি করিতেছে, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে তাহার কার্যের ফলে গ্রামের সর্বনাশের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়া গেল।

জোড়া খুনের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে দারোগা রামনাথ রায় দশানির কাছারিতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছেন। পদার্পণই বটে, কারণ তাঁহার কথা শুনিলে ও আচরণ দেখিলে তাঁহাকে কোম্পানির দারোগা না মনে হইয়া ভবজলধির একটি বৃহৎ পরমহংস বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি কাছারির তক্ত-পোষের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া সুখাসীন হইয়াই জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন। আর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন হাতের কাছে যাহাকে পায় তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া অতলে টানিতে থাকে, তেমনি তিনি নায়েব দুর্গাদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া জন্মান্তরবাদের গভীর স্রোতের মধ্যে লইয়া ফেলিলেন। এই স্রোত যদি রূপকমাত্র না হইয়া সত্য হইত তবু দুর্গাদাসের আপত্তি করিবার উপায় ছিল না—কারণ জমিদারের নায়েব বাদীই হোক আর প্রতিবাদীই হোক, দারোগার সন্নিধানে চিরকন্যাদায়গ্রস্ত পিতা।

দারোগাবাবু বলিতে লাগিলেন—বুঝলেন নায়েব মশাই, মনে সাধ ছিল, সংস্কৃত শিখবো, আর সংস্কৃত শিখে আমাদের সনাতন শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করবো। একে ব্রাহ্মণের ছেলে, তায় ছোটবেলা থেকেই আমার ওই দিকে ঝোঁক।

দুর্গাদাস নীরবে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে রামনাথবাবুর কথা শোনে, আর চোখে দেখে—ইস্, দারোগাবাবুর পাঁচনরা কণ্ঠি মাংসল গ্রীবার খাঁজে খাঁজে বসিয়া গিয়াছে! সে বুঝিতে পারে না, কণ্ঠির দৃঢ়তা বেশি কি গ্রীবার মাংসপেশীর দৃঢ়তা অধিক। গ্রীবা স্ফীত হয়, কণ্ঠি বিচলিত হয়—অথচ কণ্ঠি ছেঁড়ে না, দুইয়ে বেশ আপোষ হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাস দারোগাবাবুর দেহের বিপুলতায় চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে থাকে—হাঁ, প্রাচীন মুনি-ঋষিদের যোগ্য উত্তরাধিকারী বটে! দাস পণ্ডিত না হইলেও রামায়ণ-মহাভারতের সহিত পরিচিত। তাহার মনে পড়িয়া যায়, নৈমিষারণ্যে যজ্ঞোপলক্ষে যে শত সহস্র

মুনি-ঋষি সমবেত হইতেন, তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা এই রামনাথবাবুর অনুরূপ।

রামনাথবাবু বলিতে থাকেন—কিন্তু আমার পোড়াকপালে সে সৌভাগ্য হবে কেন? এমন সময়ে পিতার মৃত্যু হ'ল, খুড়ো দিলেন ঠেলে পাঠশালায়, তারপর দেখছেন যা করছি।

দুর্গাদাস একবার ভাবে যে দারোগাবাবুর পিতার মৃত্যুতে জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তজ্জন্য সময়োচিত কিছু বলা উচিত কি না, কিংবা একবার অশ্রু-মোচনের ভাণ করা উচিত কি না—কিন্তু হঠাৎ তাহার চোখে পড়ে দারোগাবাবুর বিপর্যয় টাক-টি। ইতিপূর্বে বহুবার এই টাক সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়? প্রথম দর্শনের বিস্ময় কখনই কাটিতে চায় না। কোথায় যে কপালের শেষ আর টাকের শুরু সে সীমান্ত আবিষ্কার এক গবেষণার বিষয়। খোশামুদের দল দারোগাবাবুর সম্মুখে বলাবলি করে—হুজুরের কি দরাজ কপাল! নিন্দুকের দল আড়ালে বলিয়া থাকে—বাপ্ রে, কি টাক—একেবারে নাক থেকে শুরু!

দারোগাবাবু বলেন, নায়েব মশাই, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন বসুন। তারপরে একটু থামিয়া বলেন, আহা কি মধুর বাণী—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'—আহা এমন বাণী এই সনাতন আর্যভূমি ছাড়া আর কোথায় উচ্চারিত হয়েছে?

দুর্গাদাসের হঠাৎ নজরে পড়িয়া যায়—খাঁকি সরকারী কোর্তার ফাঁক দিয়া দারোগাবাবুর শুভ্র স্থূল উপবীতটা দৃশ্যমান। তাহার মনে হয়, সনাতন সভ্যতার এ এক চিরন্তন মহিমা। ম্লেচ্ছের পোশাক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রধানতম চিহ্নটিকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। দুর্গাদাস পাশের ব্যক্তিটিকে ইঙ্গিতে পৈতাটি দেখাইয়া দেয়। সে এবং তৎপার্শ্ববর্তী সকলে উকিঝুঁকি মারিতে থাকে। হঠাৎ দারোগাবাবু সচেতন হইয়া বলিয়া ওঠেন, ও জিনিসটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলাম না, রক্তের এমনি সংস্কার। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলেন যে, যখন হালখড়ি থানায় ছিলাম, পাশের গাঁয়ে ছিল

এক মিশনারি সাহেব। সে প্রায়ই বলতো—মিঃ রায়, ওটা ছাড়ো, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ব'লে তোমার উন্নতি ক'রে দিচ্ছি! কিন্তু কই, পারলাম তো না। বুঝলেন, নায়েব মশাই, রক্তের সংস্কার কি সহজে যায়।

কাছারির আমলাগণ অবাক হইয়া দেখে—বাস্তবিক এমন সদাশয় লোক আর হয় না। কথায় কথায় হাসি, অনেকগুলি দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় সে হাসি অনর্গল ধারায় মুখ ছাপাইয়া দেহ ছাপাইয়া ফরাসের উপরে আসিয়া পড়ে। লোকটি বহুভাষী হইলেও মৃদুভাষী। শ্বাপদের কোমল পদশব্দের মতো একপ্রকার মৃদুতা আছে তঁহার কণ্ঠস্বরে। সকলে আরো দেখে যে তাঁহার মরিচা-ধরা লোমশ নাসিকাটি গরুড়ের চঞ্চুর মতো অত্যন্ত ধারালো।

এমন সময়ে দুর্গাদাস বলিয়া ওঠে—অনেক রাত হয়েছে, হুজুরের আহারের কি ব্যবস্থা করবো?

আহারের কথা শুনিয়া রামনাথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সে হাসি আর থামিতেই চায় না। হো হো হা হা! ভাবটা, এমন অবান্তর অসম্ভব কথা তিনি জন্মে শোনেন নাই!—আহার এই বয়সে আবার? নায়েব মশাই কি যে বলেন!

উপস্থিত সকলে দারোগাবাবুর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা ভাবিল প্রাচীনকালের মুনি-ঋষির রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত না থাকিলে এমন বিষয়-বৈরাগ্য কখনই সম্ভবপর হয় না। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, নিজেদের ক্ষুধার সহিত দারোগাবাবুর স্পৃহা-হীনতার তুলনা করিয়া তাহারা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্গাদাস জমিদারের নায়েব, দারোগার কথাকে বিশ্বাস করিতে সে শেখে নাই, বিশেষ জমিদার-বাড়িতে আসিয়া ক্ষুধা নাই বলিলে দারোগার জন্য আহারের আয়োজন আরো বিরাট আকারে করিতে হয়—সে শিক্ষাও তাহার আছে। সে শুধু বলিল,—হুজুর, রাত অনেক হয়েছে।

দারোগাবাবু একবার পকেট-ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—তা

বটে। তারপরে দু'একবার নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারণ করিলেন, আহার! আহার! আবার কণ্ঠস্বরে মানবীয় মূর্ছনা আনিয়া বলিলেন—কি আর বল্‌বো! অনেক দিন থেকে রাতের বেলায় লুচির অভ্যাস। লুচি, সেই সঙ্গে কিছু ভাজাভুজি। নায়েব মশাই, তাই ব'লে মাংসটা আমার রাতের বেলায় একদম চলে না।

দুর্গাদাস বলিল—তা খাসিটা আজ থাকুক, কাল দুপুরবেলা ভোগে লাগবে।

দারোগাবাবু আহার্যের পূর্বসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া চলিলেন, আর সব-শেষে একবাটি দুধ—ব্যস্! তাই ব'লে ক্ষীর নয়। আপনাদের গাঁয়ে আবার দুধ সস্তা, কিন্তু বুড়ো বয়সে আমাকে ক্ষীর দিয়ে অপদস্থ করবেন না।

দুর্গাদাস পাকা লোক। দারোগাবাবুর কথার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ দুই-ই সে বোঝে। একথা দারোগাবাবুও জানেন। কাজেই কোনো পক্ষে অসুবিধা হইবার কথা নয়। উপস্থিত সকলে সংসার-বিরাগীর আহারে বীতস্পৃহতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সব তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করিবার পাত্র দারোগাবাবু নহেন, তাই অবিলম্বে পুনরায় জন্মান্তরবাদের সুগভীর আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। উপস্থিত শ্রোতার দল দেখিয়া বিস্মিত হইল, গীতা ও ক্ষীর কেমন গায়ে গায়ে সংলগ্ন—একটি হইতে পা বাড়াইলেই অপরটিতে গিয়া পৌছান যায়। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে সমস্ত চরাচর করতলগত আমলকবৎ।

পরদিন সকালে দারোগাবাবু যখন নিজের দাঁতন দিয়া সবেগে দন্তধাবন করিতেছিলেন এমন সময় কাছারির সম্মুখে একখানা এক্কাগাড়ি আসিয়া থামিল। এক্কা হইতে শীর্ণ কৃষ্ণকায় এক বৃদ্ধ নামিল। তাহার মাথায় শামলা, কালো চাপকানের উপরে পাকানো চাদর, গুঁফো-বন্ধনীর অভ্যন্তরে দোক্তার দাগ ধরা ওষ্ঠাধর। তাহাকে দেখিয়াই রামনাথবাবু দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—সুরেনদাদা যে—প্রাতঃপ্রণাম।

সুরেনদাদা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—আহা আহা, কি করেন, ব্রাহ্মণ হয়ে ও আবার কি?

রামনাথবাবু বলিলেন—হ'লে কি হয়, তাই ব'লে কি বয়সের মর্যাদা নেই। আসুন, আসুন,—ওরে তামাক দে!

বাস্তবিক এই দুইজনের মধ্যে কে যে কাহার চেয়ে জ্যেষ্ঠ—সে এক বিষম সমস্যা।

পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন, এ সংসারে আর কে থাকিতে পারে যাহাকে স্বয়ং দারোগা এমন সভয়ে অভ্যর্থনা করে? কথাটা একেবারে অমূলক নয়, এরূপ ব্যক্তি সংসারে বিরল হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সর্বভীতিকর দারোগাবাবুরাও মফস্বল আদালতের মোক্তারবাবুকে ভয় না করিয়া পারেন না। কেন এমন হয়? তাহার একটিমাত্র কারণ এই যে, বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা, দারোগাবাবুরাও মানুষ। তাঁহাদেরও সুদিন-দুর্দিন সময়-অসময় আছে। সেই দুঃসময়ে একটা শক্ত মোক্তাররূপী খুঁটি পাইলে আর কোনো ভয় থাকে না।

সুরেন মোক্তার এ অঞ্চলের দৃঢ়তম খুঁটি। খুনের আসামীকে তিনি ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে নামাইয়া আনিতে সমর্থ। কতবার কত দারোগার ঘুষের কলঙ্ক তিনি জেরার সময়ে বানচাল করিয়া দিয়াছেন। হাকিমরা অবধি তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। অবশ্য তিনিও হাকিমদের শুশ্রূষা করিতে ভোলেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি হাকিম-মহলে কচি ডাব ভেট দেন, শীতকালে খাসি, আর শীতে গ্রীষ্মে সমানভাবে চলে এমন বস্তু তিনি রাত্রিবেলায় হাকিমদের খাস কামরায় পৌঁছাইয়া দেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই এমন অব্রাহ্মণ সুরেন মোক্তারকে ব্রাহ্মণ রামনাথবাবু যদি একটা প্রণাম করিয়াই ফেলেন তবু তাঁহাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলা চলে না।

দারোগাবাবু সুরেন মোক্তারকে সাদরে লইয়া গিয়া নিজের কক্ষে বসাইলেন। এমন সময়ে দু'জনের জন্য চা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দারোগা ও মোক্তার পাশাপাশি বসিয়া কুশলপ্রশ্নাদি-সমন্বিত চা-পান শুরু করিলেন। দারোগা-মোক্তারের এই অর্ধনারীশ্বর রূপ যাহারা না দেখিয়াছে তাহাদের জীবনটাই বৃথা। ইঁহাদের সহযোগিতার ফলে কোম্পানির রাজত্ব

চলিতেছে—বিরোধিতা করিলে ইঁহারা কোম্পানির রাজত্বের ভরাডুবি করিয়া ছাড়িতে পারেন, এমনই ইঁহাদের মাহাত্ম্য।

রাত্রের উল্লিখিত সেই খাসিটি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিয়া রামনাথবাবু চারিজন কনস্টেবল সঙ্গে লইয়া জোড়া খুনের তদন্তকার্য আরম্ভ করিলেন। একটি মত্ত হস্তীকে পদ্মবনে ছাড়িয়া দিলে যেমন হয় তদন্তান্তে গ্রামের অবস্থা অনেকটা তেমনি ঘটিল। উপরের জল নীচে গেল নীচের জল উপরে উঠিল, পঙ্ক এবং পঙ্কজে মাখামাখি হইয়া গেল। তদন্ত শেষ করিয়া এবং দশানি ছ'আনি দুইপক্ষ হইতে অ ড়াই-হাজার আড়াই-হাজার মোট পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিয়া নিরপেক্ষ রামনাথবাবু দুই পক্ষের জন-কুড়িপঁচিশ লোককে চালান দিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পরজন্মে যাহাতে তাঁহাকে আর দারোগাবৃত্তি করিতে না হয় সেই আশা সকলকে বিজ্ঞাপিত করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

দারোগাবাবু বিদায় হইয়া গেলে সুরেন মোক্তার দুর্গাদাসকে বলিল—দেখলেন বেটার কাণ্ড! চামার কোথাকার।

দুর্গাদাস দশানির পুরাতন কর্মচারী। সে দীর্ঘ চাকরি-জীবনে চামার কামার দারোগা পুলিশ উকিল মোক্তার এত দেখিয়াছে যে কিছুতেই তাহার আর এখন বিস্ময়বোধ হয় না। সে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন মোক্তার বলিল—ও যা পারে করুক। সব আমি জামিনে খালাস ক'রে আনবো। তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার হেতু ছিল না। সে মফস্বল-আদালতের প্রবীণতম মোক্তার। দশানি তাহার পুরাতন ঘর। অনেক জেল, ঘর-জ্বালানি, খুন-জখমের মামলার আসামীকে সে বে-কসুর খালাস করিয়া দিয়াছে। এবারেও খুন হইবার সংবাদ পাওয়া-মাত্র সে দ্রুত চলিয়া আসিয়াছে। সকলকে যথাবিহিত উপদেশ দিয়া, তদ্বিরের মোটা ফি আদায় করিয়া লইয়া সে-ও যথাসময়ে প্রস্থান করিল।

৩

একদিন সকালে উঠিয়া নবীননারায়ণ দেখিল, মুক্তামালা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নবীন বিস্মিত হইয়া বলিল—একি, তুমি হঠাৎ!

মুক্তামালা বলিল—একজন দু'দিনের জন্য এসে যাবার কথা ভুলে গেলে আর-একজনের হঠাৎ আসা ছাড়া আর উপায় কি?

নবীন বলিল—যাক্, এসেছ ভালোই হয়েছে, এসো ব'সো।

মুক্তামালা হাসিয়া বলিল—বাঃ বেশ তো! আমারই বাড়িঘর, আর আমাকেই অতিথির মতো অভ্যর্থনা করছে।

নবীন পাল্টা হাসিয়া বলিল—এ গাঁয়ে তো তুমি অতিথি হয়েই রইলে। নিজের আসন তার বেশি তো পাকা করলে না। আচ্ছা, সে তর্ক না হয়ে পরে ধীরে-সুস্থে হবে, কিন্তু আগে বলো তো স্টেশন থেকে তুমি এলে কি ক'রে? পাল্কি তো যায়নি।

মুক্তামালা বলিল—ঘোড়ার গাড়ি ক'রে এলাম।

নবীন বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ! ঘোড়ার গাড়ি ক'রে, তাও আবার একলা!

মুক্তামালা বলিল—কেন, এতে সর্বনাশের কি আছে? তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ও বুঝেছি, চৌধুরীবাড়ির বউ কখনো ঘোড়ার গাড়ি ক'রে এ গাঁয়ে আসেনি, এই তো! চৌধুরীবাড়ির বউ আসবে পাল্কি চেপে, তার আগে-পিছে ছুটবে আশাসোটাধারী পাইক—তাই না?

নবীন বলিল—যাক্, যা হবার হয়েছে, এখন হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কিছুক্ষণ পরে দুইজনে একান্তে বসিলে পত্নী শুধাইল, কি ব্যাপার বলো তো, এখানে এসে এমন আট্‌কে পড়লে কেন?

এই একমাসকালের মধ্যে জোড়াদীঘিতে যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে মুক্তামালা তাহার কিছুই জানিত না। নবীন তাহাকে লেখে নাই। এ সব বিষয়সম্পত্তির কাণ্ড, লাঠালাঠির ব্যাপার মুক্তামালা ভালো বুঝিত না, তাহার ভালো লাগিত না, নবীন জানে, কাজেই ইচ্ছা করিয়াই লেখে নাই।

এখন সে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা, আর ঘটনার তলে যে ভাবনা রহিয়াছে, আনুপূর্বিক সব কথা মুক্তামালাকে বলিল। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে মুক্তামালার বিশেষ একটি বসিবার ভঙ্গী ছিল। বাম হাতে চিবুক রাখিয়া, ডান হাতের তর্জনী দিয়া গলার হারটিকে বার বার জড়াইত আবার খুলিত, চোখে মুখে শ্বেতপাথরের শুভ্র নীরবতা। নবীননারায়ণের পরিচিত সেই ভঙ্গিমা সর্বদেহে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া মুক্তামালা নিস্তব্ধভাবে শুনিয়া গেল।

নবীনের বক্তব্য শেষ হইলে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—কি জানি, আমি এ সব ভালো বুঝতে পারি না। আমি যে ঘরে মানুষ, তাদের কাছে এমন সব ঘটনা উপন্যাসের বস্তু।

নবীন বলিল—সেই উপন্যাসের পটভূমি এই সব গ্রাম—আর সেই উপন্যাসের লেখক পুরাতন জমিদার-বংশের প্রভু এবং ভৃত্যের দল। আমাদের কলঙ্কের কালোয় আর মিলন সর্দার দলের রক্তের লালে সেই উপন্যাসের ছত্রের পর ছত্র লিখিত হয়ে চলেছে। আর তুমি ভাগ্যের ইঙ্গিতে সেই উপন্যাসের পাঠকের ঘর থেকে লেখকের ঘরে এসে পড়েছ।

মুক্তামালার চিন্তাকরুণ মুখ আর এই বসিবার ভঙ্গীটি নবীননারায়ণের খুব ভালো লাগে। আলাপের মুখর স্রোত নৈঃশব্দ্যের সমুদ্রে আসিয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল, সেই অতল সমুদ্রের নীল পদ্মের উপরে মুক্তামালা অকূলের কমলে-কামিনীর মতো প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তাহাকে সুন্দরী বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। তাহার সৌন্দর্যে এমন একটি প্রশান্ত মহিমা আছে যাহাতে তাহাকে গৃহের দীপ বলিয়া মনে না হইয়া আকাশের সন্ধ্যার তারা বলিয়া মনে হয়। পথের ক্লান্তি ও রাত্রিজাগরণের অনিয়ম সেই সন্ধ্যাতারার উপরে একখানি সূক্ষ্ম মোহময় কুয়াসা বিস্তারিত করিয়া দিয়া তাহাকে যেন আরো দূরতর আরো সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশরাশির ঈষৎ বিস্রস্তি, তাহার নীলাভ -ধূসর শাড়ীর ঈষৎ অপারিপাট্য, তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের ঈষৎ জড়িমা জড়িত দৃষ্টি তাহাকে বাসনার দিগন্তের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে; অথচ সে উচ্চতা এত

অধিক নয় যে একবার হাত বাড়াইয়া তাহাকে করায়ত্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। ওইখানেই তাহার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য। উর্বশীর সৌন্দর্যের চপল মোহ এবং লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের অচপল আশীর্বাদ তাহার দেহে যেন যুগলে একক হইয়া বিরাজমান। সেইজন্যই তাহাকে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আর যে নারীকে বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়, সে যেমন পুরুষকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, এমন আর কেহ নয়। যে নারী সহজবোধ্য, আর যে নারী একেবারেই দুর্বোধ্য—তাহারা উভয়েই পুরুষের মনকে প্রতিহত করে, একজন অতিপরিচয়ের অনাসক্তিতে, অপরজন অপরিচয়ের আসক্তিহীনতায়। কিন্তু যে নারী পুরুষের মনকে আসক্তির আকর্ষণ ও দুষ্প্রাপ্যতার দুরাশার মধ্যে চিরকাল দোলায়িত রাখিতে পারে—আশা ও আশাতীতের মধ্যে তরঙ্গিত করিতে সমর্থ হয়—প্রেয়সীত্ব ও গৃহিণীত্বের মধ্যে পুরুষবাবৎ ভ্রমণ করাইয়া ফিরিতে বাধ্য করিতে পারে, তাহারাই পুরুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ বস্তুটি সাধনালভ্য নয়, যে পারে সে সৌন্দর্য-দীক্ষার সহজাত অধিকারের বলেই পারে। মুক্তামালা সেই জাতির নারী, সেই সহজ অধিকার লইয়াই সে জগতে আসিয়াছে।

মুক্তামালা চপল চটুল তটিনী নয়, আবার সে অকূল অতল সমুদ্রও নয়; তটিনী যেখানে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, মুক্তামালা সেই সমুদ্র-সঙ্গম, দুকূল ও অকূলের টানাপোড়েনে বোনা অলৌকিক চেলাংশুকে অবগুণ্ঠিতা—সে পুরুষ-চিত্তের চিরকালের প্রেয়সী।

এই শ্রেণীর নারীর প্রেমে একটি অটল গাম্ভীর্য থাকে। তাহাদের ভালোবাসা কাজে প্রকাশ পায়, কথায় নয়। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষের এমনি বালকোচিত ভাব যে কথার ভালোবাসাই তাহাদের কাম্য, তাহার অধিক না পাইলেও তাহারা ক্ষতি গণে না। সংসারের কাজে এমনি তাহারা ব্যস্ত যে, মুখে দু'চারবার ভালোবাসি, ভালোবাসি শুনিলেই তাহারা খুশি, আসলে ফাঁকি পড়িল কিনা, সে হিসাব মিলাইবার সময়ের তাহাদের একান্ত অভাব। এই মেয়েদের লইয়াই সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির শিখরে অটল তুষারস্তূপ জমিলে যে-রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে, মুক্তামালার ব্যক্তিত্বে সেই

বিভ্রান্তির উপাদান সুপ্রচুর। তাহার হৃদয়ের প্রেমের অগ্নিরস অটল গাম্ভীর্যের শীতলতার দ্বারা আবৃত। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, কিন্তু সেই দুঃখের আঘাতেই একদিন তুষাররাশি উদ্ভিন্ন হইয়া বাসনার বহ্নিময়ী ভোগবতী আত্ম-প্রকাশ করে। ইহাদের না পাইলে পুরুষের চলে, কিন্তু মানুষের চলে না। ইহারাই শিল্প-লক্ষ্মীর চরণাশ্রয় কুবলয়।

৪

পরদিন সকালে মুক্তামালা স্বামীকে বলিল—আমি একবার কাকীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

নবীননারায়ণ বিস্মিতভাবে শুধাইল—কোন্ কাকীমা? কীর্তিদাদার মা?

মুক্তামালা বলিল—হাঁ, কিন্তু চমকে উঠলে কেন?

নবীন প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি না দিয়া বলিল—সেখানে তুমি যাবে?

পত্নী বলিল—ক্ষতি কি?

নবীন বিস্ময় ও অসন্তোষ চাপিয়া রাখিয়া বলিল—না ক্ষতি নেই।

নবীন কোনদিনই মুক্তামালাকে পুরাপুরি বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না। স্ত্রী যে তাহাকে ভালোবাসে, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু ভালোবাসা আর মানুষকে বোঝা এক কথা নয়! বরঞ্চ যাহাকে ভালোবাসা যায়, তাহাকেই যেন বুঝিয়া ওঠা কিছু দুরূহ। রঙীন কাচ মানুষের দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া দেয়, অনুরাগ কাচের সেই রঙটি।

নবীনের মনে হইল, মুক্তা তাহাকে ভালোবাসিলেও তাহার বংশমর্যাদার প্রতি যথেষ্ট সচেতন নহে, নতুবা যাহার সহিত আজ পারিবারিক বিরোধ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, যাহার সহিত কোনকালেই পারিবারিক সৌহার্দ ছিল না, স্বেচ্ছায় আজ তাহার বাড়িতে যাইতে সে উদ্যত হইত না। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, মুক্তামালা স্বেচ্ছায় যে গ্লানি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে স্বামীর কল্যাণ কামনা। যদি তাহার অযাচিত সাক্ষাতের

ফলে পারিবারিক বিরোধটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার স্বামী যে নিদারুণ মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার পাইবে—ইহাই কি তাহার মনের কামনা নয়? স্বামীর অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া একাকী কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাতে কি তাহার ভালোবাসার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না? এসব কোনো কথাই নবীনের মনে উঠিল না। সে মুক্তামালাকে নিরস্ত করিল না বটে, কিন্তু মনটা তাহার অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। ভালোবাসার কথা যত সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ বুঝিয়া ওঠা যদি তত সহজ হইত, তবে সংসারের দুঃখ-কষ্টের ভার বুঝি অনেকটা লঘু হইয়া যাইত।

মুক্তামালা একটি ঝি সঙ্গে করিয়া যখন দশানির অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিল, কীর্তিনারায়ণের মাতা অম্বিকাদেবী তখন পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। হঠাৎ মুক্তামালাকে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত আনন্দে শুধাইলেন, বৌমা, তুমি কবে এলে? তারপরে পুত্রবধূর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একখানা আসন দাও মা।

মুক্তামালা শাশুড়ী ও পুত্রবধূকে প্রণাম করিয়া আসনখানা গুটাইয়া রাখিয়া মেঝেয় বসিতে বসিতে বলিল—কাল সকালে এসেছি।

মুক্তামালা বিবাহের পরে বার দুই মাত্র দিন কয়েকের জন্য গ্রামে আসিয়াছিল। অম্বিকাদেবীর বা তাঁহার পুত্রবধূর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়। এত স্বল্প পরিচয়ে পুরুষেরা পরস্পরকে মনে রাখিতে পারে না। পরস্পরকে মনে রাখিবার জন্য মেয়েদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দরকার হয় না। কিন্তু রহস্য এই যে, পরিচয় যত দীর্ঘকালেরই হোক না কেন, সে পরিচয় কখনো ঘনীভূত হইতে পারে না। বিবাহিত নারী স্বামী-পুত্র ব্যতীত নির্বান্ধব।

অম্বিকাদেবী বলিলেন—বৌমা, তোমার শরীর তো ভালো দেখছিনে! আমাদের এখানেই যেন ম্যালেরিয়া, কিন্তু কলকাতায় থেকেও তোমার শরীর কেন কৃশ? কলকাতা থেকে আসার পরে নবীনের শরীরও রোগা দেখেছিলাম, এখানে এসে তবু যেন খানিকটা সেরে উঠেছে। তারপরে হাসিয়া বলিলেন, যাই বলো বাপু, তোমাদের কলকাতা নামেই স্বাস্থ্যকর।

মুক্তামালা হাসিয়া বলিল—না, মা, আমি ভালোই আছি। তারপরে কীর্তিনারায়ণের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল—দিদির শরীর তো ভালো দেখছিনে।

নিজেকে আলোচনার লক্ষ্য হইতে দেখিয়া কীর্তিনারায়ণের স্ত্রী রুক্মিণী ঘোমটাখানি আরো একটু টানিয়া নামাইয়া দিল। ঘোমটার মস্ত সুবিধা এই যে, দেখা না দিয়াও প্রতিপক্ষকে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই পুরুষের ঘোমটার বিরুদ্ধে এত আপত্তি এবং মেয়েদের ঘোমটার প্রতি এত আসক্তি।

অম্বিকাদেবী বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া বলিলেন—চলো মা, ভালো হয়ে বসা যাক।

তাঁহারা তিনজনে শোবার দালানের বারান্দায় আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিলেন। অম্বিকাদেবী বলিলেন—নিজের গাঁয়ে এসেছ বৌমা, ভালোই, কিন্তু তোমার অভিসন্ধি খারাপ নয় তো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে তুমি নবীনকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছ।

মুক্তামালা বলিল—উনি কি আমার কথা শোনেন?

অম্বিকা বলিলেন—শুনলে বোধ করি নিয়েই যেতে?—রুক্মিণী ঘোমটার আড়ালে দুইবার হাসিল।

এমন সময় কীর্তিনারায়ণের মেয়ে লক্ষ্মী দশ-পঁচিশ খেলিবার সঙ্গী সন্ধান করিতে আসিয়া নূতন লোক দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নবাগন্তুকের সম্মুখে খেলুড়ি সন্ধান উচিত কি না, বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। লক্ষ্মীর বয়স দশ বৎসর।

অম্বিকা বলিলেন—লক্ষ্মী, এঁকে প্রণাম করো, তোমার কাকীমা হন।

লক্ষ্মী মুক্তামালাকে প্রণাম করিয়া তাহার গা ঘেসিয়া বসিয়া বলিল—কাকীমা, তুমি দশ-পঁচিশ খেলতে জানো?

সকলে হাসিয়া উঠিল। মুক্তামালা বলিল—জানি না, কিন্তু তুমি শিখিয়ে দিলে শিখে নিতে পারি।

— তবে চলো না, কাকীমা, আমি শিখিয়ে দেবো। এই বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী বলিল—খুব সহজ শেখা। এই দেখো না, কড়িগুলো এইভাবে নিয়ে—এই পর্যন্ত বলিয়া কড়িগুলো নিক্ষেপ করিয়া ধরিবার কৌশল সে দেখাইতে আরম্ভ করিল। উৎক্ষিপ্ত কড়ির অনেক কয়টিকে ধরিয়া বলিয়া উঠিল—দেখলে তো! চলো আমি শিখিয়ে দেবো, কোনো ভয় নেই।

মুক্তা বলিল—তুমি থাকতে ভয় কি? কিন্তু আজ নয় মা, আর একদিন এসে খেলে যাবো, আজকে কাজ আছে।

লক্ষ্মী নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, দশ-পঁচিশ খেলা ছাড়া মেয়েমানুষের আর কি কাজ থাকিতে পারে।

অম্বিকা লক্ষ্মীকে বলিলেন—যাও মা, এখন আমরা গল্প করছি।

অম্বিকা যখন লক্ষ্মীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, মুক্তামালা লক্ষ্য করিল, অম্বিকাদেবীর ছোট করিয়া ছাঁটা চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে, মুখশ্রীতে বার্ধক্যের শান্তি বিরাজিত, কিন্তু জরার গ্লানি এখনো দেখা দেয় নাই। কোনো কোনো নারী আছে, যাহাকে দেখিবামাত্র 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, অম্বিকাদেবী সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মুক্তামালা অম্বিকাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বড়ঠাকুর বুঝি কাছারিতে বসেছেন? তাঁকে একবার প্রণাম করবার ইচ্ছা।

অম্বিকা বলিলেন—না, এখনো সে ভিতরেই আছে, তুমি একটু বোসো, আমি ডেকে আনছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইবার রুক্মিণী মুক্তামালার সহিত কথা বলিবার অবকাশ পাইল। রুক্মিণী বলিল—বোন, তোমাকে একটু নিরিবিলি পেয়েছি, একটা কথা বলে নেই। এই যে গোলমাল বেধে উঠেছে, এর জন্য ঠাকুরপোর কিছুমাত্র দোষ নেই। আমরা সবাই জানি, কিন্তু কিছু বলবার উপায় কই? এ-গাঁয়ের সবাই জানে ও-জমিটা তার।

মুক্তামালা বলিল—তা হ'তে পারে। কিন্তু গাছটা কাটতে যাওয়া তার

উচিত হয়নি। তার পরে একটু থামিয়া বলিল—হতদিনের গাছটা, তার উপরে সবাই ওটাকে ভক্তি করতো।

এমন সময়ে কীর্তিনারায়ণকে লইয়া অম্বিকা প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—ও বাড়ির বৌমা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছেন।

মুক্তামালা কীর্তিনারায়ণের পায়ের ধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

কীর্তিনারায়ণ শুধাইল—বৌমার শরীর ভালো তো? মাঝে মাঝে গ্রামে আসতে হয়। কলকাতায় থাকলে চলবে কেন।

এসব কথার কি উত্তর দিবে মুক্তামালা ভাবিয়া পাইল না; সে বুঝিল, এসব কথা উত্তরের আশায় লোকে বলে না, কিছু বলিতে হয় তাই বলে।

কীর্তিনারায়ণ বাহিরে যাইবার জন্য রওনা হইল, খানিকটা গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মা, বৌমাকে বলে দিয়ো দেউড়ি দিয়ে এ বাড়িতে এসে কাজটা তিনি ভালো করেননি। যাবার সময়ে যেন খিড়কি দিয়ে যান।

এবারে মুক্তামালা উত্তর দিল। সে বলিল--খিড়কির পথ জঙ্গলে ভরা তাই দেউড়ি দিয়ে এলাম।

কীর্তি বলিল, আমি জঙ্গল পরিষ্কার করতে হুকুম দিয়ে দেবো। কিন্তু দেউড়ি দিয়ে আসাটা আমি পছন্দ করিনে—আব্রু ব'লে একটা পদার্থ আছে। এ তোমাদের কলকাতা নয়। এই বলিয়া সে আবার রওনা হইল।

অম্বিকা বলিলেন—ওরে কীর্তি, একবার আমার কাশী যাবার কথাটা ভেবে দেখিস্। কতবার তোকে বলেছি, তুই কানই দিস্ না।

কীর্তি বলিল—এবারও দিলাম না। অম্বিকা বলিল—বয়স হ'ল, কবে মরবো।

কীর্তি বলিল—সে কি মা, তুমি বয়সের কথা তুললে আমারও যে বয়সের কথা মনে প'ড়ে যায়। না মা, তোমার কাশী যাওয়া হবে না। এই বলিয়া চটির শব্দে অন্দরমহল প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময়ে লক্ষ্মী ছুটিয়া ঢুকিল, বলিল—কাকীমা, আমার বেঁজির ছানা

দেখ। এই বলিয়া আঁচলের ভিতর হইতে একটি ছোট বেঁজির ছানা বাহির করিল।

লক্ষ্মী বলিল—দেখো, দোখো, পিট পিট ক'রে তাকায়, আর সলতে দিয়ে দুধ চুষে খায়। বুঝলে বাকীমা, এটা বড় হ'লে এ'কে দুধ-কলা খাওয়াবো ব'লে আমি একটা কলাগাছ পুঁতেছি।

সকলে হাসিয়া উঠিল। মুক্তা বলিল—আর দুধের জন্য একটা গাই পোষো।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো বোধ হইল না, সে বলিল—কর্তা মা, একটা গাই কিনে দাও।

অম্বিকা বলিলেন—আমি কোথায় টাকা পাবো? তোর বাপকে বল্।

এমন শুভকার্যে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া বিনা ভূমিকায় বেঁজির ছানাটিকে তুলিয়া লইয়া লক্ষ্মী পিতার উদ্দেশে ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

বেলা অনেক হইয়াছে বলিয়া মুক্তামালা অম্বিকাকে প্রণাম করিয়া উঠিল। অম্বিকা বলিলেন—বৌমা, এবার খিড়কি দিয়েই যেয়ো।

তাহাকে আগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রুক্মিণী তাহার সঙ্গে চলিল এবং খিড়কির কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি মাঝে মাঝে এসো, আমাদের যাবার সময় নেই।

বিস্মিত মুক্তামালা শুধাইল—কেন?

রুক্মিণী বলিল—হুকুম নেই।

মুক্তামালা পুনরপি শুধাইল—কার?

রুক্মিণী কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

মুক্তামালা সবই বুঝিল। বুঝিল, জমিদারির বিবাদ অন্তঃপুর অবধি তাহার নিষেধের কালো ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। সে রুক্মিণীর মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারিল না। তাড়াতাড়ি রওনা হইয়া পড়িল।

সেদিন নবীননারায়ণ তখনো অন্দর ছাড়িয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসে নাই, এমন সময়ে কাছারি-বাড়িতে একটা গোলমাল শুনিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, শুধাইল—ব্যাপার কি? এত সকালেই কি হ'ল আবার?

কেহ কোনো উত্তর দিল না।

নবীন বলিল—তাহলে কিছু হয়নি, তবে গোল হচ্ছিল কিসের?

তখন নিরুপায় যোগেশ বলিল—হুজুর, বড়ই বিপদ হয়ে গিয়েছে। বাজুবন্দ মহাল থেকে লাটের টাকা আসছিল, মাত্র দু'জন পাইক সঙ্গে ছিল, দশানির লাঠিয়ালে সব লুটে নিয়েছে।

ঘটনা শুনিয়া নবীন একমুহূর্ত নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, তারপরেই পূর্ব অভ্যাসমতো হাঁকিল—মিলন সর্দার—

কিন্তু আজ সেই ডাকের উত্তরে ছায়াবৎ কেহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল না। তার বদলে সর্দারের ভাই সোনা সম্মুখে আসিয়া লাঠিসহযোগে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—হুজুর?

নবীন বলিল—ওরা লাটের টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছে। সহ্য করবো নাকি? কি বলিস্?

মিলন সর্দার হইলে কোনো কথা না বলিয়া আর-একটা সেলাম মাত্র করিয়া প্রস্থান করিত। কিন্তু সোনা কথা বলার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সে বলিল—হুজুর, এরই জন্য ভাবনা! তুমি চুপি ক'রে ব'সে দেখো। আমরা গিয়ে ঠেঙেল ক'টাকে মেরে এখনি ফিরে আসছি। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দারোগা ইহাদের চালান দিয়াছিল। কিন্তু দশানি ও ছ'আনি জামিন হইয়া নিজ নিজ লাঠিয়ালদের মুক্ত করিয়া আনিয়াছিল।

দশানির কাছারির উঠানে কীর্তিবাবু সগর্বে পদচারণ করিয়া ফিরিতেছিল, গোবরগাদার উপরে উন্নতচূড় স্ফীতবক্ষ মোরগয়াজের মতো। হাতে তাহার প্রকাণ্ড একখানা নিমের দাঁতন। সেখানাকে সবলে দন্তপংক্তির উপরে ঘষিতেছিল—সোমে আসিয়া বেহালার উতাল ছড় যেমন থামিতে চায়, অনেকটা তেমনি। হঠাৎ কীর্তি বলিয়া উঠিল—সাবাস্ ইদ্রিস, সাবাস গফুর! হ্যাঁ, বাহাদুর বটে! দুর্গা, ওই বড় দুটো তোড়া ওদের দুজনকে দাও। এই তো মরদের মতো কাজ! আবেদ আলি যা করতে পারেনি, ওরা করেছে।

শীতের রৌদ্রে উঠানের মধ্যে বসিয়া ইদ্রিস, গফুর, তেওয়ারি, ধনঞ্জয় প্রভৃতি রোদ পোহাইতে পোহাইতে জিরাইতেছিল। পাশে তাহাদের লাঠিগুলা পড়িয়া আছে। কাছারির বারান্দায় ছোট বড় কয়েকটি টাকার তোড়া। ইহারাই আজ শেষ রাত্রে ছ'আনির লাটের টাকা লুটিয়া আনিয়াছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল।

সহসা আবেদ আলির কথা মনে পড়িতেই কীর্তিনারায়ণ তাহার প্রতি একপ্রকার অব্যক্ত ক্রোধ অনুভব করিল। সে যে মরিয়াছে তজ্জন্য কীর্তি দুঃখিত নয়, কারণ মানুষ তো একদিন মরিবেই। কিন্তু তৎপূর্বে সে যে অশথতলাটা তাহার দখলে না আনিয়া দিয়া মরিল—তাহার এ-অপরাধ কীর্তি আজিও ক্ষমা করিতে পারে নাই। কীর্তি ইহাকে একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করে। সে অনেক সময়ে ভাবিয়াছে, বেটা বেইমান। এতদিন তাহাকে ভাত-কাপড় দিয়া পুষিলাম, সে কি এইভাবে ফাঁকি দিবার জন্যই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিত—ইস্, তাহাকে যদি একবার পাইতাম! কিন্তু তাহাকে আর পাইবার উপায় নাই জানিয়া অব্যক্ত অচরিতার্থ ক্রোধে সে পুড়িয়া মরিত।

কীর্তি ব'লল—হ্যাঁ, ওদের বড় দুটো তোড়া, আর বাকি সকলকে সমানভাবে ভাগ ক'রে দাও। একটু থামিয়া বলিল— ওরা তখন কি করলো গফুর?

গফুর বলিল—কি আর করবে কর্তা। তোড়া ফেলে দিয়ে বেতবনে গিয়ে ঢুকলো!

—বেতবনে গিয়ে ঢুকলো! আহা, বেচারাদের গা নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে! হাঃ হাঃ করিয়া কীর্তিবাবুর সে কি প্লীহা-কম্প হাসি!

এই বর্ণনাটা সকাল হইতে না-হোক পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

—কেন, বেতবনে কেন? তাদের সোনা সর্দারকে ডাকলেই হ'ত? এতক্ষণে তাদের এম্-এ পাশ করা ছোটবাবু বোধ হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চিঠি লিখছে?—হাঃ হাঃ! বাবা, এ এম্-এ পাশ করা নয়, জমিদারি করা। হাঃ হাঃ—কীর্তিবাবুর হাসি আর থামিতেই চায় না।

দুর্গাদাস গুনিবার উদ্দেশ্যে একটি তোড়ার মুখ খুলিতেই চিক্কণ, শুভ্র, শীতল টাকাগুলি ইস্কুল-ছুটি-পাওয়া বন্ধনমুক্ত বালকদলের মতো মেঝেয় ঝনৎকার দিয়া পড়িয়া গড়াইয়া ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, আর লাঠিয়ালের দল লুব্ধ নেত্রে, লুব্ধ কর্ণে, লুব্ধ নাসিকায় তাহাদের রূপ, রব ও গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকিল। টাকার একপ্রকার অতীন্দ্রিয় গন্ধ আছে, সেই সৌরভে লুব্ধ হইয়া মানব-মৌমাছি দেশবিদেশ হইতে ছুটিয়া আসে।

সকলে যখন এইভাবে ব্যস্ত, তখন এক কাণ্ড ঘটিল। খোলা দেউড়ি দিয়া কালবৈশাখীর অতর্কিতায় ছ'আনির লাঠিয়ালেরা ঢুকিয়া পড়িল। ব্যাপারটা কি হইতেছে সকলে ভালো করিয়া বুঝিবার আগেই তাহারা দশানির লোকগুলাকে জখম করিয়া, তোড়াগুলি তুলিয়া লইয়া মানবদেহী ঘূর্ণির মতো প্রস্থান করিল।

দশানির লোক যখন 'ওরে লাঠি ধর ধর, গেলো গেলো, মার মার' রব তুলিয়াছে তখন বিজয়ী ছ'আনির লাঠিয়ালের দল প্রায় তাহাদের কাছারিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ-আসা কালবৈশাখী হঠাৎ থামিয়া গেলে গ্রামের যেমন দশা হয়, দশানির উঠানেরও তেমনি দশা। গফুর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে—তাহার হাত রক্তে ভেজা, ইদ্রিসের পা [illegible] ভাঙিয়াছে

যে সে মূর্ছিত, তেওয়ারি ধনঞ্জয় সকলেই ধরাশায়ী। তোড়ার একটাও নাই। কেবল গোটা কয়েক টাকা অদৃষ্টের বিদ্রূপ-হাস্যের মতো ইতস্তত পড়িয়া চক চক করিতেছে।

কীর্তি হাঁকিল—দুর্গা কোথায়?

দুর্গাদাস কাছারির তক্তপোষের তলা হইতে উঁকি মারিয়া বলিল—হুজুর, আমি এখানে। দুর্গাদাস দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে যে ঢাল বলো, তরোয়াল বলো, শড়কি বন্দুক যাহাই বলো, আত্মরক্ষা করিতে তক্তপোষের কুক্ষিতলই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, ইহা একাধারে চরম আশ্রয় ও অস্ত্র।

লাঞ্ছিত কীর্তিনারায়ণ মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়া নিজ শয়নকক্ষে গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল।

ঘরে ঢুকিতেই ড্রেসিং টেবিলের প্রকাণ্ড আয়নাখানায় নিজের ছায়া দেখিবামাত্র ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া কীর্তিনারায়ণ সেখানাকে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। কিন্তু অজস্র ভাঙা টুকরায় তাহার অজস্র প্রতিবিম্ব ঘরময় ছড়াইতে লাগিল। ক্ষিপ্ত কীর্তিনারায়ণ সমস্ত খণ্ডগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলাতে পরিণত করিয়া দিল। আর কিছুই নয়, নিজের ছায়াকে আঘাত করিয়া নিজেকেই মারিতে সে আজ উদ্যত। কীর্তিনারায়ণ নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। আয়নাখানাকে নিঃশেষে ভাঙিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ ঘরে একাকী সে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। খাওয়ার সময়ে বাহির হইল না দেখিয়া মা আসিয়া ডাকিলেন; কীর্তি বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই। স্ত্রী আসিয়া ডাকিল; কোনো উত্তর করিল না। মেয়ে আসিয়া ডাকিয়া উত্তর পাইল—খেলা করিতে যাও। তিনি দিন তিন রাত্রির মধ্যে কীর্তিনারায়ণ ঘর হইতে বাহির হইল না।

তিন দিন পরে কীর্তিনারায়ণ বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। লোকে বুঝিল, এবারের মতো বড়বাবুর চটকা ভাঙিয়াছে, তার অধিক

কেহ বুঝিল না। সেদিনের লাঞ্ছনার প্রতিশোধের ব্যবস্থা সে মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছে, তাই এই শাস্তির আভাস সঙ্কল্পসিদ্ধির দূত।

ছ'আনির পুকুরপারে কয়েক ঘর প্রজা আছে, জেলে ছুতোর কামার। তাহারা ছ'আনির অনেকদিনের প্রজা। বিনা খাজনায় বাস করে, ছ'আনির বিপদে-আপদে তাহারাই প্রথম সাড়া দেয়। একেবারে কেনা। কীর্তি অনেকবার তাহাদের নিজের জমিতে উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রজার যে তাহার অভাব এমন নয়। কিন্তু শরিকের একটা ক্ষতি হইলেই তাহার লাভ। নিজে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, কাহারো মঙ্গল কামনা করে না, তাই অপরে নবীনকে বিশ্বাস করিতেছে, নবীনের মঙ্গল কামনা করিতেছে ইহা তাহার অসহ্য। অথচ প্রজাগুলি এমন নির্বোধ ও গোঁয়ার যে কিছুতেই দশানির মাটিতে উঠিয়া আসিতে সম্মত নয়—না লোভের টানে, না লাভের আশায়, না ভয়ের তাড়ায়।

পুকুরপারের প্রজাদের প্রধান বৃদ্ধ রঘুদাস। তাহাকে নড়াইতে পারিলেই সকলে নড়ে। বৃদ্ধ নিজে সংসারের স্রোতে শিথিল দাঁতটির মতো নড়বড় করিতেছে—অথচ স্বভাবটা তাহার এমনি উৎকট অনড় যে কি আর বলিব। শেষ বারের কথা এখনো কীর্তিনারায়ণের মনে আছে।

রঘুদাস আসিয়া লম্বা হইয়া দণ্ডবৎ করিল, তারপরে কীর্তির পায়ের ধূলা লইয়া কপালে, জিহ্বায় ও বক্ষস্থলে ঠেকাইয়া পাপোষখানার কাছে আলগোছে বসিয়া শুধাইল—কর্তার শরীর ভালো তো?

কীর্তির প্রস্তাব শুনিয়া সে জিভ কাটিয়া বলিল—একথা শুনতে নেই। তারপরে বলিল—চাষাতে মূলো লাগায়, ক'মাসই বা মাটিতে থাকে, তবু তাকে টেনে তুলতে গেলে সহজে কি মাটি ছাড়তে চায়! আর আমরা কত পুরুষ ওই মাটিতে বাস করছি, এত সহজে কি ওঠা যায়। ওই মাটির সঙ্গে যে রক্তের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

কীর্তি মনে মনে বলে, তোমার মুণ্ডুটা যদি মূলোর মতো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি তবেই মনের দুঃখ দূর হয়। বাহিরে হাসিয়া বলে—তা তো বটেই,

সেই জন্যেই বলছি, যত খরচ লাগে সব পাবে। ঘর ভেঙে আনবার খরচ, নতুন ঘর তোলবার খরচ, সব।

রঘু বলে, ঘর যদি তুলতেই হবে তবে আর কষ্ট ক'রে ভাঙা কেন?

তারপরে বলে—না হুজুর, ও পারবো না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, দশানি ছ'আনি দুই-ই আমাদের মনিব। এই বলিয়া আবার সে দীর্ঘ দণ্ডবৎ করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করে। কীর্তি মনে মনে হাসে, লম্বা দণ্ডবতে ভুলিবার লোক সে নয়।

কীর্তিনারায়ণ বেশ জানে ছ'আনির পুকুরপারের ওই কয় ঘর প্রজাকে আগে জব্দ করিতে না পারিলে কিছুতেই ছ'আনিকে কাবু করা যাইবে না। ওরা ছ'আনির পক্ষে লাঠি ধরিতেও যেমন উদ্যত, মিথ্যা সাক্ষী দিতেও তেমনি প্রস্তুত, বিপদে সম্পদে ওরাই সকলের আগে আসিয়া দাঁড়ায়।

তিনদিন ঘরে বন্ধ থাকিয়া কীর্তি সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পুকুরপারের প্রজাদের অনিষ্ট সাধন করিয়া সে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবে। ওরা নবীননারায়ণের প্রিয়। প্রত্যক্ষত নবীন পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছিবে না সত্য, কিন্তু শত্রুর প্রিয়জনকে আঘাত করাও পরোক্ষে তাহাকে আঘাত করা ছাড়া আর কি! পরোক্ষ প্রত্যক্ষের ছায়া। এই সঙ্কল্প করিবার পরেই তাহার মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে।

৬

তখন সূর্যোদয়ের অনেক বিলম্ব। পূর্বাকাশ তখনো জড়তার প্রলেপে একাকার। কেবল মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় পূর্বাশার পালঙ্কে উষা একবার করিয়া চোখ মেলিতেছে, আবার আলস্যে তখনি তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। নিশান্তের অন্ধকারের সহিত ধরাতলের কুয়াশা মিলিত হইয়া শীতরাত্রির স্বচ্ছতা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিত গৃহস্থ গাত্রাবরণের উপরে আরো একটা কিছু টানিয়া লইবার জন্য ঘুমের মধ্যে একবার করিয়া হাতড়াইতেছে।

গোহালে গাভীর দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এক-আধবার ডাকিতেছে, বাছুরটি মাতার গলকম্বলের নিকট ঘনিষ্ঠতরভাবে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে। ঘরের দাওয়ায় বৃদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে তামাক ও কল্কে খুজিতেছে। নদীর পরপারে মুসলমান পল্লীতে কুক্কুটের দল ত্রিধাবিভক্ত স্বরের তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা অন্ধকারকে আক্রমণ করিয়া অপসারিত করিতে নিযুক্ত। দোয়েল তখনো ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, কিংবা দম্পতি ভাবিয়া পাইতেছে না ডাকা উচিত হইবে কিনা। এতক্ষণে ঘুমের অবকাশ মিলিল ভাবিয়া হুতুমটা নীরব। পেচক চক্ষু দুইটি বারংবার আবর্তিত করিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছে তাহার নিশা-জাগরণের পালা সমাপ্ত। দীর্ঘ রাত্রির শিশিরসম্পাতে পথের ধূলা সিক্ত; শটিভাটির জঙ্গল হইতে একটি উদ্ভিজ্জ-সুবাস উত্থিত, হাঁড়িপূর্ণ হইয়া খেজুর-রসের উদ্বৃত্ত ধারা গাছের গা বাহিয়া গড়াইতেছে—তাহারি স্নিগ্ধ মদির গন্ধ, জলাশয় হইতে উদ্গত সূক্ষ্ম একপ্রকার ধূমল কুয়াশা,—সবসুদ্ধ মিলিয়া শীতরাত্রির আরামের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে প্রকৃতি ও মানুষে আর একটু ঘুমাইয়া লইবার জন্য যেন তপ্ত আচ্ছাদনের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ছ'আনির পুকুরপারের ক্ষুদ্র জনপদটিতেও অবশ্য এই একই অবস্থা। এমন সময়ে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—আগুন, আগুন। প্রথমে সকলে চীৎকার করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে, কে একজন করিয়াছিল—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পাড়া এককণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—আগুন, আগুন।

মানুষের স্বভাব এই যে, সমূহ সঙ্কটের মুহূর্তেও সঙ্কটের প্রতিকারের উপায় অপেক্ষা তাহার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নটাই তাহার মনে আগে উত্থিত হয়। সকলেই পরস্পরকে শুধাইতে লাগিল—কে লাগাইল? কেমন করিয়া লাগিল? একজন বলিল—বৃদ্ধ রঘুদাসের কাজ—ভোর রাত্রে উঠিয়া তামাক খাওয়া তাহার অভ্যাস। অপর একজন বলিল—না, না, রামাদের গোয়ালে আগুন লাগিয়াছে।

তারপরে হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, দৌড়-ঝাঁপ। আন, বাহির কর, দেখ দেখ, সর্বনাশ, মাগো—কি পাপে এমন হইল!

তারপর কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হইল, জ্বলন্ত গৃহের চাল কাটিয়া নামানো, এখনো যে-সব ঘর জ্বলিতে শুরু করে নাই তাহাদের মালপত্র বাহিরে আনিয়া ফেলা। দেখিতে দেখিতে পুকুরপার কাঁথা, লেপ, তোষক, তৈজসপত্রে ভরিয়া উঠিল। দুখি কৈবর্তের ছোট ছেলেটা ঘুমের চোখে উঠিয়া আসিয়া লেপ-তোষকের সুগভীর আশ্রয়ে আত্মগোপন করিল—এত লেপ-তোষক সে কখনো পায় নাই—একবার তাহার মনে হইল, রোজ কেন আগুন লাগে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল, আগুন কেমন করিয়া লাগিয়াছে। পাড়ার ঠিক বাহিরেই দশানির লাঠিয়ালদের লাঠি হাতে পাহারা দিতে দেখা গিয়াছিল। লোকজন জাগিয়া ওঠাতে আর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হওয়াতে তাহারা এখন অন্তর্হিত।

ছুতোরদের বিনোদিনী ঘুম হইতে জাগিয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছিল—হঠাৎ তাহার মনে হইল, শিশুপুত্রটিকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছে। অমনি সে উন্মত্তের মতো জ্বলন্ত গৃহের দিকে ছুটিল—রাখ, রাখ, ধর, ধর করিয়া সকলে অগ্রসর হইবার আগেই সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার শিশুপুত্র বিছানায় জাগিয়া চালের দিকে তাকাইয়া আঙুল নাড়িয়া খেলিতেছে। বিনোদিনী তাকাইয়া দেখিল চালের খড়ের মধ্যে আগুনের কচি কচি শিখাগুলি কোনো জ্যোতির্ময় দেববালকের লীলায়িত অঙ্গুলির মতো নড়িতেছে। বিনোদিনীর শিশুটির আনন্দের অবধি নাই, মানবশিশু দেবশিশুকে খেলার সঙ্গী পাইয়াছে। বিনোদিনী একটানে তাহার পুত্রকে শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া দিব্যোন্মাদের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল—তাহার জগৎ রক্ষা পাইয়াছে—আর সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় যাক্। সে ছেলেটিকে কোলে লইয়া নাচাইতে লাগিল। এমন সময় গোয়ালাদের বাদলি বলিল—ও বিনোদিনী, তোর শাড়ি গেল কোথায়? বিনোদিনী আচম্বিতে নিজের দিকে চাহিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল, পুত্রকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাহার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অমনি সে বসিয়া পড়িয়া পুত্রকে চড়ের পর চড় মারিয়া কাঁদাইয়া

ফেলিল—আ লক্ষ্মীছাড়া, হারামজাদা! জন্মের পরেই বাপকে খেয়েছিস, আর আজ আমার যা করবার নয় তাই করলি। পুত্র কাঁদিয়া ফেলিল, সে-ও কাঁদিতে লাগিল। বাদলি একখানা কাপড় আনিয়া দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জোড়াদীঘির সমস্ত লোক পুকুরপারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের চেষ্টায় অল্প কয়েকখানি ঘর রক্ষা পাইল, বাকি সমস্তই পুড়িয়া নষ্ট হইল। জিনিসপত্র কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছিল, প্রাণে কেহ মরে নাই। নবীননারায়ণ নিজে আসিয়া সময়োচিত তদ্বির-তদারক ও বিলি-ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পুকুরপারে যখন আগুন জ্বলিতেছিল কীর্তিনারায়ণ দোতলার ছাদে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। এ অগ্নিকাণ্ড তাহার দ্বারাই পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত, কাজেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবার কিছু আগেই সে ছাদের উপরে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এক মুহূর্তও সে বঞ্চিত হইতে চাহে না। আগুনের প্রথম শিখাটা দেখা দিবামাত্র তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তারপরে আগুন যতই প্রবল হইতে লাগিল, তাহার উল্লাসও ততই বাড়িতে লাগিল। ছাদের উপরে আর কেহ ছিল না, তাই তাহার এই অমানুষিক উল্লাস কেহ লক্ষ্য করিল না। কীর্তিনারায়ণ ছাদের আলিসার উপরে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া গুন গুন সুরে একটা গান করিতে করিতে পা দিয়া তাল ঠুকিতে লাগিল। আগুন আর একটা ঘরে ছড়াইয়া পড়ে, শিখা লাফাইয়া ওঠে, বাঁশের গিরা ফাটিবার শব্দ ও গৃহস্থের আর্তনাদ একত্র মিলিত হইয়া একটা দুর্বোধ্য বেদনার সৃষ্টি করে, কীর্তিনারায়ণের গানের কোনো ব্যাঘাত হয় না—বরঞ্চ সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ হইতেছে ভাবিয়া সে খুশি হইয়া ওঠে। অবশেষে আগুন নিভিয়া আসিলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কীর্তিনারায়ণ ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। ছাদে থাকিয়া আর লাভ কি—দেখিবার আর কি আছে?

আগুন লাগিবার সংবাদ পাইবামাত্র নবীননারায়ণ পাইক বরকন্দাজ লইয়া পুকুরপারে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময়ে সে মুক্তামালাকে ঘুম

হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, আমি চললাম, তুমি জেগেই থেকো, যদিচ কোন ভয় নেই।

স্বামী চলিয়া গেলে সে তেতলার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল—সেখানে দাঁড়াইলে অগ্নিকাণ্ডের সমস্তটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জগার মা নামে নবীনের এক পুরাতন ঝি ছিল, সে জোড়াদীঘির বাড়িতেই থাকিত। সেই জগার মা মুক্তামালার সঙ্গে ছাদের উপরে আসিয়াছিল। মুক্তা আলিসার বাম হাতের কনুই রাখিয়া ভীত-বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। সে শুধাইল—জগার মা, কি ক'রে আগুন লাগলো বলতে পারো?

জগার মা বলিল—কে না জানে? ও-বাড়ির বড়বাবু লাগিয়েছেন!

মুক্তামালা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—তিনি কেন লাগাতে যাবেন!

জগার মা হাসিয়া বলিল—আরো কিছুদিন এখানে থাকো বৌমা, তার পরে বুঝবে যে গাঁয়ে কিসে কি হয়। এ তোমার কলকাতা নয় মা।

এমন সময়ে আগুন আরো কয়েকখানি গৃহ গ্রাস করিয়া প্রচণ্ড শিখায় উল্লসিত হইয়া উঠিল—পুকুরের কালি-ঢালা জলতলে গলন্ত স্বর্ণের প্রলেপ বিস্তারিত হইয়া গেল, চারিদিকের গাছপালা দিবাভাগের মতো দৃশ্যমান হইয়া উঠিল, ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মুক্তামালা বলিল—আজ বোধ হয় গ্রাম রক্ষা পাবে না। কেহ উত্তর দিল না। সে ফিরিয়া দেখিল, জগার মা নাই। তখন আবার সে ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া রহিল। অগ্নিকাণ্ডের পটে জনতার গতিবিধি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এমন কি লোক চেনাও অসম্ভব নয়। হঠাৎ পায়ের শব্দ পাইয়া মুক্তামালা দেখিল, জগার মা আসিয়াছে এবং কাপড়ের তল হইতে একখানা আয়না বাহির করিতেছে। মুক্তা একটু রাগতভাবে বলিল—জগার মা, এই কি তোমার মুখ দেখবার সময় হ'ল?

জগার মা বলিল—দাঁড়াও না বৌমা। মুখ আমি দেখবো কেন? ব্রহ্মা মুখ দেখবেন।

এই বলিয়া সে আয়নাখানাকে অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে ধরিল। মুক্তামালা বলিল—ও কি হচ্ছে?

জগার মা বলিল—আয়নায় নিজের নকলকে জিভ দেখলে ব্রহ্মা জিভ সংযত করেন।

মুক্তামালা বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে বলিল—এমন তো কখনো শুনিনি।

জগার মা বুঝিল, এই শহুরে মেয়েটি নিতান্ত নাবালক ও নির্বোধ, আধিদৈবিককে বশ করিবার কোনো পন্থাই অবগত নয়। সে খানিকটা তাচ্ছিল্য ও খানিকটা বাৎসল্যে মিশাইয়া বলিল—এমনি ক'রে আমি কত আগুন নেভালাম। তুমি চুপ ক'রে দেখো না।

এই বলিয়া সে দর্পণখানাকে অধিকতর কৌশলের সহিত আগুনের দিকে দেখাইতে লাগিল।

ইহার অনেক পরে আগুন নিভিয়া গেলে জগার মা সগর্বে বলিয়াছিল, দেখলে তো মা, ব্রহ্মা জিহ্বা সংযত করলেন কিনা?

এত দুঃখের মধ্যেও মুক্তার হাসি পাইল, সে বলিল, সংযত না ক'রে তিনি আর করেন কি? আর খাদ্য কোথায়? ঘরগুলো তো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

জগার মা অপ্রস্তুত হইবার নয়, সে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—কিন্তু গাঁয়ের ঘরগুলো তো ছিল।

এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল—ভাবটা, ইহার আর কি উত্তর থাকিতে পারে—অতএব খামকা দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর কি ফল?

প্রজ্বলিত অগ্নির আভাতে প্রোজ্জ্বল মুক্তামালার মুখে ভীতি, বিস্ময়, ক্রোধ সঞ্চারী ভাবের মতো মুহুর্মুহু সঞ্চরণ করিতেছিল—কিন্তু সে মুখের স্থায়ী ভাব করুণা—সেই শেষরাত্রির অন্ধকারে, গৃহদাহের দাবানলে, অকাল নিদ্রাভঙ্গের ক্লান্তিতে, অকারণ সর্বনাশের পরিপ্রেক্ষিতে, ঈষৎ বিস্রস্তঅঞ্চলা, শিথিল-কুন্তলা, অনবগুণ্ঠিতা মুক্তামালাকে 'মূর্তিমতী করুণা'র মতো বোধ হইতেছিল। কখনো সর্বনাশকে সে এত নিকটে দেখে নাই। সর্বনাশের কথা এতদিন সে পুস্তকে পড়িয়াছে—আজ সে সর্বনাশের তীরে সমুপস্থিত।

ক্রমে আগুন নিভিয়া গেল, চারিদিকে ঘনতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, তারপরে সেই অন্ধকারের পটে পূর্বাকাশ কপোতধূসর হইল, কপোতধূসরে শুক্তির স্বচ্ছতা দেখা দিল, শুক্তির স্বচ্ছতায় অশোক-কিশলয়ের রং ধরিতে ধরিতে অবশেষে দাড়িম্বকুসুমফুল্ল তপনের ললাটফলক দিগন্তে দৃশ্যমান হইয়া উঠিল—তবু সে সেইখানেই স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিল, নড়িবার কথা তাহার মনেও হইল না।

১

ইতিহাস-পাঠে পাঠকের চিত্তে একটি বৃহৎ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ইতিহাস কি?—রাজা মহারাজা সম্রাট সেনাপতিদের নামমালা। কিন্তু সংসার তো কেবল ইহাদের লইয়াই নয়। কোনো ইতিহাসের পাতায় কোনকালে যাহাদের নাম উঠিল না, সেই অকিঞ্চনের দলই যে সংসারের পনেরো আনা। ঐতিহাসিকগণ এই পনেরো আনার সন্ধান রাখেন না, তাঁহারা এক আনার সন্ধানী। মানুষের ইতিহাস যে মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না সে তো এই কারণেই, তাই ইতিহাস ফেলিয়া সে সাহিত্যের আসরে আসে। ইতিহাস যদি কখনো ষোল আনার ব্যাপারী হইয়া ওঠে, তখন ইতিহাসে আর বিতৃষ্ণা থাকিবে না, কিংবা তখন ইতিহাস ও সাহিত্য সমার্থক হইয়া উঠিবে, তাহাদের বর্তমান ভেদ ঘুচিয়া যাইবে।

পলাশীর যুদ্ধ একটি বৃহৎ ঘটনা, কিন্তু তাহার ইতিকথা কি লিখিত হইয়াছে? ঐতিহাসিক বলিবেন, লিখিত হইয়াছে বই কি। তিনি খানকতক পুস্তকের নাম করিবেন। বইগুলি ইতিহাস বলিয়া যে পরিজ্ঞাত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিনকার সেই অকস্মাৎ বৃষ্টিঘন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ কৃষাণ ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, স্কন্ধ হইতে লাঙলটি নামাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার পত্নীকে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল তাহা যদি জানিতে পারিতাম তবেই পলাশীর যুদ্ধের সত্যরূপ অর্থাৎ পূর্ণরূপ জানা হইত। সেদিনকার মেঘের গর্জন ও কামান-গর্জন তাহার মনে যে ভীতি বিস্ময় ও বিহ্বলতার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল, আধিদৈবিকে ও আধিভৌতিকে যে অপ্রত্যাশিত মিলন

ঘটাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া না জানা অবধি পলাশীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের ইতিহাসের কথাই কি জানি? বেদব্যাস ও কৃষ্ণার্জুনের সদয় সহযোগিতা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কতটুকু জানি? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর কিছু কিছু সংবাদ পাই বটে, কিন্তু এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে কেন্দ্র করিয়া অষ্টাদশাধিক অক্ষৌহিণী নরনারী বালবৃদ্ধবনিতার যে অতি বৃহৎ সংসার, তাহার কাহিনী কোথায়? কুশপত্তনের যে বালক দেখিল, একদিন প্রভাতে তাহার পিতা অভ্যস্ত সময়ে হল স্কন্ধে করিয়া পরিচিত শস্যক্ষেত্রের দিকে না গিয়া অসি-বর্ম ধারণ করিয়া অজ্ঞাত দিগন্তের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন তাহার বালক-চিত্তে অব্যক্ত আকারে যে বিপদের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়া উঠিয়াছিল, মহাকবির ভারতব্যাপী চিত্রপটে তাহার ইঙ্গিত কোথায়?

জনসাধারণ ইতিহাসের উপেক্ষিত। ময়ূর-সিংহাসনের বিচিত্র বর্ণকলাপ তাহাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই ইতিহাসের খাস-দরবার ছাড়িয়া উপেক্ষিত জনসাধারণ কাব্যের আম-দরবারে সমুপস্থিত, সেখানে ঠাসাঠাসি হইলেও সকলেরই বসিবার স্থান আছে, আর যে দুর্ভাগা নিতান্তই বসিতে পাইল না, দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার কোনো বাধা নাই। ইতিহাসের শিল্পকলা গবাক্ষ-আলোর একদেশদর্শী কিরণচ্ছটা, রাজন্যের উষ্ণীষ ও সামন্তের তরবারি ব্যতীত আর কিছু তাহা প্রকাশ করে না। কাব্যের শিল্পকলা পৌর্ণ-মাসীর আলোক-প্লাব। সূর্যের আলোর মতো তাহা প্রত্যক্ষ ভাস্বর নয়, আলোছায়াতে জড়িত, কিন্তু ওই ছায়াই কি প্রমাণ করিয়া দেয় না যে একটা বস্তু আছে? জনসাধারণ সেই বাস্তব।

ইতিহাসের রত্নপালঙ্কে সযত্নলালিত রাজকুমারী থাকুন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মর্মর-মণিকুট্টিমে সখীদের রক্তচরণের প্রতিফলন হইতে আপত্তি কেন? সখীর অস্তিত্ব ও সংখ্যা তো রাজপুত্রীর মাহাত্ম্যেরই প্রকাশ। আবার কক্ষপ্রাচীরে শিল্পীর তুলিকাসঞ্জাত নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর প্রতিই বা ঐতিহাসিক এত অকরুণ কেন? এই তিনে মিলিয়াই তো রাজপুত্রীর সম্যক্ ইতিহাস।

একা রাজপুত্রী আপনার ভগ্নাংশ। ইতিহাসের নায়কদের ঘিরিয়া আছে অজ্ঞাতনামা জনসাধারণ, আবার এই দুইকে ঘিরিয়া আছে বিশ্বপ্রকৃতি, আর এই তিনে মিলিয়াই মানুষের ইতিহাস।

২

ভোর হইতেই পুকুরপারের প্রজাগণ ছ'আনির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষেরা কাছারির উঠানে সমবেত হইল আর মেয়েরা ছেলেমেয়েদের লইয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় গিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের জিনিসপত্রের অধিকাংশই পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সামান্য যাকিছু রক্ষা পাইয়াছিল সে সব পুকুরপারে একস্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক ঘণ্টার উত্তপ্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদের চেহারা ও মুখের ভাব পঙ্গপালে-খাওয়া ক্ষেতের মতো শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধ রঘুদাস কাছারির বারান্দায় হতাশভাবে বসিয়া নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া যাইতেছে। তাহার একটা মুদ্রাদোষ ছিল গলার কণ্ঠি-মালাটাকে আঙুল দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেওয়া। শেষরাত্রের তাড়াহুড়ায় বেচারার কণ্ঠি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহার শীর্ণ অঙ্গুলি শূন্য কণ্ঠ বারংবার স্পর্শ করিতেছিল। অভ্যস্ত অভ্যাসের অভাবেই হোক আর রাত্রির অভিজ্ঞতার ফলেই হোক, তাহার কণ্ঠ-স্বর অতিশয় ক্ষীণ। সে বলিতেছিল—দশানির কর্তা কতবার আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছেন, রঘু, তোরা উঠে আয়, তোদের জমি-জিরেৎ দেবো, ঘরবাড়ি তৈয়ার করবার টাকা দেবো, সমস্ত ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবো। আমি বলেছি—কর্তা, মাপ ক'রো, ওটা পারবো না। দশানির কর্তা যে এমন ক'রে শোধ নেবে তা ভাবিনি।

তাহার শ্রোতারা সকলেই ভুক্তভোগী, চিন্তা করিবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছিল, তাহারা কোনো উত্তর করে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধ রঘুদাস বলে, আমি ভোররাত্রে উঠে কল্কেয় টীকে জ্বালিয়ে ফুঁ দিতে

আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে বাদলিদের বাড়ির দিকে দেখি কেমন যেন ধোঁয়া উঠছে। তারপরেই সর্বনাশ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো।

তারপরে কপালে হাত ঠেকাইয়া আপনমনে বলে—'অল্প পাপে চুরি, অনেক পাপে পুড়ি।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—সব গেল!

অন্তঃপুরের দৃশ্য ঠিক ইহার বিপরীত। মেয়ের সংখ্যা বাহির-বাড়ির পুরুষদের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু কোলাহলের গাম্ভীর্যে তাহারা হাট বসাইয়া দিয়াছে। সকলেই কথা বলিতে চায়, সকলেই অপরের আগে কথা বলিতে চায়, কেহ যে কাহারো কম নয়, তাহার ক্ষতিই যে সকলের অধিক প্রমাণ করিতে চায়, ফলে দুর্বোধ্য একটা হুলহুলার সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল বিনোদিনী নীরব, সে শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া একান্তে বসিয়া আছে। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করিয়া চোখে পড়ে বাদলির হাসি। বাদলি গোয়ালাদের মেয়ে, বয়স চোদ্দ-পনেরো হয় তো খুব বেশি, পাৎলা শরীর, নাকটা ঈষৎ চেপ্টা, চুল কুঞ্চিত, একটা ডুরে শাড়ি আচ্ছা করিয়া কোমরে জড়াইয়া পরা তাহার অভ্যাস। অশথের পাতা যেমন একটু বাতাসের আভাস পাইবামাত্র কাঁপিতে থাকে, তেমনি অল্প কারণে এমন কি অকারণে হাসিয়া ওঠা তাহার অভ্যাস। আগুন লাগিলে সবাই যখন হায় হায় করিতেছিল তখনো তাহার হাসি থামে নাই। আজও তাহার হাসি থামিতে চাহিতেছে না। একজন বৃদ্ধা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বাদলি, এত হাসবার কি পেলি! লোকের সর্বনাশ হ'ল আর তোর হাসি যে থামতেই চায় না।

বাদলি বলিল—না হেসে করি কি। তোমরা সবাই একসঙ্গে কথা বলছ, বৌ-ঠাকরুন বুঝবেন কেমন ক'রে? এই বলিয়া সে মুক্তামালাকে দেখাইয়া দিল। মুক্তমালা নিকটেই বসিয়া ছিল, কিন্তু এতক্ষণের চেষ্টাতেও জনতার সম্মিলিত বাক্‌প্রচেষ্টার বিশেষ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। নিজের কথা যে নিরর্থক নয় ইহাই প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বাদলি বলিল—তাই নয় বৌ-ঠাকরুন?

মুক্তামালা কিছু বলিল না, শুধু হাসিল। অনেকক্ষণ পরে এই সে প্রথম হাসিল। শেষরাত্রের অভিজ্ঞতার পরে তাহার মনের উপর একটা ধূম্র পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল। বাদলির হাসিতে তাহার একটা প্রান্ত ঈষৎ উন্নীত হইল।

সকলেই বৌ-ঠাকরুনকে নিজের দুঃখটাই সবচেয়ে অসহ্য এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিল, এবারে কেমন যেন তাহাদের সন্দেহ হইল এতক্ষণের প্রয়াস সফল হয় নাই। তাই তাহারা উঠিয়া আসিয়া মুক্তামালাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বাদলি বলিল—হাঁ, এবারে সবাই মিলে বৌ-ঠাকরুনকে ঠেসে ধ'রে দম বন্ধ ক'রে দিয়ে মেরে ফেলো, তাহ্‌লেই চমৎকার হয়। এই বলিয়া হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুঃখে মানুষকে কাতর করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার দুঃখ কেহ বুঝিতেছে না এই বোধ মানুষকে অনেক সময়ে কঠিন করিয়া তোলে। বাদলির হাসিতে বিরক্ত হইয়া একজন বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমাদের হাসবার সময় কই? আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

বাদলি বলিল—সর্বনাশ তো হয়েইছে—কাঁদলে কি সব ফিরে আসবে?

পূর্বোক্ত বৃদ্ধা বলিল—হাসলেই কি সব ফিরে পাবে?

অপর একজন বলিল—পাবে গো পাবে, তেমন ক'রে হাসতে পারলে ফিরে পাওয়া যায়।

তাহার উক্তিতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল, বাদলিও হাসিল।

বৃদ্ধাটি বলিল—আবার হাসি দেখো না! লজ্জার মাথা খেয়েছে।

স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বাদলির জীবন-চরিতের কোনো একটা ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইল, এবং ঘটনাটি সকলের অপরিজ্ঞাত নয়। সকলেই ভাবিয়াছিল লজ্জিত বাদলি হাসি থামাইবে, কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিল না।

নবীন ও মুক্তামালার চেষ্টায় দুর্গত প্রজাদের একটা সাময়িক বন্দোবস্ত হইয়া

গেল। পুরুষরা কাছারিবাড়িতে, মেয়েরা অন্দরমহলের একটা অংশে স্থান পাইল। তাঁহাদের ঘরবাড়ি জমিদার পক্ষ হইতে তৈয়ারি করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল এবং তাহা যাহাতে শীঘ্র হয় সে বিষয়ে নবীননারায়ণ দৃষ্টি রাখিল।

মেয়েরা তাহাদের নির্দিষ্ট মহলে যাইবার সময়ে মুক্তামালা বাদলিকে বলিল—বাদলি, তুই আমার কাছে থাক্।

বাদলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দেখো মতির মা, হাসলে কি ফল হয়। তোমরা কাঁদলে—জায়গা পেলে কোথায়, আর আমি হাসলাম—জায়গা পেলাম কোথায়!

মোতির মা রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল—তুমি অনেক ঘরেই জায়গা পেয়েছ, আরো কত ঘরে জায়গা পাবে।

বাদলি হাসিয়া উঠিল।

মুক্তামালা শুধাইল—কি ব্যাপার রে বাদলি?

বাদলি বলিল—সে এক মজার ঘটনা বৌ-ঠাকরুন, তোমাকে বলবো এক সময়ে। শুনলে তুমিও হাসবে।

৩

পূর্বোক্ত অগ্নিকাণ্ডের পরে গ্রামের প্রজা-সাধারণ জমিদারগণের পক্ষভুক্ত হইয়া গেল। ছ'আনির প্রজাগণ অত্যাচারিত হইয়াছিল, কাজেই তাহারা যে প্রত্যক্ষত জমিদারের পক্ষ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বলবৃদ্ধি করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই, আবার দশানির প্রজাগণ কতকটা বা ভবিষ্যৎ অত্যাচারের আশঙ্কায়, কতকটা বা ছ'আনির প্রজাদের ব্যবহারের প্রতিবাদে নিজ জমিদারের সহায় হইয়া দাঁড়াইল। গোড়ায় যাহা ছিল দুই শরিকের মধ্যে বিরোধ, প্রজা-স্বার্থের সূত্র ধরিয়া অত্যল্পকালের মধ্যে তাহা সমস্ত গ্রামের বিরোধে পরিণত হইল। গ্রামের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে ইহাই ছিল স্বাভাবিক, ইহাই যেন গ্রামের বংশগত ধারা। এক সময়ে গ্রামের জমিদার ছিলেন গ্রামজীবনের নায়ক। সুকারণেই হোক আর কুকারণেই হোক আর

অকারণেই হোক, গ্রামের লোকে জমিদারকেই অনুসরণ করিত। তখন গ্রামের হীনতম ব্যক্তিটি হইতে প্রবলতম ব্যক্তি সমস্বার্থ ও সমবেদনার সূত্রে গ্রথিত ছিল, এক জায়গায় টান দিলে সমস্ত মালাটিতে টান পড়িত, গ্রামের দীনতম প্রজার গায়ে আঘাত লাগিলে সে আঘাত সঞ্চারিত হইয়া জমিদার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত। এখন সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অক্ষগুঁটি শতভিন্ন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ইতস্তত ভূলুণ্ঠিত, একটার আঘাত আর অন্যটাতে সঞ্চারিত হয় না। ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বর্গ। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই স্বয়ম্পূর্ণ। 'আমি কাহারো উপর নির্ভর করি না, আমি কাহারো পরোয়া রাখি না'—অলিখিত অক্ষরের অদৃশ্য এই চাপরাশ বহন করিয়া এখন আমরা সকলে ঘুরিতেছি। বাংলার পল্লী নদীমাতৃক ও জমিদার-পিতৃক। নদী মরিয়া জমিদার ধ্বংস হইয়া বাংলার পল্লী এখন অনাথ। জমিদারগণের পক্ষ সমর্থন আমার উদ্দেশ্য নয়। কি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, কি হইতে পারিত বা কি হওয়া উচিত ছিল তত্ত্বজ্ঞ তাহা বিচার করিবেন। বাংলার পল্লী কোন কোন্ অবস্থার সোপান অতিক্রম করিয়া বর্তমান দুর্দশায় আসিয়া সমুপস্থিত তাহাই লিখিতে বসিয়াছি, একটি জমিদারবংশকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত জমিদারদের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি,তদধিক কোনো অভিপ্রায় বা জমিদার-গণকে সমর্থনের কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। বিশেষ, জমিদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বুদ্ধি। তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইল, গ্রামগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিয়া গেল। কিন্তু উভয়ের এই সহমরণেই প্রমাণিত হইয়া যায় যে এক সময়ে উভয়ে সহচর ছিল—সুখদুঃখের, উৎসব-ব্যসনের। একই শ্মশানের অন্তিম ক্ষেত্রে উভয়ে আজ ধরাশয্যাশ্রয়ী। এই আত্মতন্ত্রজাত সমাজহীন সমাজতন্ত্র, ইহা আর যাহাই হোক, উন্নতি নয়, প্রগতি নয়, ইহা চিত্তের অসাড়তা, মানসিক মৃত্যু। সমবেদনার মহাদেশ লবণাম্বুরাশির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেকেই আমরা স্ব স্ব দ্বীপখণ্ডে বসিয়া, অনন্যসহচর অভিনব রবিন্সনক্রুশোর মতো শুকের কণ্ঠে মানবভাষা শুনিয়া জীবন ধন্য করিবার বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত। অপর ব্যক্তি

এমনভাবে আমাদের জীবনপরিধির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের পদচিহ্নে অপরের আগমন আশঙ্কা করিয়া আমাদের চমকিত করিয়া তোলে। আমরা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি!

জমিদারের বিবাদ প্রজাদের অবলম্বন করিয়া সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল, ফলে গ্রামের স্বস্তি ও শান্তি অন্তর্হিত হইল। আর এই একটা রাজকীয় উপলক্ষে প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করিবারও একটা সুযোগ পাইল। আজ ছ'আনির প্রধানের ক্ষেতখামার লুঠ হইয়া গেল, কাল দশানির জনকয়েক প্রজার বাড়ি পুড়িয়া গেল। একদিন যদি দশানির খেয়াঘাটের নৌকাখানা নিমজ্জিত হয়, তার পরদিন ছ'আনির মৌখিরার হাট লুঠ হইয়া যায়। এই রকমে উভয়পক্ষে অন্তহীন অত্যাচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে থাকে। দুই পক্ষের প্রজারা নিজেদের দুর্দশার কাহিনী জমিদারগণের কর্ণগোচর করে, তাহাতে আবার তাহাদের মানসিক উত্তাপ বাড়িয়া যায়। জমিদারের অপমানে প্রজা রাগে, প্রজার দুর্দশায় জমিদার গরম হয়—এইভাবে প্রজা ও জমিদারের পুটপাকে সমস্ত গ্রামখানি দমে সিদ্ধ হইতে লাগিল।

এই গ্রামময় বিবাদে মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করিল। অবশ্য পুরাকালের বীরাঙ্গনাদের মতো তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল না বা দীর্ঘ চিকুর কাটিয়া ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিল না—কিন্তু কেবল মানসিক উত্তাপের বিচারে তাহারা যে পুরাকালিনাদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নয় তাহা শপথ করিয়া বলিতে খুব বেশি সত্যপ্রিয়তার আবশ্যক করে না।

নদীর ঘাট মেয়েদের প্রধান রণাঙ্গন। একদিন স্নানকালে দশানির এক প্রজার পত্নীর গায়ে ছ'আনির এক প্রজার পত্নীর জল ছিটিয়া লাগিল—তখন দুই বীরাঙ্গনাতে মহা-বচসা আরম্ভ হইল এবং সেই বচসার সূত্রে সমস্ত দক্ষিণপাড়ার নারীকুল উত্তাল হইয়া উঠিল; অবশ্য সকলেই তখন মূল কারণটা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আর কি! বেদব্যাসের প্রতি ভক্তিতে আমি কাহারো চেয়ে কম নই, তৎসত্ত্বেও বলিব যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মূল কারণটা

তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। হস্তিনাপুরের সরোবরঘাটে স্নান করিবার সময়ে দ্রৌপদীর দাসীর জলের ছিটা নিশ্চয় ভানুমতীর দাসীর গায়ে পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষে তাহাদের কলহ ক্রমে প্রভুপত্নী ও প্রভুতে বৃহত্তর হইতে হইতে কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রিয়-অরণ্যের দাবাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল।

বিধাতা স্ত্রীলোকের দেহে শক্তি দেন নাই; কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহাদের মনে হিংস্রতা দিয়াছেন। বাঘ দুর্জয়, বাঘিনী অজেয়। পুরুষ সৈন্যের পরিবর্তে নারীবাহিনী রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে যুদ্ধাবসান শীঘ্রতর হইত। নারীবাহিনী পরস্পরের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্বল্পতম সময়ে প্রতিপক্ষকে ছিন্নকণ্ঠ করিয়া ফেলিত। যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধ-প্রত্যাবর্তিতের গুরুতর সমস্যার উদ্ভবই হইত না, যেহেতু নারীবাহিনীর জীবন থাকিতে কেহই ফিরিত না, কেহ কাহাকেও ছাড়িত না, পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই সমানভাবে মরিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। নারীর মনের হিংস্রতার অনুরূপ দেহে বল থাকিলে পৃথিবী এতদিনে নিষ্পুরুষ হইয়া যাইত। বিধাতা বীরত্ব ও সৌন্দর্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। বীরত্ব ও সৌন্দর্য কি কখনো সম্মিলিত হইবে না?

৪

দুখি কৈবর্ত ছ'আনির তিন পুরুষের খানসামা। ছ'আনির বাড়িতে তাহার বাপ কাজ করিত, সে কাজ করিয়াছে, এখন তাহার ছেলেরা চাকরি করে। দুখি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে নবীননারায়ণ বলিয়াছিল—দুখি এবারে তুই অবসর নে, তোর ছেলেদের কাজে ঢুকিয়ে দে। দুখি কিছুতেই রাজি হয় নাই। তারপরে সে একেবারে যখন অশক্ত হইয়া পড়িল, তখনই কেবল সে অবসর গ্রহণ করিল—কিন্তু আসলের চেয়ে সুদ যেমন অনেক সময়ে ভারী হয়, তেমনি এক দুখির স্থান তাহার দুই পুত্র বালা ও কালা অধিকার করিয়া বসিল।

পেন্সন পাইবার আশা সত্ত্বেও দুখি কেন যে অবসর লইতে চাহে নাই, বলা বাহুল্য তাহার বিশেষ কারণ আছে। দুখির উপরে ছ'আনির সরকারী হাট-বাজার করিবার ভার। হাটের পয়সা হইতে উদ্বৃত্ত দু-চার আনা সকলেই নেয়,

কিন্তু দুখির টেকনিক ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বাজারের টাকা পাইবামাত্র সে টাকায় সিকে আগেই ট্যাকে গুঁজিত। তারপরে হাট সারিয়া প্রথমে জমিদারবাড়িতে না গিয়া নিজের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইত, ডাক দিত—ও বালা কালা, বাবা এদিকে আয়। ছেলেরা আসিলে বলিত, নে হিসাব কর। টাকায় বারো আনা মাত্র সে খরচ করিয়াছে; কিন্তু হিসাব দিতে হইবে ষোল আনার। সেই হিসাবটা কষিয়া দিবার ভার ছিল ছেলেদের উপরে। ছেলেরা হিসাবে গোলমাল করিয়া ফেলিলে বলিত—এই বুঝি তোদের পাঠশালার শিক্ষা! নে, নে, ভালো ক'রে হিসাব কর্। না খেয়ে, না প'রে পাঠশালার মাইনে দিই, সে তো এইসব কাজের জন্যেই।

ছেলেরা পাঠশালায় এত সূক্ষ্ম হিসাব কষে কিনা জানি না। দুখি বলত, এ তো সোজা। পাঁচ টাকা নিয়ে হাটে গিয়াছিলাম, পাঁচ সিকে আমি তুলে রেখেছি, তা'হলে হাট করলাম পৌনে চার টাকার। এখন পৌনে চার টাকাকে সমান ক'রে পাঁচ টাকার উপরে চেলে দে। ব্যাস্। এত ভাবছিস কেন?

ছেলেরা প্রথমে প্রথমে ভুল করিত, এখন বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বাপ তাহাদের বিদ্যা দেখিয়া যুগপৎ নিজেকে ও পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ দেয়—আর মনে মনে বলে, এ'কেই তো বিদ্যা বলে। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে দুখি কেন পেন্সন লইতে চায় নাই। যখন সে নিতান্ত অথর্ব হইয়া পড়িল, আর ছেলে দুটি একান্ত লায়েক হইয়া উঠল, মাত্র তখনই সে তাহাদের সরকারে ভর্তি করিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিল। এ রকম ক্ষেত্রে দুখি যে ছ'আনির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এ হেন দুখির বাড়ির সমুখে শলাপরামর্শ চলিতেছে। দুখি আছে, শ্রীচরণ আছে, আর আছে কানু গোয়ালা। শ্রীচরণ বলিতেছে—কাল ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা। ছোটবাবু বলল—হাঁ রে চরণ, তোরা সব নাকি দশানির ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিস্? আমি বললাম—কি যে ক'ন কর্তা! কাঁপছে ওরাই, ওদের গা কাঁপছে, হাতের লাঠি কাঁপছে—আমরা কেন কাঁপতে গেলাম। ছোটবাবু

বল্‌ল—আচ্ছা দেখা যাবে, কে কত সাহসী, শীগ্‌গিরই পরীক্ষা হবে। আমি বললাম, কেন, পরীক্ষা হ'তে কি বাকি আছে নাকি! মনে নেই সেবার? আমার ক্ষেতের ধান লুটে নেবার জন্মে দশানির দশজন লেঠেল গিয়েছিল। আমারা জন পাঁচেক। এমন তাড়া করলাম যে, তারা পালাবার পথ পায় না, পালাবার সময়ে লাঠিগুলো ফেলে রেখেই পালালো। আমি আর কানু, কি রে কানু, মনে নেই? গুনে দেখি বারোখানা লাঠি। আমরা ভাবলাম, এ কেমন হ'ল, দশজনে বারোখানা লাঠি, সে কেমন কথা? তখন কানু ব'লে উঠল, দু'খানা লাঠি ভেঙে চার টুকরো হয়ে গিয়েছে—তখন কানুর সে কি হাসি! কর্তা, কানুকে তো জানো!

কানুর দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। দুখি সভয়ে বলিল—কানু, আমি বুড়ো মানুষ, পালাতে পারবো না বাবা। তোর যে আবার কিল-চড় মারা অভ্যাস!

কানু বলিল—ভয় নেই দাদা, কিল-চড়গুলো এবার দশানির জন্মে জমিয়ে রেখেছি।

তারপরে সে বলিল—একবার লাগলে হয়, আমি বুড়ো দুর্গাদাসের মাথার খুলিটা না ভেঙে ছাড়বো না। তারপরে এই মহৎ কর্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সে বলিল—সেদিন আমার এক হাঁড়ি দই একা খেয়ে ফেল্‌ল। খাওয়া শেষ হ'লে যখন পয়সা চাইলাম, বুড়ো হেসে বলে কি না, পয়সা আবার কি রে? বুড়ো মানুষকে খাওয়ালি, আমি খুশি হলাম, তোকে মনে মনে আশীর্বাদ করলাম, পয়সা কি তার চেয়েও বড় হ'ল? বাবা কানু, পয়সা কেউ সঙ্গে ক'রে আনেনি, কেউ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে না। তারপরে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল—আশীর্বাদ করলাম, বাবা, আশীর্বাদ করলাম। বুঝলে দুখি দাদা, এবারে বুড়ো দাসের মাথার খুলিটা ভাঙবো, তারপরে অন্য কথা।

এবারে দুখি আরম্ভ করিল—বলিল, বাবা, আমি তো বুড়ো হয়ে পড়েছি, নিজের কিছু করবার শক্তি নেই। কিন্তু বাপ সকল, দশানির হক্‌ সেখ আমার

জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে, সে অপমান আমার একলার নয়, তোমাদের সকলেরই। এবারে তার শোধ তোলা চাই।

শ্রীচরণ ও কানু দুইজনে একসঙ্গে বলিল—তুমিই না হয় বুড়ো হয়ে পড়েছো, আমরা তো আর বুড়ো হইনি, এবারে হরু সেখের চৈতালি কি ক'রে গোলায় ওঠে, একবার দেখে নেবো।

দুখি খুশি হইয়া বলিল—এই তো চাই। ছ'আনির একজনের অপমানে সকলেরই অপমান। জমিদারের অপমানে প্রজার অপমান, প্রজার অপমানে জমিদারের অসম্মান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বৃহত্তর কর্তব্যকে সমন্বয় করিয়া দুখি যে ব্যাখ্যা প্রদান করিল, তাহাতে শ্রীচরণ ও কানু উভয়েই নিজেদের অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভব করিতে লাগিল। দু'জনেরই মনে হইল এই ব্যাখ্যার আকর্ষণে তাহাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ক্ষতি তাহার ক্ষুদ্র সীমা ছাড়াইয়া একটা মহত্তর মহিমা পাইয়াছে—এবারে তাহার জন্য প্রাণ খুলিয়া লড়াই করা যায় এবং অপরকেও তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করা চলে। কারণ এখন দুখির ধান কাটার দুঃখ, কানুর দধির মূল্য প্রভৃতি বস্তু আর তুচ্ছ নয়, যেসব কারণে জগতে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, এসব তাহাদের অন্তর্গত।

দুখি বলিল—চরণ, বাবা, একটু তামাক খাও। শ্রীচরণ উঠিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকাটি দুখির হাতে দিল।

এমন সময়ে সকলে দেখিতে পাইল, টোলের পোড়ো শশাঙ্ক বাজার হইতে ফিরিতেছে, তাহার এক হাতে একটি দোদুল্যমান নাবালক অলাবু, অপর হস্তে একটি কচুপাতার ঠোঙা, বোধ করি তন্মধ্যে কিছু কুচো চিংড়ি, কারণ অলাবুর অনিবার্য উপকরণরূপে উক্ত বস্তুটাই লোকপ্রসিদ্ধ।

দুখি বলিল—একবার দাদাঠাকুরকে ডাকো না—

কানু বলিল—তার দরকার হবে না, তামাকের ধোঁয়া দেখেছে পোড়ো ঠাকুর এল ব'লে।

কানুর কথাই সত্য। শশাঙ্ক ন্যায়শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত নহে, যেহেতু

ধোঁয়া দেখিয়াই সে অগ্নি অনুমান করিয়া লইয়াছে। শশাঙ্ক নিকটে আসিতেই সকলে বলিয়া উঠিল, এই যে দাদাঠাকুর, বসতে আজ্ঞা হোক। সে ইতস্তত লক্ষ্য করিয়া একটি উৎপাটিত গাব গাছের ডালের উপরে বসিয়া বলিল—তারপরে, কি কথা হচ্ছিল? কই, কিছু আছে নাকি? এই বলিয়া হুঁকোটার দিকে তাকাইল।

শ্রীচরণ হুকো হইতে কল্কেটা খসাইয়া কলাপাতায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমরা, ছোটবাবুর কথা বলছিলাম।

ততক্ষণে শশাঙ্ক লাউ ও চিংড়ির ঠোঙা পাশে রাখিয়া দিয়াছে। শূন্য হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল—আমাদের ছোটবাবুর মতো লোক হয়? দেবতা, দেবতা! যেমন জ্ঞানে গরিমায় তেমনি দানে ধ্যানে। আহা ওই রকম একটা লোক গাঁয়ে থাকলে গ্রাম শাসনে থাকে।

শ্রীচরণ কল্কেটা অগ্রসর করিয়া বলিল—নাও দাদাঠাকুর।

শশাঙ্ক কল্কেটি সন্তর্পণে ধরিয়া ওষ্ঠাধারে স্থাপন করিয়া মরি-কি-বাঁচি ভাবে টান মারিল। সেই টানে কল্কের আগুন একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ফট করিয়া একটি শব্দ হইল আর কল্কেটি চার চার খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।

কানু বলিয়া উঠিল—দেখ দেখ চরণ, ব্রহ্মতেজ কা'কে বলে? কল্‌কে-ফাটানো দম তোর আমার মতো শুদ্দুরের কি আছে? এ'কেই বলে ব্রহ্মতেজ; এতদিন কানে শুনেছিলাম, এবার চোখে দেখলাম।

নিজের রসিকতায় সে নিজে হাসিয়া উঠিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতপাগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা প্রকাণ্ড কিল শশাঙ্কর ঠিক মাথার উপরে পতনোন্মুখ হইয়াছিল এমন সময়ে কানুর মনে পড়িল, তাহার অনেকটা জমি শশাঙ্কর কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, তাই কিলটাকে তির্য্যগ্‌ভাবে শ্রীচরণের উদ্দেশে চালাইয়া দিতে গিয়া দেখিল, সে নূতন কল্কের সংগ্রহের জন্য উঠিয়া গিয়াছে। কানুর লক্ষ্যভ্রষ্ট কিলটা ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিজের বুকের উপরে মৃদু আঘাত করিয়া যাত্রা সমাপন করিল।

ইতিমধ্যে শ্রীচরণ নূতন কল্কেয় তামাক সাজিয়া আনিয়া শশাঙ্কর হাতে দিল। শশাঙ্ক ধূমচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন ধূম্রযবনিকার সৃষ্টি করিল যে, সে নিজেই অদৃশ্য হইবার উপক্রম।

কানু ঘোষ শ্রীচরণকে বলিল—দেখ চরণ চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

শশাঙ্কর ধূমপান শেষ হইলে সে উদারভাবে কল্কেটি শ্রীচরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

শ্রীচরণ বলিল—কিছু আছে নাকি দাদাঠাকুর!

কানু বলিল—তোর কল্কেটা যে আছে সেই ঢের। বাবা, এ'কেই বলে বামুন-চোষা হুঁকো আর কায়েৎ-চোষা গ্রাম! তারপরে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আজ দেখালে বটে দাদাঠাকুর!

শশাঙ্ক বলিল—কানু, এ আর কি দেখলি! তবু তো আমার গুরুকে দেখিসনি। না, না—কেশরীর কথা বলছিনে। আমাদের গাঁয়ের তারণ পণ্ডিতের কথা বলছি। তিনি একবার আসরে ব'সে হুঁকোয় এমনি টান মারলেন যে হুঁকোর খোলটা ফেটে চৌচির! হাঁ, গুণী লোক ছিলেন বটে তারণ পণ্ডিত।

এই বলিয়া শশাঙ্ক গুণী তারণ পণ্ডিতের উদ্দেশে মাথায় হাত ঠেকাইল।

তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল—এবারে লেগে উঠলো, কি বলো? পুকুরপারের প্রজাদের ঘর জ্বালানো ছোটবাবু নিশ্চই ভুলবেন না। দশানির দক্ষিণপাড়াটায় কবে যে আগুন লাগবে তাই ভাবছি। তুমি কি বলো তুখি?

তুখি বলিল—দাদাঠাকুর, ছোটবাবু কি করবেন, তা কি তোমাকে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে করবেন?

শশাঙ্ক বলিল—তা বটে, তবু তোমরা হ'লে তাঁর একেবারে আপনার লোক, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। ধরো না কেন, দশানির বাবু তো হরু সেখের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু করেন না।

শ্রীচরণ বলিল—সকলের স্বভাব তো এক রকমের নয়। তা ঠাকুর, পুকুর-পারের বাড়িগুলো পুড়ে যাওয়ায় বাবুর চেয়ে তোমার কষ্ট কম হয়নি।

কানু হাসিয়া উঠিল।

সকলেই জানিত বাদলির উপরে শশাঙ্কর বিশেষ একটু টান ছিল। কিন্তু বাদলি এখন ছ'আনির অন্দরমহলে স্থান পাওয়ায় শশাঙ্কর কাছে অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে বুঝিল ইহারা ছ'আনির মতলব সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে, কিন্তু তাহার কাছে সে-সব প্রকাশ করিতে রাজি নয়, তাই সে বলিয়া উঠিল—বেলা হ'ল, দেরি হ'লে ভট্টাচার্য-গৃহিণী বড় রাগাবাগি করেন। তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—তোমরা তো কেশরীকেই জানো, কিন্তু বাবা কেশরিণীকে যদি জানতে। দেবী চৌধুরাণী হার মেনে যায়। এই বলিয়া সে লাউ ও চিংড়ির ঠোঙা সংগ্রহ করিয়া চিক্কণ টাকে রৌদ্র প্রতিফলিত করিতে করিতে টোলের দিকে যাত্রা করিল।

সে একটু দূরগত হইবামাত্র কানু বলিয়া উঠিল, বেটা গোয়েন্দা এ পক্ষের খবর নিয়ে ও পক্ষে দেয়, আবার ওপক্ষের খবর নিয়ে এপক্ষে আসে।

শ্রীচরণ বলিল—ঠাকুর সেদিন বুঝতে পারবেন, যেদিন দুইপক্ষ একসঙ্গে চেপে ধরবে।

শশাঙ্ক লোকটাকে গাঁয়ের অনেকেই ভয় করে। টোলে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে মহাজনী ব্যবসা চালাইয়া থাকে, চড়া সুদে টাকা ধার দেয়, গ্রামের অনেকেরই জমিজমা তাহার কাছে দায়ে বদ্ধ। সকলেরই তাহার উপরে রাগ, কিন্তু কেহই কিছু করিতে সাহস পায় না।

কানু বলিল—দুইপক্ষে একবার লেগে উঠলে হয়, আমি একবার দাদা-ঠাকুরকে দেখে নিই।

শ্রীচরণ জিভ কাটিয়া বলিল—আর যাই করিস্, প্রাণে মারিস্ না বাপু। দলিল-কবালা টাকাকড়ি যা পাস্ নিস্, কেউ দোষ দেবে না; আর এক কাজ করিস্, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে নিস্, কোনকালে কলম ধ'রে আর যাতে খত লিখতে না পারে। বুঝলি?

দুখি সব চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এবারে সে মৌনভঙ্গ করিল, বলিল, বিনা

পয়সায় একটা মলম দিতে ভুলিস্ না। হাজার হোক, বামুনের ছেলে তো—পরকাল আছে রে, পরকাল আছে।

কানু বলিল—পরকাল থাকলে কেউ শতকরা বারো টাকা সুদে চক্রবৃদ্ধি লিখিয়ে নেয়!

দুখি বলিল—তোরা সব ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিস না। পরকাল আছে ব'লেই তো চড়া সুদ আদায় করে। পরকাল মানে ভবিষ্যৎ, যেমন আজকার দিনের পরকাল কালকের দিন।

সকলে দুখির নূতন ব্যাখ্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

৫

সন্ধ্যাবেলা শশাঙ্ক হরু সেখের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরু সেখ দশানির একজন প্রধান প্রজা। দশানির বিপদে-আপদে সে সর্বদাই জমিদারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়। তাহার অবস্থা বেশ ভালো তাহার গোলাভরা ধান, গোয়াল-ভরা গোরু, কৃষাণ ও চাকর-বাকরে অনেকগুলি লোক তাহার বাড়িতে, দক্ষিণপাড়ার অনেকটা জুড়িয়া তাহার বাড়ি-ঘর। হরু এখন বৃদ্ধ হইয়াছে। যে-পরিমাণে তাহার টাকাকড়ি, তাহারই বিপরীত পরিমাণে মুখে তাহার দন্তের অভাব। দাঁত থাকিবার সুবিধা সর্বজনবিদিত, কিন্তু না থাকিবার সুবিধাও অল্প নহে। দন্তপঙ্ক্তি মানুষের হাসির পক্ষে ততটা বাধা। প্রাণখোলা হাসি দাঁতের বাঁধে বাধাগ্রস্ত হয়, হরুর দাঁত না থাকায় সমস্তটা হাসি অবাধে বাহির হইতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধের হাসি-কান্না প্রধান অস্ত্র; দাঁত না থাকায় এই অস্ত্র নির্বাধে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ছাড়া হরুর বাম গালে, চোখের ঠিক নীচেই, মস্ত একটা আঁচিল। যখন সে হাসিত, ওই আঁচিলটা তালে তালে হাসির তাল রক্ষা করিত। আর যখন সে কাঁদিত, অশ্রুস্রোত অবাধে না পড়িয়া আঁচিলে বাধা পাইয়া দ্বিধাভক্ত হইয়া ঝরিত। হরু বলিত, হিন্দুস্থানে থাকি, তাই আমার চোখে

গঙ্গা-যমুনা ঝরে। আবার যখন সে রাত্রিবেলা খাইতে বসিত, কেরোসিনের ডিবের আলোয় আঁচিলের ছায়াটা গিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুড়-সুড়ি দিত। দুপুর রোদে সে নড়িলে-চড়িলে আঁচিলের ছায়াটা ঘড়ির কাঁটার মতো তাহার গালের উপর ঘুরিত। হরু বলিত, আল্লা ঘড়িসুদ্ধ হরু সেখকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি জানতেন কিনা হরু গাঁয়ের প্রধান হবে। শ্রোতারা অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করিলে সে বলিত, অবিশ্বাস করছ? আচ্ছা বলো, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর হরি সর্বজ্ঞ কিনা? শ্রোতারা অস্বীকার করিতে পারিত না। হরুর দিলখোলা হাসি দন্তহীন ওষ্ঠাধর বাহিয়া অবাধে নির্গলিত হইয়া তাহার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দিত।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, হরুর চরিত্রে কোনো দোষত্রুটি ছিল না। মোটেই না। তবে স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, হরুর চরিত্রে ছোট-খাটো দোষত্রুটি থাকিলেও একটি মহৎ গুণ ছিল, সেটি তাহার একটি নিয়মচর্যা। সন্ধ্যাবেলা সে বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া গাঁজার কল্কেটি ধরাইবেই। এই নিয়মের অন্যথা হইবার উপায় ছিল না। পৃথিবী রসাতলেই যাক, আর আকাশ ভাঙিয়াই পড়ুক, কেহ কখনো ইহার অন্যথা হইতে দেখে নাই। কেবল একটি-বার মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম প্রকারান্তরে নিয়মের আমোঘতারই প্রমাণ।

সে অনেক দিন আগের কথা। নিয়মিত সময়ে হরু কল্কেটি ধরাইতে যাইবে এমন সময়ে খবর আসিল যে, জোড়াদীঘির বাজারে আগুন লাগিয়াছে, অমনি সে কল্কে রাখিয়া বাজারের দিকে ছুটিল। বাজারে লোক কম জড়ো হয় নাই, কিন্তু কিছুই রক্ষা পাইল না। কেবল মৌতাতিদের ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলায় এবং প্রাণপণ-করা দক্ষতায় মদের ভাটি ও আবগাবির দোকানখানি রক্ষা পাইল। এই ঘটনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সাধারণত লোকের ধারণা এই যে, মৌতাতিগণ অকর্মণ্য ও অপদার্থ। কিন্তু জোড়াদীঘির বাজারের সেই অগ্নিকাণ্ড নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে নেশারুগণ যে একতা ও কর্ম-কৌশল দেখাইতে পারে, তাহা সর্বসাধারণের অনুকরণের স্থল। তবে যে

সাধারণত তাহারা নিষ্ক্রিয়—তার অর্থ, উপযুক্ত কারণ সদাসর্বদা সুলভ নহে। তজ্জন্য মৌতাতিগণকে দোষী করা চলে না।

সচরাচর মাতাল, গাঁজিল ও অহিফেনসেবিগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। গাঁজিলগণ মাতালকে ভয় করে। আর অহিফেনসেবীরা দুইজনেরই ভয়ে অস্থির। কিন্তু সেদিন তাহারা চিরদিনের বৈরিতা ও ভীতি বিস্মৃত হইয়া শৃঙ্খলাচালিত সৈন্যবাহিনীর মতো সেই জতুগৃহে প্রবেশ করিল এবং জোড়াদীঘির সকলের সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া মদের পিপে, গাঁজার থলে এবং আফিমের বাক্স টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, ওরাও মানুষ, এবং অবশেষে নিজেদের নিক্রিয়তায় আত্মধিক্কার করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল—ওরাই মানুষ। সকলে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিল যে, নেশা ছাড়া মানুষে কখনো কোনো মহৎ কর্ম করে নাই, করিতে পারে না, করা সম্ভব নয়। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ ছিলেন, গোপনে গোপনে তাঁহারা নেশা করিতেন। অতঃপর জোড়াদীঘির নেশারুর সংখ্যা বাড়িয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু না বাড়িলে বলিতে হইবে তাহাদের বিশ্বাসে ও আচরণে ঐক্য নাই।

তারপরে মৌতাতিগণ নেশার বস্তু লইয়া গিয়া নদীর ধারে একান্তে বসিল এবং নেশার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিল। পেটে মদ ও আফিম পড়িবামাত্র এবং গাঁজার ধোঁয়া মগজে প্রবেশ করিবামাত্র পট-পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

মাতালদের ধারণা হইল—তাহারা বিহঙ্গ। কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—কোন্ শালা বলে আমরা পা দিয়া হাঁটি। বেটারা কি চোখ দিয়া দেখে না—এই দেখো আমরা কেমন উড়িতেছি।

পার্শ্ববর্তী অহিফেনসেবীদের তখন ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহারা কুমীর ছাড়া আর কিছু নয়, তাই তাহারা কুমীরের মতো বুক দিয়া হাঁটিতে চেষ্টা করিতেছে। একজন মাতাল একজন অহিফেনসেবীকে বলিল—আয় বেটা আমার সঙ্গে, তোদের উড়তে শেখাই। কিন্তু অহিফেনব্রতীরা তাহাদের নবলব্ধ চাল ছাড়িতে রাজি হইল না, তাহাদের পিঠে মাতালদের কিল চড়

পড়িতে লাগিল। অহিফেনসেবীরা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল—মাছগুলা বড়ই বেয়াদব, অন্যথা এমন করিনা ঠোক্‌রায় কেন?

অদূরে গাঁজার ধোঁয়া তখন গাঁজিলদের মগজে চড়িয়া বিশ্বসংসারকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই তখন সংসার-আকাশের এক একজন পরমহংস। বলা বাহুল্য এই দলের মধ্যে অন্যতম হরু সেখ। সে বলিয়া উঠিল—যাঃ শালা! আমি এ সংসার ছেড়ে বনে চল্লাম। এই বলিয়া সোজা সে বাড়িতে চলিয়া আসিয়া কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ হেন হরু সেখের বাড়িতে শশাঙ্ক প্রবেশ করিবামাত্র হরু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বসাইল। তারপরে ছোট কল্কেটি সযত্নে সাজাইয়া এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া শশাঙ্কর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—নাও দাদাঠাকুর।

শশাঙ্ক বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে কল্কেটিকে করপুটে ধরিয়া ওষ্ঠপুটে স্থাপন করিল। শশাঙ্ক নিখিল নেশা-সমুদ্রের পারঙ্গত, কোনরূপ নেশায় তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে নেশার সব্যসাচী বলিলে কম বলা হয়; কারণ সব্যসাচী বলিতে মাত্র দুই হাতের দক্ষতা বোঝায়। বরঞ্চ তাহাকে নেশার বামনাবতার বলা উচিত। দুইখানি পায়ে কঠিন ও তরল নেশাকে আয়ত্ত করিয়া তৃতীয় চরণের দ্বারা বায়বীয় নেশার বায়ুমণ্ডলকে সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

গাঁজার ধোঁয়া যতই তাহার মুখে ঢুকিতে লাগিল, ততই তাহার চক্ষু দুইটি অধিকতর নিমীলিত হইতে হইতে অবশেষে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া আসিয়া মুখমণ্ডল একপ্রকার সোঽহংভাব উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

এমন সময়ে সেখ-গিন্নী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শশাঙ্ককে দেখিয়া বলিল—এই যে ঠাকুর এসেছ, ভালোই হয়েছে। তুমি একটা বিচার করো দেখি। তোমাদের বুড়ো মাথামুণ্ডু যা খায় খাক্। কিন্তু শেষে ছেলেটা যে গাঁজা ভাঙ ধরলো তার কি করা যায়? এই বয়সে গাঁজা ভাঙ ধরলে জীবনে যে কত কষ্ট পাবে তার ঠিক নেই। তুমি একটু বুড়োকে বুঝিয়ে বলো, ছেলেটাকে নিষেধ করে যেন। এই বলিয়া সেখ-গিন্নী আঁচলের প্রান্ত চোখে ঠেকাইল।

শশাঙ্ক এরকম কর্তব্য-দ্বন্দ্বে জীবনে আর পড়ে নাই। উপদেশদান ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার, তাহাতে মুখ খোলা ছাড়া আর কোনো কষ্ট নাই। কিন্তু মুখ খুলিলেই গাঁজার ধোঁয়ার কিয়দংশ নিশ্চয়ই বাহির হইয়া মহাশূন্যে পালাইবে। এমন অবস্থায় শশাঙ্কর কি কর্তব্য ভাবিয়া না পাইয়া, ডান করতল দিয়া সে নিজের ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল, যাহাতে অবাধ্য মুখ ফাঁক হইয়া বিন্দুমাত্র ধোঁয়াও না বাহির হইয়া যাইতে পারে। পথান্তরহীন ধোঁয়া মগজে চড়িলে শশাঙ্কর দৃষ্টিতে জীবনের বিশ্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে কল্কেটি হরুর হাতে দিতে দিতে ভাঙা গলায় বলিল—শোনো সেখ-গিন্নী, তোমাকে বুঝিয়ে বলি, চিঁড়ে আর মুড়ি এক বস্তু নয়। আর আকাশে ওড়ে ব'লেই কি চামচিকে ও বাদুড় এক জাত?

এই বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তবে? পুনরায় সে আরম্ভ করিল —একি তোমার আমার ছেলে যে ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি আর জল খাবে? আরে এ যে হরু সেখের ছেলে, ও তো গাঁজা ভাঙ খাবেই। আর এখনই কি হয়েছে? মদ আফিম তো এখনো ধরেনি।

হরুর দিকে চাহিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—ভয় নেই দাদা, কোনো চিন্তা ক'রো না, ক্রমে ধরবে। আবার সেখ-গিন্নীর দিকে তাকাইয়া বলিল—মদ আফিম গাঁজা ভাঙ সব খাবে, এ-দিক ও-দিক যাবে। সিংহের শাবক কি কদলী ভক্ষণ করে? এই আমি পাঁতি লিখে দিলাম। এই বলিয়া সে শাস্ত্রজ্ঞানের গৌরবে ঋজু হইয়া উপবেশন করিল।

ইতিমধ্যে হরু সেখ কল্কে-চর্চা সমাধান করিয়াছে। শশাঙ্কর উক্তি শুনিয়া সে আনন্দে তাহার পায়ের উপরে পড়িয়া বলিল—আহা হা, কি কথাই না শোনালে ঠাকুর! মাগীর বড়ই দেমাক্ হয়েছিল। তারপর গিন্নীর দিকে তাকাইয়া বলিল—শুনলে তো? ও কি তোমার ছেলে যে ডাল ভাত খাবে? নিজের বুকের উপরে এক চড় মারিয়া বলিল—ও যে আমার ছেলে, মদ ভাঙ খাবে, নিশ্চয়ই খাবে। এই পর্যন্ত বলিয়া সে আবার শশাঙ্কর পায়ের উপরে পড়িল।

শশাঙ্ক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—আরে কি করো, কি করো? পায়ে হাত দিলে যে অপরাধী হবো। তারপরে গম্ভীরস্বরে বলিল—যে হরু সে হরি, কিরাতের ছদ্মবেশে মহাদেবের মতো যবনের ছদ্মবেশে তুমি না জানি কোন্ দেবতা। আমিও তোমার পায়ের ধূলো না নিয়ে ছাড়ছিনে।

এই বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া তাহার পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিমালয়ের উপত্যকায় দুইটি বন্য মহিষ মাথা নীচু করিয়া পরস্পরকে যেমন আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তেমনি তাহারা পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিতে লাগিল। সে চেষ্টা সফল হইবার নয় দেখিয়া তাহারা সরল হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ভাবাবেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল—একজনের মুখে হরি, হরি, অপরের মুখে আল্লা, আল্লা—দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকিল একটা সুগম্ভীর সুদীর্ঘ হল্লা! ইহার পরেও যদি কেহ বলে যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য অসম্ভব তাহাকে আর কি বলিব? হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের একমাত্র অন্তরায় নেশার অভাব। উপযুক্ত নেশায় সকলি সম্ভব—আর নেশা ছাড়া জগতে কবে কোথায় মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে?

কিছুক্ষণ পরে দুইজনে ক্লান্ত হইয়া বসিলে শশাঙ্ক বলিল—দাদা, একটা সংবাদ দিতে এসেছিলাম। ছ'আনির লোকজন শলা-পরামর্শ আরম্ভ করেছে, আমি নিজের কানে শুনেছি। ভাবলাম, যাই একবার হরু সেখকে ব'লে আসি। দশানির সে-ই মন্ত্রী। তার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তো বাবু কোনো কাজ করবে না—তাই তাকে একবার সব জানিয়ে আসি।

হরু বলিল—বামুন দাদা, তুমি কিছু ভেবো না, আমরাও চুপ ক'রে ব'সে নেই। ওই বুড়ো বেল দখল ক'রে নেবার জন্যে আমরাও লোকজন সংগ্রহ করতে লেগে গিয়েছি। বাবা—এর নাম কীর্তিনারায়ণ—বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় তার দাপটে!

শশাঙ্ক সমস্ত শুনিয়া বলিল—যাক্, আমার দুশ্চিন্তা দূর হ'ল! জানতাম চিন্তার কোনো কারণ নেই, হরু দাদা যখন এর মধ্যে আছে আর কারো চিন্তা করা বৃথা। উঠি দাদা, আজ রাত্রি হ'ল।

তারপরে গলা একটু খাটো করিয়া অনুরোধ ও আব্দারের স্বরে বলিল— বড়বাবুকে একটু আমার হয়ে ব'লো।

হরু বলিল—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমার ভুল হবে না।

শশাঙ্ক উঠিয়া রওনা হইল—বৈরাগ্যপ্রণোদিত হইয়া তখন সে গান আরম্ভ করিল—

"না লাগে টাকাকড়ি, না লাগে ধন,

বাবা ব্যোম, বাবা ব্যোম!

না লাগে দয়ামায়া, না লাগে মন,

বাবা ব্যোম, বাবা ব্যোম!"

তাহার গান দূর হইতে শুনিতে শুনিতে হরু ভাবিতে লাগিল—বেটা বাদুড়! দু'দিকে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়াও, তোমাকে আমি জব্দ না ক'রে ছাড়ছিনে।

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় হরুর নেশা ছুটিয়া আসিতেছে। যতক্ষণ নেশা ছিল দু'জনে এক ছিল, নেশা কাটিয়া যাইবা মাত্র দুইজনে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। নেশাতেই বল আর নেশাতেই একতা—নির্বোধ বাঙালী এই মহৎ সত্য কবে বুঝিতে শিখিবে!

৬

ভালোবাসা এক, ভালোবাসার প্রকাশ আর; ভালোবাসা ও ভালোবাসার প্রকাশ সর্বদা সমগামী নয়, ভালোবাসিলেই যে ভালোবাসার প্রকাশ সম্ভব এমন নয়, ভালোবাসা পাইলেই যে তাহার প্রকাশও পাইবে এমন না হইতেও পারে। যে ভালোবাসিল অথচ যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারিল না তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য—ওই অপ্রকাশিত বেদনার ভার তাহার অন্তরকে ব্যথিত করিতে থাকে। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গের সর্বত্র রৌদ্র পড়িতেছে—কিন্তু সমস্ত তুষার তো গলে না। যে তুষারস্তর সূর্যের উত্তাপে আত্মবিগলিত ধারায় যমুনা জাহ্নবীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল—তাহার জীবন ধন্য। ওই জলধারার আত্মবিসর্জনেই তাহার মুক্তি।

কিন্তু যে অভ্রভেদী তুষার-উত্তুঙ্গতা সূর্যকিরণেও বিগলিত হয় না, অন্তর্নিহিত বেদনার ভারে সে কি প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে না? তাহার বন্ধ্যা নির্জনতা কি ভয়ঙ্কর! প্রতি মুহূর্তের বেদনা সঞ্চিত হইতে হইতে অবশেষে এক সময়ে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়, তখন যুগান্তের স্তূপীকৃত বেদনা আত্মনাশের আড়ম্বরে ধ্বসিয়া পড়ে—বাসুকির শির বিচলিত হয়। ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রকাশে গঙ্গা যমুনা; ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবের পরিণাম তুষারস্তূপের ভূমিকম্প।

মুক্তামালা সেই জগতের মেয়ে, যে সহজে ভালোবাসার প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আর-দশজনের মতো হাসিয়া, কাঁদিয়া, ভাবার মনোরম ললিত বেণী রচনা করিয়া ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ করিতে সে অক্ষম। এই অক্ষমতা একটি সাংসারিক ত্রুটি। সংসারে অনেক দুঃখের উদ্ভব এই ত্রুটি হইতে। আবার অনেক দুঃখের হাত হইতে সংসার বাঁচিয়া যায় ওই একটি গুণ থাকিলে। বস্তুত সংসারের মানদণ্ডের বিচারে ভালোবাসা বড় কি তাহার প্রকাশটাই বড়—সে সমস্যা চিরকালই থাকিয়া যাইবে।

মুক্তামালা গ্রামের নূতন পরিবেশের মধ্যে অসিয়া পড়িয়াছে। এখানে তাহার স্বামিসেবা আছে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ আছে, আবার গ্রামের যে সব অনুগত মেয়েরা অন্তঃপুরে আসিতে পারে তাহাদের সঙ্গেও কিছুটা সময় উদ্বৃত্ত থাকে, সেই সময়টাতে অপ্রকাশিত বেদনার ভার একান্তভাবে সে অনুভব করিতে থাকে। এই সময়টার সঙ্গী ওই মেয়েটি, বাদলি। পুকুরপারের আর-সব মেয়েরা তাহাদের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছে, ঘরবাড়ি জমিদার-পক্ষ হইতেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মুক্তামালা বাদলিকে ছাড়ে নাই। তাহাকে বলিয়াছিল—বাদলি, তুই আমার কাছেই থাক্ না। বাদলী হী হী করিয়া অভ্যস্তভাবে হাসিয়া উঠিল—ডাক দিয়া বলিল—মোতির মা, দেখো—হাসতে জানলে কি ফল হয়! মোতির মা ক্রোধে বিড়বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ছ'আনির বাড়ির দালানে বহু পায়রার বাস। এই পায়রাগুলি মুক্তামালার

আর এক সঙ্গী হইল। পায়রাগুলি সারাদিন কার্নিসের উপর বসিয়া গম্ভীরভাবে গলা ফুলাইয়া ডাকিত। মুক্তামালা জানলায় বসিয়া দেখিত, ডাকিবার সময়ে পায়রাগুলির গলা একটু ফুলিয়া ওঠে, গলা ফুলিতেই তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ হয়! পায়রাগুলি সাদা চঞ্চু দিয়া পিঠের পালক উৎক্ষিপ্ত করে, দু'একটি পালক খসিয়া বাতাসে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে থাকে। তাহার মনে হয় ওই সে শব্দ যেন জীবকণ্ঠের নয়, নিস্তব্ধ অট্টালিকারই যেন বাণীরূপ। বিকালবেলায় বাদলিকে লইয়া সে ছাদের উপর উঠিয়া পায়রা-গুলিকে ধান ছড়াইয়া দেয়। ইতিমধ্যেই পাখীগুলি নূতন সুযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে! মুক্তামালা ছাদে গিয়া দাঁড়াইতেই সবগুলি পায়রা ছাদে সমবেত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া গলা কাঁপাইয়া বক বকম করিয়া ডাকিতে থাকে। বোধ করি সারাদিন এই সময়টির আশাতেই তাহারা অপেক্ষা করে। মুক্তামালা ও বাদলি ধান ছড়াইয়া দেয়, অমনি মাথা নীচু করিয়া, পাখা কাঁপাইয়া, দেহ সঞ্চালিত করিয়া ধান খুঁটিবার সে কি তাহাদের ভঙ্গী! মুক্তামালা দেখে, কত রকমের তাহাদের রঙ! সাদা পায়রাগুলি বোধ করি তাহাদের রঙের আভিজাত্য সম্বন্ধে সচেতন, পাশে অন্য রঙের কাহাকেও বড় ঘেঁসিতে দেয় না! মুক্তামালা দেখিতে থাকে—তাহার মনে হয়, সমস্ত ছাদটা পাখার কাঁপনে, দেহের চলনে সজীব হইয়া ওঠে। ধান খুঁটিতে তাহারা এতই ব্যস্ত যে শব্দ করিবার সময়ও তাহাদের নাই—কেবল অব্যক্ত, অর্ধব্যক্ত, অস্পষ্ট একপ্রকার মৃদুরব উত্থিত হয়, ধান খুঁটিবার, নড়িবার এবং সতৃপ্ত গলাধঃকরণের। মুক্তামালার এই বিহঙ্গপ্রীতি তাহার অপ্রকাশিত ভালোবাসার এক অতি ক্ষীণ প্রকাশ।

মুক্তামালার অনেকটা সময় কাটে বাদলিকে লইয়া। মেয়েটাকে তাহার বড়ই পছন্দ হইয়া গিয়াছে। বিকালবেলা চুল বাঁধা উপলক্ষ্য করিয়া আয়না চিরুনি ফিতে কাঁটা লইয়া বসিয়া দু'জনে গল্প করে। বাদলি প্রথমে তাহার চুল বাঁধিয়া দেয়, তারপরে মুক্তামালা বলে—আয় বাদলি, তোর চুল বেঁধে দি। প্রথম প্রথম বাদলি রাজি হইত না, বলিত, সে কি বৌঠাকরুন, আমার চুল

কেন তুমি বাঁধতে যাবে? ওতে যে আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। এর পরে আমার চুল বেঁধে দেবে কে? বলিতে বলিতে নিজের কুঞ্চিত চুলের গোছা ধরিয়া চটপট বাঁধিয়া ফেলিত—দেখো বৌঠাকরুন, কত শীগ্‌গির আমি বাঁধতে পারি। তারপরে খোঁপার উপরে দু'একটা থাবা মারিয়া সেটাকে বসাইয়া দিতে দিতে বলিত—যে চুল! কিন্তু ক্রমে সে রাজি হইল। এখন মুক্তামালার চুল বাঁধিয়া দিবার পরে মুক্তামালা তাহার চুল বাঁধিয়া দেয়। চুলে টান পড়িলে সে খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে। আর চুল বাধিবার সময়ে দু'জনের মধ্যে গল্প চলিতে থাকে। চুল বাঁধিবার সময়ে মনের কথা বলিবার প্রশস্ত সময়—কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পায় না।

বাদলি তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে পল্লীজীবনের অনেক রহস্য মুক্তা-মালাকে শেখায়, তাহার মন্দ লাগে না।

বাদলি বলে—বৌঠাকরুন, সেদিন ক্ষান্তবুড়ি শাক নিয়ে এসেছিল, তুমি পয়সা দিতে গিয়েছিলে, ওরকমটি আর ক'রো না।

মুক্তামালার ঘটনাটা মনে পড়ে। বাস্তবিক সে পয়সা দিতেই গিয়াছিল বটে।

বাদলি বলে, গাঁয়ে যেদিন যার ঘরে চাল বাড়ন্ত সে কিছু শাক বা সজনের ডাঁটা নিয়ে জমিদারবাড়িতে আসে, দুপুরবেলা ভাত নিয়ে যায়। এর পরে যদি আবার কখনো কেউ সকালবেলা শাক নিয়ে আসে, তবে তাকে বলবে—তুমি দুপুরবেলা ভাত নিয়ে যেয়ো। বুঝলে বৌ-ঠাকরুন, এখানকার এই হচ্ছে গিয়ে রীতি। গাঁয়ের জমিদার থাকতে লোকে না খেয়ে থাকবে কেন।

মুক্তামালা ব্যাপারটা বুঝিতে পারে। তবু তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে বলে—কিন্তু আমার যদি শাকের দরকার না থাকে?

বাদলি বলে—তুমি যে জমিদার, তোমার দরকার থাকতেই হবে। আর দরকার না থাকলেও ফিরিয়ে দিতে পারো না। আর তার বদলে যদি পয়সা দিতে যাও, লোকে রাগ করবে। বলবে—আমরা কি শাক বেচতে এসেছি।

মুক্তামালা বলে—তবে ভাতই-বা নেবে কেন ?

বাদলি বলে—ভাতে দোষ নেই। ভাত তো পয়সা নয়। আর ও তো ভাত নয়—প্রসাদ। এই বলিয়া সে হাসিয়া ওঠে। মুক্তামালাও তাহার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়।

মুক্তামালা একদিন শুধাইল—হাঁরে বাদলি, তোকে সবাই সেদিন যে ঠাট্টা করছিল, বলছিল তোর মতন হাসতে পারলে আর অভাব থাকবে না, ব্যাপারটা কি রে ?

বাদলি বলে—সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না বৌঠাকরুন।

মুক্তামালা সেদিন আর জিজ্ঞাসা করিল না। দু'একদিন পরে আবার শুধাইল। এমন করিয়া জিজ্ঞাসা ও নিরুত্তরের পালা কয়েকদিন চলিলে মুক্তামালার বেণী-গ্রন্থন উপলক্ষ্যে কেহ কাহারো যখন মুখ দেখিতে অসমর্থ, বাদলি বলিল—তবে শোনো বৌঠাকরুন। গাঁয়ে টোলের এক পোড়ো আছে, নাম শশাঙ্ক ঠাকুর। পড়াশোনা তার যেমন তেমন, নাগরালি ক'রে বেড়ানোই তার কাজ। আমার উপর ঠাকুরের বড় সুনজর। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। পথঘাটে দেখা হ'লে একটা পাকা আম কি পাকা পেয়ারা দিত। টোলের ভট্টাচার্যের অনেক ফলের গাছ আছে। পথে নিরিবিলি দেখা হ'লে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গুন গুন ক'রে গান করতো, আর বলতো, বাদলি, তুই ময়লা কাপড় পরেছিস্ কেন রে ? আমি বলতাম—এত ফরসা কাপড় পাই কোথায় ? একদিন হ'ল কি জানো বৌঠাকরুন, তখন আমাদের হবিতলায় মেলা চলছে, ঠাকুর একখানা ডুরে শাড়ি কিনে নিয়ে এসে হাজির—একেবারে আমাদের বাড়িতে। বললো—এই নে বাদলি, ফরসা কাপড় পরিস্। বুঝলে বৌ-ঠাকরুন, আমি আবার বোকা-হাবা, নিলাম শাড়িখানা। তারপরে বিনোদিনী শাড়িখানা দেখে শুধালো—এ শাড়ি কোথায় পেলি রে বাদলি ? আমি সব বললাম। শুনেই সে মুচকে হাসলো। সেই হাসিতে আমার কেমন সন্দেহ হ'ল। তারপর থেকে শশাঙ্ক ঠাকুরকে আমি এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু আমি এড়িয়ে চললে কি হবে—বিনোদিনী যখন জানলো—গাঁয়ের সকলেই জানলো। ওই ওর

স্বভাব, কোনো কথা ওর পেটে থাকে না। আমার বড় রাগ হ'ল ঠাকুরের উপরে। সেদিন ক্ষীরপুরের মেলা, আমাদের পাড়ার সবাই গিয়েছে মেলা দেখতে। এমন সময়ে ঠাকুর দু'টো আম হাতে ক'রে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বললো—বাদলি, এই নে আম, নুন লঙ্কা দিয়ে খাস্। তারপরে দাওয়ায় ব'সে বললো—একটু তামাক খাওয়া বাদলি। আমি বললাম—এখানে কেন ঠাকুর, ভিতরে গিয়ে ব'সো। ঠাকুর যেমনি ভিতরে গিয়েছে, অমনি আমি ঝনাং ক'রে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে দৌড; ভাবলাম মনে মনে, থাকো ঠাকুর কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে।

মুক্তামালা শুধাইল—হাঁরে তোর তো সাহস কম নয়! তারপরে কি হ'ল?

বাদলি বলিল—তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, ভাবলাম এবার শিকল খুলে দিই গিয়ে—ঠাকুরের নিশ্চয় এতক্ষণে খুব শিক্ষা হয়েছে। শিকল খুলে ঘরে ঢুকে দেখি, ওমা কেউ নেই। এখানে দেখি, সেখানে দেখি, তক্তপোষের তলায় দেখি, কোথাও কেউ নেই—সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। গালে হাত দিয়ে ভাবি—কি হ'ল? এমন সময়ে উপরে নজর পড়লো—চালের খড় যেন একটু আলগা। ভালো ক'রে চেয়ে দেখি, যা ভেবেছি ঠিক তাই। চালের খড় সরিয়ে ঠাকুর পালিয়েছে। বুঝলে বৌ-ঠাকরুন, আমি জব্দ করবো ভেবেছিলাম, আমি নিজেই জব্দ হয়ে গেলাম।

মুক্তামালা শুধায়—তোর লজ্জা করলো না বাদলি?

বাদলি বলে—লজ্জা করবারই তো কথা। কিন্তু সবাই এ নিয়ে এত হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো যে সকলের উপর আমার রাগ হ'ল। মনে মনে ঠিক করলাম যে, আমি লজ্জা না পেলেই ওরা জব্দ হবে। তাই জোর ক'রে আমিও হাসতে শুরু করলাম, ছয়কে নয় ক'রে বানিয়ে সকলকে শোনাতে লাগলাম। বৌ-ঠাকরুন, যার ভাঙা ঘর তার কি বৃষ্টির জলকে ভয় করলে চলে? ফুটো চাল দিয়ে যখন জল পড়ে—তখন ভাবতে হয় যে, ওই ফুটো দিয়ে চাঁদের আলোও তো আসে।

মুক্তামালার ভারি বিস্ময় বোধ হয় এই মেয়েটির কথায় ও ব্যবহারে। যাতে আর দশজন লজ্জিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইত তাহার প্রতি মেয়েটির কি সহজ ভাব। বিষয়টা যে লজ্জার তাহা সে জানে, কিন্তু এই অসহায় বালিকার লজ্জা পাইবার অবকাশ কোথায়? কেহ তাহাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবে না, রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না, বরঞ্চ জব্দ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছে—এরকম ক্ষেত্রে লজ্জার ভারে সে যে ভাঙিয়া পড়ে নাই, ইহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে-স্রোত এই বালিকাকে বানচাল করিয়া দিতে পারিত, তাহাকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়া সে কেমন কৌশলে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছে। এই মেয়েটির মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলিয়াই মুক্তামালার নির্জন পল্লীবাসে সে তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিল।

নবীননারায়ণের সাহচর্য মুক্তামালা অধিকক্ষণ পাইত না। একে তো পল্লীগ্রামের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিরল, তার উপরে নবীন তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কর্মস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সকালবেলা সে কাছারিতে গিয়া বসিত, কর্মচারী ও প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তায়, মহকুমা ও সদর হইতে আগত উকীল-মোক্তারদের সহিত পরামর্শে অনেকটা সময় তাহার যায়। দুপুরবেলা খানিকটা বিশ্রামের পর আবার লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনায়, শলাপরামর্শে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যাইত। সারাদিনের পরিশ্রমে ও বিরক্তিতে তাহার নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইত না। কাজেই সারা দীর্ঘদিন মুক্তামালা একাকী। তাহার প্রধান সঙ্গী বার্দালি। আর ওই পুরাতন বৃদ্ধা ঝি জগার মা। এই দাসীটি বহুকাল হইল ছ'আনির বাড়িতে আছে। নবীনকে শৈশবে সে মানুষ করিয়াছে। দাসী ও গৃহকর্ত্রীর মাঝামাঝি স্তরে সে বিরাজমান। ছ'আনির বাড়ির, ছ'আনির জমিদারদের অনেক পুরাতন কাহিনী তাহার পরিজ্ঞাত। অবসর সময়ে মুক্তামালা তাহার কাছে শ্বশুরকুলের প্রাচীন কাহিনী শুনিত। সময় কাটিত। তাহা ছাড়া এইসব অদৃশ্য সূত্রের সঙ্গে নিজের জীবনকে গ্রথিত করিয়া ছ'আনির অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবার চেষ্টায় সে একপ্রকার আনন্দ, একপ্রকার গৌরব অনুভব করিত। মেয়েরা পিতৃকুল ও

শ্বশুরকুলের দু'কূলে সংযত নদী। কূলপ্লাবিনীগণ শিল্পীর কাম্য হইতে পারে, সংসারের তাহারা কেহ নয়।

৭

সন্ধ্যাবেলা ছাদের উপর বসিয়া জগার মা পুরানো দিনের গল্প বলে, মুক্তামালা অবাক্ হইয়া শোনে, পাশে বসিয়া থাকে নির্বাক্ বাদলি।

জগার মা বলে—বৌমা, এ আর কি মারামারি দেখছ! আমরা যেসব কাণ্ড বয়সকালে দেখিছি, তার তুলনায় এসব তো ছেলেখেলা। নবীন তো আর জমিদার সেজে বসলো না, লেখাপড়া শিখে সে ওই কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা হ'ত তোমার শ্বশুরের সময়ে। বাপরে বাপ, সে কি কাণ্ড, মনে পড়লে এখনো গা-টা শিউরে ওঠে।

এই বলিয়া সে আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বলে—একদিনের কথা মনে পড়ছে। সকালবেলায় কেবল উঠেছি, তখনো মুখেচোখে জল দিইনি, এমন সময়ে কিছু না হবে তো জনপঞ্চাশ লাঠিয়াল এসে পড়লো কাছারিবাড়িতে। আমাদের লোকজন তৈরী ছিল না। আর ছিলই বা কে? মিলন সর্দার সেদিন মহাল শাসন করতে গিয়েছিল। সেই খবর পেয়েই সাহস ক'রে দশানির লোক এসে পড়েছে। সব লুটে নিয়ে যায় আর কি! তখন তোমার শ্বশুর নিত্যনারায়ণ, আহা মহাপুরুষ স্বর্গে গিয়েছেন—এই বলিয়া সে কপালে হাত ঠেকাইল—তিনি দাঁড়ালেন ছাদের উপরে দোনালা বন্দুক হাতে ক'রে—গুড়ুম, গুড়ুম, দুম্·········

দু-চার মিনিটের মধ্যেই দশানির জন পাঁচ-ছয় পড়লো, বাকিরা সবাই পলাতক, যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ স'রে পড়লো। তখন ছ'আনির লোকজন এসে লাসগুলো পুঁতে ফেললো—ওই ওইখানে, গোলাবাড়ির উঠোনে।

তারপরে একটু থামিয়া পুনরায় বলে, বৌমা, তোমার বাড়ি এত বড় দেখছ—কিন্তু এই এতবড় রাবণের পুরীর যেখানেই খোঁড়ো না কেন, মানুষের কঙ্কাল—দশানির লেঠেল আর রক্তদহের লেঠেলের কঙ্কাল। ওই যে পুকুর

দেখছ—শুনছি ওই পুকুর খোঁড়বার সময়ে কোদাল বসতেই চায় না। কোদাল পড়তেই শব্দ হয় ঠক্-ঠক্, ঠন্-ঠন্, কঙ্কালে আর লোহায় সে কি আড়াআড়ি। পদ্মাপারের যেসব মজুর পুকুর খুঁড়তে এসেছিল—ভয় পেয়ে তারা পালালো, বললো, না কর্তা, এ তো পুকুর খোঁড়া নয়, এযে গোরস্থান খোঁড়া! আমরা পারবো না।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে একটু দম নেয়, তারপরে গল্পের পূর্বসূত্র অনুসরণ করিয়া আবার বলে, দশানির লেঠেল তো পালালো। আমরা শুনলাম, রাত্রে ওরা এসে আমাদের বাড়ি লুট করবে। সে কি ভয় আমাদের! আমরা করলাম কি জানো, মেয়েছেলে সবাই মিলে, এখনই না-হয় বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে থাকতে বাড়িতে লোক ধরতো না, আমরা সবাই মিলে, সন্ধ্যাবেলা ওই তেতালায় গিয়ে চড়লাম। নবীনের বয়স তখন আড়াই, আমি নিজে তাকে কোলে নিলাম, এমন কি তোমার শাশুড়ির কোলেও দিলাম না; বললাম, না বউ, তুমি নিজেকে সামলাও তাহ'লেই হবে। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে তেতালায় গিয়ে চাপলাম।

তারপরে তেতালার ব্যাখ্যা করিয়া বলে, ওখানে এখন আর কেউ থাকে না, বড় ভূমিকম্পে ফাট ধ'রে গিয়েছে কিনা। তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলে, ফাট না ধরলেই বা কি, থাকবার লোক কোথায়। নবীন তো আর গাঁয়ে বসলো না, এতবড় পৈতৃক বাড়িঘর প'ড়ে রইলো, সে থাকলো কিনা কলকাতার পায়রাখুপি এক বাড়িতে।

বুঝলে বৌমা, আমরা তো গিয়ে বসলাম, নবীনকে শোয়ালাম আমার কাছেই। আমি লুকিয়ে পুকিয়ে ওর জন্যে বিছানা বালিস নিয়ে গিয়েছিলাম। অতটুকু কচিছেলে গিয়ে শুধু মাদুরের উপরে শুতে পারে? বাড়ি ভ'রে গেল আমাদের পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল আর প্রজাতে। ছাদের উপর রাশি-রাশি ইটপাটকেল, খেজুরের কাঁটা জড়ো করা হ'ল, তা ছাড়া বন্দুক তো ছিলই। আমরা সর্বদাই ভাবছি, এই আসে কি ওই আসে। একটু শব্দ হয়, আর সবাই ব'লে ওঠে, ওই এলো। এমনি ক'রে প্রহর গুনে গুনে রাত ফরসা

হয়ে এলো। ওরা আর এলো না। আর আসবেই বা কোন্ ভরসায়, সকাল বেলাতেই যে পাঁচজন খুন হয়েছে।

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে থামে। তারপরে টীকা করিয়া বলে, এইসব দিন আমরা পাড়ি দিয়েছি, তাই এখনকার হাঙ্গামাকে আর হাঙ্গামা ব'লেই মনে হয় না। কর্তাদের সাহস কি এখনকার বাবুদের আছে? নবীন তো এসব পছন্দই করে না, কীর্তিই বা কর্তাদের সাহস পাবে কোথায়? তা ছাড়া দিনকালও বদলে গিয়েছে বৌমা, তখন কর্তারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও গ্রাহ্য করতো না। দারোগারা তো সামনে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

গল্পের স্রোতের অগ্রগতির সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিত, সেই তমিস্রার পটে দিনের আলোয় যাহা মিথ্যা সেই বর্ধিতজ্যোতি নক্ষত্রগুলি একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকিত, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে অতীত যুগের কাহিনীর প্রেতচ্ছায়াকে সজীব অপেক্ষাও অধিক জীবিত মনে হইত—মুক্তামালা ভয়ে বিস্ময়ে সব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিয়া যাইত।

জগার মার কাহিনীস্রোত স্তিমিত হইয়া আসিলে মুক্তামালা অর্ধস্ফুটভাবে বলিত, জগার মা, তোমার কাছে অনেকবার রক্তদহের সঙ্গে গোলমালের কথা শুনেছি—কি হয়েছিল খুলে বলো না।

জগার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, সে কি আজকার কথা মা! আমার জন্মের আগেকার। এ সব শুনেছি বাবার মুখে, তিনি শুনেছিলেন কর্তার মুখে, কর্তা ছিলেন সেই দাঙ্গায় একজন প্রধান। সমস্ত যখন ভাবি মা, অবাক্ লাগে। এই তো সেদিন বাবাকে দেখলুম, লিচুগাছ তলায় ব'সে স্নানের আগে তেল মাখতেন—মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। আজ সেই লিচুগাছটা অবধি গিয়েছে কোথায়! যেন কত যুগ আগেকার ঘটনা। আজ আমার বয়স হ'ল আশী—এই তো সেদিন বাবা আমাকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে দুই হাতে ধ'রে ফেলতেন। ছুঁড়ে দেবার সময়ে আমার সে কি

ভয়, আবার হাতে ধরা প'ড়ে :সে কি খিলখিল হাসি। কখনো মনে হয় সে আজকার কথা, কখনো মনে হয় যেন আর এক যুগের, আর এক জন্মের, আর একজনের জীবনের কথা। বুঝাতে না পেরে অবাক হয়ে ব'সে ভাবি।···

···রক্তদহের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে মা? তবে শোনো। এই বলিয়া সে আরম্ভ করে—এই বংশে অনেককাল আগে দর্পনারায়ণ নামে এক জমিদার ছিলেন। ছেলেবেলাতেই তার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়েছিল—সংসারের কর্তা ছিলেন তার পিতামহ উদয়নারায়ণ। উদয়নারায়ণ রূপে ছিলেন সুপুরুষ, গুণে ছিলেন মহাপুরুষ; যেমন দীর্ঘ আকার, তেমনি উজ্জ্বল বর্ণ, যেন তিনি এ যুগের লোক নন, রামায়ণ-মহাভারতের আমলের বীরপুরুষ। দর্পনারায়ণ তাঁর আদরের নাতি। নাতির বয়স হ'লে তিনি তার বিবাহের জন্যে এক পাত্রী স্থির করলেন। পাত্রী রক্তদহের জমিদারের একমাত্র সন্তান ইন্দ্রাণী যেন নবপ্রজ্বলিত আগুনের শিখা দিয়ে তৈরী—কিংশুকের মতো কোমল, অথচ তেজস্বিনী। ·এমন সুন্দর, এমন তেজোময়ী মেয়ে মানুষের ঘরে ঘরে প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে না।

জগার মা একটু থামিয়া বলে, ইন্দ্রাণীকে দেখিনি, কেমন ক'রে আর দেখবো, সে যে অনেককাল আগের কথা, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, দেখতে অনেকটা তোমার মতো ছিল, তোমার মতোই শান্ত, আবার তোমার মতোই কঠিন। অন্ধকারের মধ্যে মুক্তামালার মুখ লাল হইয়া ওঠে, কেহ দেখিতে পায় না।

জগার মা আবার বলিয়া চলে—বিয়ের কথাবার্তা স্থির, এমন কি দিনক্ষণও একরকম ঠিক। এমন সময়ে স্বরূপ সর্দারের হ'ল মৃত্যু। স্বরূপ সর্দার ছিল বাড়ির সবচেয়ে পুরানো আর সবচেয়ে বড়ো লাঠিয়াল। তার কাছেই দর্পনারায়ণের লাঠিখেলায় হাতে খড়ি। মৃত্যুকালে স্বরূপ তার দাদাবাবুকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিল, তার অস্থি যেন গঙ্গায় দেওয়া হয়—আর দাদাবাবু কষ্ট ক'রে নিজে গিয়ে যেন দিয়ে আসে। স্বরূপের মনে মনে ভয় ছিল, আমলা-কর্মচারীর উপরে ভার দিলে তারা কি আর মুর্শিদাবাদ

অবধি যাবে, কোথায় কোন্ বিলে খালে ফেলে দিয়ে এসে বলবে—গঙ্গায় দিয়ে এলাম।

স্বরূপের অস্থি গঙ্গায় দেবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণ নৌকা সাজিয়ে রওনা হ'ল। স্থির হ'ল, ফিরে এলে রক্তদহের রক্তকমলের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। বুড়ো উদয়নারায়ণ ঠাট্টা ক'রে ভাবী নাতবৌকে 'রক্তদহের রক্তকমল' বলতেন।

জগার মা বলে, কিন্তু বৌমা, মানুষে যেমন ভাবে সব সময়ে ঠিক তেমনটি কি হয়? ওদিকে দর্পনারায়ণ স্বরূপের অস্থি গঙ্গায় দিয়ে যখন ফিরে আসবে তখন এক কাণ্ড ঘটলো। একদিন রাত্রিবেলা মাঠের মধ্যে একটি মেয়ের চীৎকার শুনতে পেয়ে সেদিকে দর্পনারায়ণ রওনা হ'ল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পেলো যে, একটি তাঁবু। সেই তাঁবুতে ঢুকে দেখলো এক মাতাল, পরে জানা গিয়েছিল পরন্তপ রায় তার নাম; সে-ও এক গ্রামের জমিদার, একটি মেয়ের উপর অত্যাচার করতে উদ্যত। দর্পনারায়ণ মাতালটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধা'র ক'রে নিয়ে নিজের নৌকায় ফিরে এলো। মেয়েটির নাম বনমালা। মেয়েটি ভদ্রবংশের, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের সমান কুলের, একই সমাজের লোক। দর্পনারায়ণ তাকে বিবাহ ক'রে ফিরলো। এই নিয়ে অনেক কাল তার বাদ-বিসম্বাদ চলেছিল বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নাতি ও নাতবৌকে ঘরে নিলেন। না নিয়েই বা পারবেন কেন? পিতৃমাতৃহীন একমাত্র নাতি, বংশের সেই তো একমাত্র ধারক। কিন্তু এই ঘটনার ফলে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ ভেঙে গেল। অবশ্য সেকালে দু'টো বিবাহে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বৌমা, ইন্দ্রাণী সতীনের ঘর করবার জন্য জন্মেনি। ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়ে দিলে যাকে বে-মানান হয় না, সতীনের পালঙ্কে সে কি বসতে পারে?

কিন্তু ওতেই বাধলো গোল। ইন্দ্রাণী এই অপমান ভুলতে পারলো না। তার প্রতিহিংসার আগুনে যে দাবানল জ্বললো—তাতে রক্তদহ ও জোড়াদীঘির অনেকখানি না পুড়ে নিভল না।

তারপরে বলে, কিন্তু আজ আর নয় মা, অনেক রাত হয়েছে। সময় পাই তো

আর-একদিন বাকিটুকু শেষ করবো। এবারে উঠি। তারপরে বলে, ও বাদলি, হাতটা ধ'রে টেনে তোল্ মা, অনেকক্ষণ ব'সে থেকে পা দুটো শক্ত হয়ে গিয়েছে। বাদলি হাত ধরিয়া তুলিয়া দিলে জগার মা নীচে নামিয়া যায়। এমন সময়ে নবীননারায়ণ উপরে আসে, বলে, কি, তোমার গল্প-শোনা শেষ হ'ল? লজ্জিত বাদলি হাসিয়া অন্ধকারে মুক্তামালার উদ্দেশে জিভ দেখাইয়া দুড় দুড় করিয়া প্রস্থান করে। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া যায়। কিন্তু মুক্তামালার ঘুম আসে না। স্বপ্নের সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা জাগরণের শুভ্র পটের উপরে ইন্দ্রাণী ও বনমালা অদৃষ্টের নিপুণ-হস্ত-নিক্ষিপ্ত মাকুদ্বয়ের মতো ছুটাছুটি করিয়া রক্তিম রেশমের সূত্রে কাহিনীর মায়াজাল বুনিয়া তুলিতে থাকে। মুক্তামালা ভাবে, কোথায় ছিল ইন্দ্রাণী, কোথায় ছিল বনমালা, কতকাল আগে কত বহুদূরে—আর আজকার দিনের মুক্তামালা, সেদিন যার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না—অদৃষ্ট-হস্ত সংসারসমুদ্রে কী এক আবর্ত রচনা করিল—অমনি দূরাপহৃত অচিন্তিতসংসর্গ তৃণখণ্ডের মতো ইন্দ্রাণী, বনমালা, মুক্তামালা আসিয়া সেই আবর্তচক্রে পাক খাইতে লাগিল। কি অসীম বিস্ময়, কি অভাবনীয় ভূমিকা। মুক্তামালার আর কিছুতেই ঘুম আসে না। কাহিনীর অশ্রুতদিগন্ত অভিমুখে তাহার মন ছুটিয়া যায়। সে স্থির করে—আগামী কালই জগার মার নিকট হইতে অবশিষ্টটুকু শুনিতে হইবে। সঙ্কল্পে শান্তি আসে, শান্তিতে নিদ্রা আসে, নিদ্রায় স্বপ্ন আসে। মুক্তামালার স্বপ্নের খবর আমরা কি রাখি? নিজের স্বপ্নের সংবাদই মানুষে রাখিতে পারে না—তাহাতে আবার অপরের!

তারাভরা আকাশের নীচে ছাদের উপরে বসিয়া জগার মা গল্প বলিয়া যায়, মুক্তামালা ও বাদলি অবাক্ হইয়া বসিয়া শোনে। জগার মা বলে—এদিকে পরন্তপ রায় প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলো, যেমন ক'রেই হোক অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। মুখের ব্যাঙ কেড়ে নেওয়া সাপের মতো সে দর্পনারায়ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। তখনকার দিনে রেলগাড়ি ছিল না, নৌকোয় যাতায়াত

করতে হ'ত। নৌকো ক'রে যেতে যেতে সে রক্তদহের ঘাটে এসে পৌছলো। সেখানে এসে হ'ল তার গুরুতর ব্যাধি। রক্তদহের জমিদারের বাড়িতে সে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। তারপরের সব ঘটনা মনে নেই মা, শুনেছিলাম অনেককাল আগে, এখন ভুলে গিয়েছি। ফল কথা, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরন্তপের বিয়ে হ'ল। এই বিয়ের কারণ কি জানো? ইন্দ্রাণী বুঝতে পেরেছিল পরন্তপ শক্তিশালী পুরুষ, তাকে আশ্রয় করলে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগ হবে। আবার পরন্তপ বুঝেছিল, ইন্দ্রাণীর টাকাকড়ি বিনা তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্ভব নয়। দু'জনেরই রাগ দর্পনারায়ণের উপরে। কিন্তু কেন যে রাগ, একজনের মনের কথা অপরে জানতে পারেনি।

জগার মা বলিয়া চলে আর মুক্তামালা প্রাচীনদিনের সেই নিশ্বাসরোধকরা কাহিনী শোনে।

তারপরে রক্তদহের সঙ্গে জোড়াদীঘির ঝগড়া-বিবাদ মারামারিতে পরিণত হ'ল। তখনকার কালে জজ ম্যাজিস্টর পুলিশ সাহেব ছিল না বললেই হয়। জোড়াদীঘির জমিদারেরা কয়েক ভাই এমন হাজার দু'হাজার লোক নিয়ে গিয়ে রক্তদহের বাড়ি আক্রমণ করলো। এমন চললো অনেক কাল ধ'রে। শেষে তারা বাড়ির ভিতর ঢুকে প'ড়ে পরন্তপ রায়কে বেঁধে নিয়ে চ'লে এলো জোড়াদীঘিতে। ওদিকে ইন্দ্রাণী সদরে খবর পাঠালো। ম্যাজিস্টর সাহেব সেপাই নিয়ে এসে জোড়াদীঘির বাড়িতে ঢুকলো। কিন্তু পরন্তপ রায়কে পেলো না। স্বামীর মঙ্গল কামনায় বনমালা তাকে লুকিয়ে আগেই মুক্তি দিয়েছিল। সাহেব পরন্তপকে পেলো না বটে, কিন্তু দর্পনারায়ণকে কিছুতেই ছাড়লো না। তাকে চালান দিলো। তার সাত বছরের মেয়াদ হ'ল। দর্পনারায়ণের সঙ্গে অন্য দুই শরিকের ভাইয়েরও কয়েদ হয়েছিল—তাদের কিন্তু দোষ ছিল না। তাই গাঁয়ে এখনো ছড়া প্রচলিত আছে—'বিনা দোষে মারা গেলো রঘু কৃষ্ণধন।' সেই হাঙ্গামায় জোড়াদীঘির জমিদারির অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী তার পরেও অনেককাল বেঁচে ছিল; শুনেছি তার এক মেয়ে হয়েছিল, সেই মেয়ের বিয়েতেও নাকি কি একটা ভারি গোলমাল হয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামে। গল্প থামিয়া গেলেও ছাদের বায়ুমণ্ডল কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাতের নিঃশব্দ বিদ্যুতে থমথম করিতে থাকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহ কথা বলিতে পারে না।

মুক্তামালা শুইতে যায়—কিন্তু ঘুম আসে না। গল্পে-শোনা বীরপুরুষেরা, দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ আর তাহাদের অস্ত্রধারী অনুচরগণ তাহার মনের মধ্যে সদর্পে পদচারণা করিয়া বেড়ায়। রামায়ণ-মহাভারতের বীরপুরুষগণের কথা সে জানে, দেশান্তরের বীরপুরুষগণের কাহিনীও সে পড়িয়াছে—কিন্তু দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র—ইহারা যে একেবারে তাহার ঘরের মানুষ। সেই বংশেরই বধূ বলিয়া হঠাৎ সে একপ্রকার গৌরব অনুভব করে—কিছুকাল পূর্বেও যাহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বিনিদ্র চোখ অকস্মাৎ দেখিতে পায়, ঠিক পাশেই নিদ্রিত নবীননারায়ণ। সে অবাক্ হইয়া দেখে, স্বামীকে যেন নূতন করিয়া দেখিতে পায়। মনে হয়, সে কেবল তাহার স্বামী নয়, এক প্রাচীন জমিদারবংশের রক্ত ও গৌরবময় কীর্তিধারার ধারক। যে ছিল তাহার একান্ত আপনার, মুহূর্তে সে আবহমান কালের ঐতিহ্যশৃঙ্খলের একতম গ্রন্থিতে পরিণত হইয়া এক অনাত্মন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বামীর প্রতি সুগভীর প্রেমের সহিত একপ্রকার অনির্বচনীয় গৌরবময় শ্লাঘার ভাব জড়িত হয়। সেই বিশ্বস্তনিদ্র সুঠাম সবল পুরুষ-দেহের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের পলক পড়িতে চায় না, চোখে জল ভরিয়া ওঠে। জলের বাধায় দৃষ্টি যখন আর চলে না, তখন সে নীরবে অতিশয় সন্তর্পণে নবীননারায়ণের ললাটে একটি চুম্বনের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়। দুই ফোঁটা চোখের জল প্রহরী-যুগলের মতো সেই চিহ্নটিকে পাহারা দিতে থাকে। তারপরে মুক্তামালা যখন ঘুমাইয়া পড়ে—আকাশের তারাগুলি তখনো ঘুমায় না।

আমরা যখন এই কাহিনীর সূত্রপাত করি, তখন ছিল কার্তিক মাস, শীতের প্রারম্ভ; তারপরে দীর্ঘ শীতকাল অতিক্রম করিয়া আমরা গ্রীষ্মের পুরোভাগ চৈত্র মাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

বাঙলার শীত তীব্র নয়, তাহাতে বসন্তের মৃদু মাধুর্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মিশ্রিত। বসন্ত যদি ঋতুপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ হয়, তবে শীতকালই বাঙলা দেশের বসন্ত ঋতু। এই সময়ে খেজুররসের স্নিগ্ধ মদিরতার সহিত দিগন্তপ্রসারী সর্ষে-ক্ষেতের পীতপ্রদীপ্ত পুষ্পরাশির মদবিহ্বল সৌগন্ধ্য জড়িত হইয়া রূপকথার রোমান্সের সৃষ্টি করে। আর তখন মদালসা মধ্যাহ্নলক্ষ্মী তন্দ্রাভরে আতপ্ত রৌদ্রটিতে আপন কনক-চিক্কণ দেহ এলাইয়া দিয়া রাত্রির বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নটিকে ধ্যান করিতে করিতে অন্যমনা। নির্জন বকুলশাখার ঘুঘুর করুণ কাকলি কোন্ নিস্তব্ধতার মধুচক্র-নিঃসৃত সুধাবিন্দুর মতো ক্ষরিত লইয়া তাহার স্বপ্নসন্ধানী নেত্রদ্বয়কে ক্রমে অধিকতর নিমীলিত করিয়া দিতে থাকে।

পৌষের শেষে বাদামের পাতাগুলি রক্তচন্দনের আভায় লাল হইয়া ওঠে, সুরক্তিম কুলগুলি নিবিড় পল্লবপ্রচ্ছায়ে বনানীর দুলের মতো প্রতিভাত, হলুদের ভুঁই পীতাভ পাতায় ভরিয়া যায়; সর্ষে-ক্ষেতে ফুল-ঝরিয়া-পড়া দানা-বাঁধা শস্য শীর্ষে দেখা দিতে থাকে, আর উত্তর-বায়ু নির্বিচারে বিভিন্ন তরু-শ্রেণীর পাতা ঝরাইয়া মরমর ঝরঝর করিয়া বহিয়া যায়। মাঠে গাভীর রব, রাখালের কণ্ঠ, অদূরবর্তী কাঠঠোকরার স্বর, নদীতে খেয়ানৌকার মৃদু আর্ত-নাদ বিশ্বব্যাপী নিস্তব্ধতার পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মৃদুতর হইয়া অপার্থিব সুরসঙ্গতিরূপে কানে আসিয়া পৌঁছায়।

তাহার পরে আসে নূতন কিশলয়ের কাল। প্রথমে পূর্বমুখী আমের শাখা-গুলিতে মুকুল জাগে, কাঁঠালের পল্লবে ঘন চিক্কণতা দেখা দেয়, লিচুর গাছে স্বচ্ছ সবুজ আভা ফুটিয়া ওঠে, ক্রমে আর এগাছে ওগাছে ভেদাভেদ করা যায় না—সকলে একযোগে একসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পত্রদীপালি-

রচনায় মন দেয়—উদ্ভিদ্‌-রাজ্যে সে এক মহা আড়ম্বর। বৈশাখের প্রারম্ভে বাঙলার উদ্ভিদ্‌-জগৎ রসানে মার্জিত দীপ্তোজ্জ্বল ঘন-মসৃণ পল্লব-জালে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নিমের ফুলের লঘু সুগন্ধ আর লেবুফুলের মদির সুগন্ধ, কার্পাস-সূত্র আর রেশম-সূত্রের স্থূল-সূক্ষ্ম টানা-পোড়েনে সমাপ্তপ্রসাধন বনলক্ষ্মীর ওড়নাখানি বুনিয়া শেষ করিতে অতিশয় প্রযত্ন করে। কৃষ্ণচূড়ার সীমন্তরাগের প্রান্তে সেই ওড়নাখানি আল্‌গোছে বিন্যস্ত করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বনলক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া ওঠেন।

জোড়াদীঘির উদ্ভিজ্জ-জগতের উপকূল নূতন ঐশ্বর্যের জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ, কেবল ভূপতিত বৃদ্ধ অশ্বত্থের স্থানে শূন্য আকাশটা সুবৃহৎ একটা গুহামুখের মতো রিক্ত, ভয়াল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সঙ্কেতে থম্‌থমে। লোকে সেদিকে মুখ তুলিয়াই ভয়ে চোখ নামাইয়া নেয়, পারিতে সেদিকে কেহ তাকায় না, সে পথটাই এখন পরিত্যক্তপ্রায়। সমস্ত গ্রামসত্তার মধ্যে ওই একটা সুগভীর ক্ষতস্থান, স্বভাবের নিয়মে ভরিয়া উঠিবার কোনো লক্ষণ এখনো প্রকাশ পায় নাই। ভবিষ্যতের ব্যাদিত বদনের মতো ওই ক্রূরগর্ভ শূন্যটা গ্রামের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকে।

১

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ইতিহাস রূপান্তরে মানুষেরই ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস কি বলিয়া দেয় না যে, মানুষ ক্রমে বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে? বহির্বিশ্ব হইতে ধীরে ধীরে সম্ভবত নিজের আগোচরে সে অন্তর্বিশ্বাভিমুখী হইয়া উঠিতেছে? স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মানুষের ইতিহাসের গতির লক্ষ্য।

সত্যযুগে স্বর্গে-মর্ত্যে লড়াই চলিয়াছিল। ত্রেতাযুগের লড়াই-এর ক্ষেত্র-মর্ত্যে স্বর্গে-মর্ত্যে নয় এবং যুযুধান পক্ষদ্বয়—মানুষ ও রাক্ষস, সত্যযুগের মতো দেব-দানব নহে। দ্বাপরের লড়াই যে কেবল মানুষে-মানুষে মাত্র তাহাই নয়, সে লড়াই ভাইয়ে-ভাইয়ে, কুরু-পাণ্ডবে, একই রক্তধারাবাহী দুই পক্ষের মধ্যে। কলিকালে এই প্রক্রিয়া আরো ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। এবার লড়াই মানুষের নিজের সঙ্গে, নিজের মধ্যে, সে একাই যুযুধান পক্ষদ্বয়—সে একাই দেব-দানব, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডব; তাহার হৃদয় হইতেছে স্বর্গ-মর্ত্য, লঙ্কাদ্বীপ এবং কুরুক্ষেত্র। বস্তুগত মানুষ ব্যক্তিগত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ধারা পূর্বোক্তের অনুরূপ। এই বংশের সত্যযুগের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তখন লড়াই ছিল আধি-দৈবিকের সহিত। জোড়াদীঘির চৌধুরীদের আদিপুরুষগণ বন কাটিয়া, শ্বাপদ তাড়াইয়া, বিলখাল বুজাইয়া দিয়া নদীর গতি ঘুরাইয়া দিয়া গ্রাম পত্তন করিয়াছিল; সেটা ছিল যেন স্বর্গে-মর্ত্যে লড়াইয়ের অনুরূপ। তারপরে ত্রেতার আবির্ভাব তাহাদের বংশের ইতিহাসে। পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের সহিত বাধিল

তাহাদের সংঘর্ষ। বর্তমান কাহিনীতে আমরা জোড়াদীঘির দ্বাপরযুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবারে ভাইয়ে ভাইয়ে, শরিকে শরিকে লড়াইয়ের পালা। কিন্তু এই ব্যক্তিমুখী গতির এখানেই সমাপ্তি নয়। সম্মুখে আছে ইহাদের কলিকাল—তখন জোড়াদীঘির জমিদারগণ আর বহির্বিশ্বগত কাহারো সহিত লড়াই করিতে সজ্জিত হইবে না। একাকী নির্জনে বসিয়া নিজের সহিত আত্মদ্বন্দ্ব করিতে থাকিবে।

এই আত্মদ্বন্দ্বের অপর নাম আত্মচিন্তা। রাজসিক স্তরে যাহা আত্মদ্বন্দ্ব, সাত্বিক স্তরে তাহাই আত্মচিন্তা ; তামসিক স্তরে মানুষ দ্বন্দ্বও করে না, চিন্তাও করে না, কারণ তমসার আবরণে তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেই পারে নাই, মানুষ তখন জড়বস্তুর সামিল। তবে আত্মদ্বন্দ্বে ও আত্মচিন্তায় প্রধান প্রভেদ এই যে, দ্বন্দ্বের মূলে আছে আত্মেতর কোনো বস্তু, চিন্তার মূলে স্বয়ং আত্মা। বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত লক্ষ্যে যাত্রাপথে আত্মচিন্তা চরমতর রূপ। কিন্তু চরমতর না হইতেও পারে। এমন অবস্থা কল্পনাতীত নয় যখন আত্মা অবিভাজ্য হইয়া পড়ে, তখন দ্বন্দ্ব বা চিন্তার প্রয়োজনাভাব। সেই অবস্থা তামসিক অবস্থার ঠিক বিপরীত। তামসিক অবস্থা যদি মানবজীবনের সুমেরু হয়, এই অবস্থা মানবজীবনের কুমেরু। কিন্তু এ অবস্থার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই—এ অবস্থা যোগের অন্তর্গত, শিল্পের অন্তর্গত নয়। যোগী ও শিল্পী পৃথক জগতের লোক। শিল্পী জাগতিক, যোগী অতিজাগতিক। জগৎ লইয়া আমাদের কারবার—যোগাভিজ্ঞতায় আমাদের আবশ্যক কি? আর আবশ্যক থাকিলেই বা জানিবার উপায় কই? যোগানুভূতি প্রকাশের অতীত। যদি কখনো কোথাও তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—বুঝিতে হইবে তাহা তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুত। যাহা স্বভাবত প্রকাশ্য নহে, শিল্পীর তাহাতে প্রয়োজন কোথায়? কারণ প্রকাশই শিল্পের কার্য—অথবা প্রকাশই শিল্প।

ফল কথা, বর্তমান গ্রন্থ জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস। বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত পথের উপান্তপর্ব, যাহার অন্তপর্ব হইতেছে আত্মদ্বন্দ্বের ইতিহাস।

২

চৌধুরীদের বিশাল বাড়ির প্রাচীনতম অংশে একটি বেলগাছ আছে। বেলগাছটি সকল শরিকের এজমালি। কালক্রমে বাড়িঘর, খামার-জমিদারি সমস্তই ভাগ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বেলগাছটি ও তৎসংলগ্ন জমি ভাগ করিবার কথা কাহারো মনে ওঠে নাই; চৌধুরীদের আদিম একতার চিহ্নস্বরূপ বেলগাছটি এখনো এজমালি রহিয়া গিয়াছে।

জোড়াদীঘি গ্রামে পূর্বোক্ত অশ্বত্থ ও এই বেলগাছটি লোকচক্ষে দেব-পদবীতে অধিষ্ঠিত। দু'টিকেই লোকে ভক্তি করে, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, অশ্বত্থ গাছ গ্রামের সাধারণের সম্পত্তি, আর বেলগাছটি জমিদারগণের সম্পূর্ণ নিজস্ব। নিছক প্রাচীনতার বিচারে বেলগাছটিই অধিকতর বনিয়াদি—কিন্তু অশ্বত্থ গাছ জোড়াদীঘি ও আশেপাশের বহু গ্রামের ভক্তির ফলে লোকচক্ষে যে পদবী লাভ করিয়াছিল, বেলগাছটির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহা চৌধুরীদের একান্তভাবে আপনার, জনশ্রুতিবলে ইহার সহিত চৌধুরীবংশের প্রাচীনতম স্মৃতি ও পরবর্তী উন্নতি জড়িত।

গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে এখনো শুনিতে পাওয়া যায়—এই বেলগাছের ইতিহাস; কিম্বদন্তীর ধারা তাহাদের স্মৃতির কমণ্ডলুতে সঞ্চিত হইয়া আছে। একদিন, বহুকাল আগে, চৌধুরীদের আদিপুরুষ পিঁপড়িয়া ওঝা এই গ্রামটি অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। গ্রাম তো ভারি, এ জোড়াদীঘি সে জোড়াদীঘি নয়। তখন থাকিবার মধ্যে ছিল ঘর-কয় বেনে আর জোলা, আর নদীর ধারে ঘর-দুই বৈদিক ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ তখন ছিল গোচর মাঠ, বেনা বন আর আগাছা। নদীটা অবশ্য ছিল—কিন্তু বর্তমান খাতে নয়; এখন যেখানে বিল সেখানে ছিল নদী, নদীর পুরাতন খাত বিলে পরিণত হইয়াছে। অনেক-কাল আগে—লোকে বলে পাঁচশ' বছর, হাজার বছর, লোকের স্মৃতিতে দুই-ই সমান—পিঁপড়িয়া ওঝা এই গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছিল। চৈত্র মাসের দুপুরবেলা, প্রচণ্ড রোদ,

ওঝার বিষম তৃষ্ণা পাইল। কিন্তু জল কোথায়? নদী দূরে, নিকটে জলাশয় নাই, বেনে বা জোলার জলগ্রহণ ঠাকুর করে না, কি কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুর চলিতেই লাগিল। মাথার উপরে গামছা, ঘামে ভেজা, সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘাম পড়িতেছে। ওঝা ভাবিল আর বোধ হয় চলিতে পারিবে না, পথের মাঝেই মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। এমন সময়ে এই বেলগাছটির তলায় ওঝা আসিয়া পড়িল। ভাবিল, জল না মিলুক, একটু ছায়া তো মিলিবে। ঠাকুর বসিয়া পড়িয়া গামছা দিয়া নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে পদশব্দে পিছনে চাহিয়া দেখিল, একি! লাল-পেড়ে শাড়িপরা লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো একটি মেয়ে, এক হাতে তাহার কাঁসার ঘটিতে জল, এমন স্বচ্ছ আর শীতল যে দেখিলেই তৃষ্ণানিবারণ হয়, অপর হাতে আধখানা বেল। ওঝা কি করিবে, কি শুধাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে মেয়েটি জল দিয়া মাটি নিকাইয়া ঘটি ও বেল আধখানা সেখানে রাখিল, বলিল—ঠাকুর, বেলটুকু খেয়ে জল পান করো, তোমার নিশ্চয় খুব পিপাসা পেয়েছে।

ওঝার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এ মেয়ে কি অন্তর্যামী, নতুবা তাহার কষ্ট বুঝিল কিরূপে? আর এই জনপদচিহ্নহীন জনশূন্য মাঠের মধ্যে মেয়েটি আসিলই বা কোথা হইতে? এ মেয়ে কাহার ঝিয়ারী, কোথায় ইহার বাড়ি, নানা চিন্তা তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

বিস্ময় একটু কাটিলে ওঝা শুধাইল, মা, তুমি থাকো কোথায়? তোমার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি বলিল—এখানেই আমার বাড়ি, এই বেলতলাতেই আমি থাকি।

তারপরে থামিয়া বলিল—নাও, ঠাকুর, খেয়ে তৃষ্ণা দূর করো। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল। ওঝা বলিল—সে কি মা, তুমি চল্‌লে? ঘটিটা নিয়ে যাও।

মেয়েটি বলিল—আমি এখনই আসছি, আমি না আসা অবধি তুমি এখানে থেকো। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ঠাকুর বেলটুকু খাইল। বেল যে এমন মিষ্ট হইতে পারে, এমন সুস্বাদু হইতে পারে, সে জানিত না, যেন অমৃত। তারপরে জল পান করিল। আহা, সে কি স্বাদ—শীতল, শ্রান্তিহরা। ফলে তাহার ক্ষুধা, জলে তাহার তৃষ্ণা দূর হইল। ঠাকুর ভাবিল, এমন মিষ্ট জল আর ফল যে গ্রামের, সে গ্রামের কেন এমন লক্ষ্মীছাড়ার দশা? এই রকম দশ কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঠাকুর তাহা জানিতেও পারিল না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঠাকুর স্বপ্ন দেখিল—সেই বেলগাছ-তলায় মহাসমারোহে ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি বাজাইয়া, ধূপধূনা পুড়াইয়া দুর্গোৎসব পূজা আরম্ভ হইয়াছে। বেলগাছের ঠিক নীচে যথোপচার সুসজ্জিত দুর্গাপ্রতিমা। কিন্তু একি, প্রতিমার আর সব মূর্তিই রহিয়াছে, কেবল দুর্গামূর্তিটির অভাব। ওঝা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কেমন ধারা। এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল, সেই মেয়েটি এদিকে আসিতেছে। ওঝা তাহাকে ডাকিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, মেয়েটি সোজা প্রতিমার নিকটে উপস্থিত হইল, আর সেই দুর্গাপ্রতিমার শূন্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইল, এক পা অসুরের কাঁধে, এক পা সিংহের পিঠে। অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, সানাই বাজিয়া উঠিল, জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, ধূপধূনার সুগন্ধে বেলতলা আমোদিত হইয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া ঠাকুর লাফাইয়া উঠিল—তাহার সর্বশরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত। একি দেখিলাম, কে আমাকে ছলনা করিয়া পলাইল! ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে থাকিল। ওঝা বুঝিতে পারিল, এ বৃক্ষ যে-সে বৃক্ষ নয়; ওঝা বুঝিতে পারিল, এ গ্রাম যে-সে গ্রাম নয়; ওঝা বুঝিতে পারিল, তাহার ভবিষ্যৎ সুমহৎ। ওঝা স্থির করিল, এই বেলতলা ছাড়িয়া সে যাইবে না, দেবী-নারী ফিরিয়া না আসা অবধি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল।

পিঁপড়িয়া ওঝা সেই বেলতলাতে একখানি কুটীর তুলিল। সেই কুটীরেই কালক্রমে তাহার জীবনান্ত হইল। আবার কালক্রমে সেই আদিম পাতার-কুটীর ত্রিশ-চল্লিশ বিঘাব্যাপী চৌধুরীগণের বাড়িঘর, বাগান-জলাশয়ে পরিণত

হইয়াছে। সেই দেবী-নারীর প্রসাদে পিঁপড়িয়া ওঝার পরবর্তী পুরুষ আজ জোড়াদীঘির প্রবল জমিদার-বংশ। তাহাদের ইতিহাস সর্বজনবিদিত—যাহা অধিকাংশের অগোচর মাত্র, তাহাই বলিলাম।

সেই বেলগাছটিকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে অট্টালিকার পরে অট্টালিকা উঠিয়াছে; মন্দির-মণ্ডপ, তোষাখানা, কাছারিবাড়ি, অতিথিশালা, বৈঠকখানা, পিলখানা, আস্তাবল, গোয়াল, গোলাবাড়ি, বাড়িতে বাড়িতে গ্রামের সিকি অংশ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। তারপরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ও জমিদারি ভাগ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে দুই ভাগ হইল - দশানি, ছ'আনি; কালক্রমে দশানি ও ছ'আনিতেও ভাগ হইয়াছে। কিন্তু সেই বেলতলা ও তৎসংলগ্ন আদিম জমিটুক ভাগ করিবার কথা কেহ কোনকালে ভাবে নাই, তাহা যে সম্ভব তাহাও বোধ করি চৌধুরীগণের কল্পনাতীত। এখন পর্যন্ত অবিভাজ্য আদিস্মৃতির চিহ্নস্বরূপ চৌধুরীদের দুর্গাপূজা এই বেলতলাতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই সত্য, তবু স্বপ্নবৎ। সত্য পুরাতন হইলে স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

৩

একদিন সকালে কীর্তিনারায়ণ জহিরুল্লা সেখকে ডাকিয়া পাঠাইল। জহিরুল্লা সেখ গ্রামের একমাত্র রাজমিস্ত্রি।

কীর্তিনারায়ণের পিতা দীপ্তিনারায়ণের নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িঘর মন্দির ইমারত গড়িবার সখ ছিল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে পারে এমন একজন রাজমিস্ত্রির সন্ধান করিতে করিতে নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে তিনি জহিরুল্লা সেখকে আবিষ্কার করিলেন। একটা মাস-মাহিনা স্থির করিয়া তাহাকে জোড়াদীঘিতে আনিলেন। এইবার স্বকীয় পরিকল্পনা অনুসারে নূতন মন্দির গড়িবার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। দীপ্তিনারায়ণ একখানি নক্সা দিয়া জহিরুল্লাকে মন্দির গাঁথিতে হুকুম করিলেন। জহিরুল্লা বাঁধা মাহিনার উল্লাসে মহাউৎসাহে কাজে লাগিয়া

গেল। দীপ্তিনারায়ণ প্রকাণ্ড একটা মোড়া লইয়া নিকটে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে তাহার কাজ দেখিতেন। সকালবেলা যেটুকু গাঁথা হইল, বিকালবেলা সেটুকু ভাঙিয়া ফেলিবার হুকুম হইত, তারপরে চলিত আবার নতুনভাবে গাঁথা। বিকালবেলা দিবানিদ্রা শেষ করিয়া গোটাকয়েক পান মুখে দিয়া দীপ্তিনারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইতেন, স্থির দৃষ্টিতে সবটা দেখিতেন, তারপরে বিপরীত দিক হইতে দেখিতেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতেন, মোড়াতে বসিয়া দেখিতেন, যত রকম সম্ভব অসম্ভব কোণ হইতে দেখিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলিতেন —উঁহু, হ'ল না। জহিরুল্লা নিকটে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত, কর্তা বলিতেন—উঁহু, হ'ল না, মিস্ত্রি, হ'ল না। দেয়ালটা পলতোলা হ'ল না তো, ভেঙে ফেলো।

মিস্ত্রি দিনের কাজটুকু সন্ধ্যাবেলা ভাঙিয়া ফেলিত। পরদিন আবার তাহা নূতন করিয়া গড়িবার পালা। জোয়ারের জল যতই বাড়ুক একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইতে পারে না, ভাটার টানে আবার নামিয়া আসে, তেমনি মন্দিরের উচ্চতা এক মানুষের অধিক হইতেই পারিল না, কর্তার অসন্তোষের আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিতে হইত। যে মন্দির তিন মাসে গড়া যায়, জহিরের গাঁথুনি ও কর্তার ভাঙুনিতে টানাটানি চলিতে চলিতে অবশেষে তাহা দেড় বৎসর পরে সমাপ্ত হইল। সেদিন কর্তার মুখে হাসি ফুটিল—তিনি খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ, এইবারে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি গাত্র হইতে শালখানা লইয়া জহিরকে বক্‌শিস করিলেন। গাঁয়ের লোক কর্তার ও জহিরের যুগ্ম-কীর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক্ হইবার কথা। কেননা, যে বস্তুটি এত অধ্যবসায়ের পরে গড়িয়া উঠিল তাহা মন্দির, মজজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ, জেলখানা ও নাটমন্দিরের একটা মিশ্র সংস্করণ। বহু উপজাতি ও বহু স্বার্থে বিভক্ত ও ব্যতিব্যস্ত ভারতলক্ষ্মী কোনো একটিমাত্র ইমারতকে যদি আশ্রয় করিতে পারেন, তবে তাহা এই নবগঠিত কীর্তিস্তম্ভ, হিন্দু জমিদারের পরিকল্পনা ও মুসলমান কারিগরের পরিশ্রমে প্রস্তুত।

এদিকে দেড় বৎসর পরে জহিরুল্লা সেখ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, তাহার

কাঁচা মাটির বাড়ি ঝড়ে-জলে ভাঙিয়া গিয়াছে, ক্ষেত-খামার বে-দখল আর বাগানের গাছপালা প্রতিবেশী ও তাহাদের গোরুতে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। সে জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসিয়া দীপ্তিনারায়ণকে নিজের দুর্দশা জানাইল। দীপ্তিনারায়ণ বলিলেন—তবে এখানেই ঘরবাড়ি বেঁধে বাস করো—গাঁয়ে গিয়ে আর কাজ কি। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সেই হইতে জহিরুল্লা সেখ জোড়াদীঘির অধিবাসী। তারপরে অনেককাল গিয়াছে। দীপ্তিনারায়ণ গত, জহিরুল্লা সেখ বৃদ্ধ, কিন্তু এখনো সে গ্রামের একমাত্র রাজমিস্ত্রি। এ পর্যন্ত তাহার দোসর জোটে নাই—বোধ করি তাহার জুড়ি মেলা সম্ভবপর নহে বলিয়াই।

কীর্তিনারায়ণের আহ্বানে জহিরুল্লা সেখ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কীর্তিনারায়ণ বলিল—মিস্ত্রি, ব'সো, একটু কাজ আছে।

জহিরল্লা বৃদ্ধ, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। জাপানী ছবির মানুষের মুখমণ্ডলে গোটাকয়েক পাকা দাড়ি বসাইয়া দিলে যেমন দেখিতে হয়—মুখখানা তাহার তেমনি। না হাসিলেও কেমন যেন একটা হাসির ভাব তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। পরনে তবন, বাম হাতে কর্নি, কাঁধের উপরে একখানা গামছা।

কর্তার কথায় তাহার মুখের হাসির ভাবটা আর একটু প্রকট হইল। কর্তাদের কাজ বলিতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান অত্যন্ত পাকা। সে সকলকে বলিত—আজকাল কাজকর্ম একরকম ভুলেই গেলাম—হাঁ, কাজকর্ম ছিল বটে কর্তাদের আমলে। বাবুদের কি আর সে সাধ্য আছে। নতুন গড়বার ফরমাস নেই—কেবল পলাস্তারা লাগানো। তারপরে হাসিয়া আত্মধিক্কার দিয়া বলিত, আগে ছিলাম রাজমিস্ত্রি, রাজার হুকুমে রাজবাড়ি তৈরি করতাম—এখন হয়েছি পলাস্তারা মিস্ত্রি।

জহিরুল্লার বর্তমান কাজকর্মের অধিকাংশই বে-আইনী। এক শরিকের হুকুমে অন্য শরিকের জমিতে গিয়া রাতারাতি পিল্পে তৈরি কিংবা অপর শরিকের সীমানায় প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলা—ইহার বেশি, ইহা ছাড়া কাজ তাহার

প্রায়ই জুটিত না। দুই পক্ষের প্রজায় প্রজায় যখন দাঙ্গা বাধিত, কতজন হতাহত হইয়াছে, কিন্তু জহিরের গায়ে কেহ হাত দিত না, বা তাহার অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি কেহ করিত না। কারণ সবাই জানিত, সে দুই পক্ষেরই একমাত্র ভরসা। সে-ও ব্যবসায়ীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া উভয়পক্ষের কাজ করিয়া দিত। দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইলে পক্ষগণ পরস্পরকে বধ করে—কিন্তু জল্লাদের গায়ে কেহ হাত তোলে না, কারণ তাহার ছুরির তলায় যাহার মুণ্ডই স্থাপিত হোক না কেন, বিনা দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলাই তাহার ব্যবসায়। রাষ্ট্রবিপ্লবে জল্লাদই প্রকৃত শাসনকর্তা—মতামতের বালাই তাহার নাই। জোড়াদীঘিতে জহিরুল্লার সেইরকম একটা কর্তৃত্বের ভাব ছিল, গোপনে গোপনে এজন্য সে একপ্রকার সূক্ষ্ম অব্যক্ত গৌরব অনুভব করিত। কীর্তিনারায়ণের ভাবগতিকে সে বুঝিতে পারিল—বে-আইনী কোনো আদেশ পালনের জন্যই তাহার ডাক পড়িয়াছে। কর্তার আদেশের অপেক্ষায় সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কীর্তিনারায়ণ তাকিয়ায় ভর করিয়া বিস্তৃত ফরাসের উপর গড়াইতে গড়াইতে শুধাইল, মিস্ত্রি, তোমার নাতির খবর কি?

জহিরুল্লা বলিল—বাবু, দুঃখের কথা আর কি বলবো। পাঁচজনের কথায় নাতিটাকে দিলাম ইস্কুলে—ভাবলাম একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু এখন আর সে জাতব্যাবসা করতে চায় না।

কীর্তি একসঙ্গে গোটাকয়েক পান মুখে ভরিয়া দিয়া বলিল—ওই জন্যেই আমি ইস্কুলের পক্ষপাতী নই। তারপরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আরে বাপু, এ আমাদের চাষার গ্রাম, এখানে ইস্কুলের দরকার কি? চাষবাস করতে কি ইংরেজি পড়ার দরকার করে?

জহিরুল্লা বলিল—বাবু, আপনার কথাই ঠিক, ছোট নাতিটাকে আর ইস্কুলে দিচ্ছি না।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—না, না, অমন কাজও করো না। তারপর সে পাখাবর্দারকে বলিল—এখন আর বাতাসের দরকার নেই, তুমি যাও।

লোকটা স্থান পরিত্যাগ করিলে কীর্তি বলিল—মিস্ত্রি, একটা কাজের জন্য তোমাকে ডেকেছিলাম।

এই বলিয়া গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া মৃদুতর স্বরে বলিল—ওই বেলতলাটা আছে না—ওর দু'দিকে দু'টো দরজা, ছ'আনির দিকে একটা, আমাদের দিকে একটা। তুমি তো সবই জানো, তোমাকে আর বলবো কি। এক কাজ করতে হবে। ওর ছ'আনির দিকের দরজাটা ভিতর থেকে পাঁচিল তুলে গেঁথে দিতে হবে, যাতে ওরা খুলতে না পারে।

এইটুকু বলিতেই সে যেন হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল ; তারপরে বলিল—কাজটা করতে হবে রাতারাতি, ওরা যাতে জানতে না পারে।······আচ্ছা এখন তুমি যাও, আমি ঠিক সময়ে জানাবো।

জহিরুল্লা সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

এমন যে দুর্ধর্ষ কীর্তিনারায়ণ,জোড়া-খুনে যাহার বুক কাঁপে না,এই সামান্য কথা কয়টি বলিতেই সে যে হাঁফাইয়া পড়িল, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, কাজটা কত কঠিন। যাহার আর কোনো ভয় নাই, সংস্কারকে সে-ও ভয় করে। সেইজন্য অশথতলা দখল করিবার লোভ বহুকাল সে সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। বেলতলা দখল করিতেও সে উদ্যত হইত না, এতকাল তো হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি শরিকানি ঘাত প্রতিঘাতে তাহার রোখ চড়িয়া গিয়াছে। অনেক কাজ আছে, কাজটির অপেক্ষা যাহার চিন্তাই অধিকতর বেদনাদায়ক। বেলতলা দখলের চিন্তা সেই শ্রেণীর। এখন দখল তো করিবে জহিরুল্লা সেখ—সেটা তত কঠিন নয়, আর কঠিন হইলেই বা কি—কীর্তিনারায়ণ তো আর অগ্রসর হইয়া যাইতেছে না। কাজেই সবচেয়ে কঠিন অংশটা সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া সে অভূতপূর্ব আরাম অনুভব করিতে লাগিল—সেই আরামের সহিত খানিকটা আত্মশ্লাঘার ভাব যে জড়িত না ছিল, এমন নয়।

ওদিকে জহিরুল্লা সেখ বাড়ি যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল—এমন অদ্ভুত প্রস্তাব জীবনে কখনো সে শোনে নাই। বাবুদের হুকুমে অনেকপ্রকার দুঃসাহসিক কাজ সে করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বে-আইনী। সে সবের

তুলনায় বেলতলার ছ'আনির দরজা পাঁচিল তুলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ছেলেখেলা—কিন্তু এযে দেবস্থান !

বাবুদের ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত তাহার মানসিক যোগ নাই বটে, কিন্তু জায়গাটার সহিত যে প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত, তাহার সব কথাই সে জানে—তাই মনের মধ্যে কেবলি খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। কিন্তু না করিয়া উপায় নাই। অতীতের বহু কুকর্মের দলিল তাহার বিরুদ্ধে এতই ভারী যে, আজ হঠাৎ 'না' বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, ভাবিবে অপর পক্ষ হইতে সে মোটা হাতে ঘুষ খাইয়াছে। তাহা ছাড়া, তাহার বাড়িঘর জমিজমা সবই দশানির মাটিতে—সেটাও একটা অকাট্য যুক্তি। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

৪

মুক্তামালা সকালবেলা একঝুড়ি তরিতরকারি লইয়া বসিত। এখানে আসিয়া ওই তরকারি কোটা তাহার এক অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। প্রয়োজনের জন্য তরকারি কুটিবার আবশ্যক ছিল না, লোক ছিল, কিন্তু হাতের অতিরিক্ত সময় কাটাইবার পক্ষে কাজটা মন্দ নহে। পাশেই বাদলি একখানা ছোট বঁটি লইয়া বসিত। রাশীকৃত তরি-তরকারি কোটা হইলে জগার মা আসিয়া উপস্থিত হইত, বলিত, বৌমা, এ কি কাণ্ড, তোমার বাড়িতে কি নিত্য নেমন্তন্ন, এত তরকারি খাবে কে ?

বাদলি বলিত, তোমাদের গাঁয়ে আবার খাওয়ার লোকের অভাব ? কই, কোনদিন তো প'ড়ে থাক্‌তে দেখলাম না।

মুক্তামালা হাসিত। বাস্তবিক তাই, কোনদিন তরকারি নষ্ট হইত না। পাড়ার ঝি-বউরা নিজ নিজ থালা-বাসন লইয়া আসিত, তরকারি ও তাহার অনিবার্য উপকরণ হিসাবে অন্ন সকলে লইয়া যাইত। সেই যে বাদলি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল—বৌঠাকরুন, ওরা তোমার বাড়িতে না খেলে কোথায় খাবে—এটা তাহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন অভ্যস্ত ধরনের কথোপকথন শেষ হইয়া গেলে জগার মা বলিল—বৌমা, বুড়ো হয়েছি, কোন্ দিন বা ম'রে যাই। আর এতদিনে ম'রেই যেতাম, কেবল তোমার মুখখানা দেখবার জন্যেই বুঝি বেঁচে ছিলাম।

তারপরে একটু থামিয়া আবার বলিল—চলো, একদিন তোমাকে বাড়ির সব মহলগুলো ঘুরে দেখিয়ে দিই। এত বড় বাড়ির কতটুকুই বা দেখেছ? তোমার শাশুড়ি বল্‌তেন, নবু তো আর আমি বেঁচে থাক্‌তে বিয়ে করলে না, তা হ'লে বৌকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম। এর পরে বৌ এসে একলা ছেলেমানুষ এত বড় বাড়ির ভার কি ক'রে নেবে এই ছিল তার ভয়।

তারপরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, বৌ যদি বা এলো—সে থেকে গেল কল্‌কাতায়। বাড়িতে এখন ঝি-চাকর আর চামচিকে-বাদুড়ের আড্ডা হয়েছে।

মুক্তামালা বাড়ির সব মহল দেখিবার আগ্রহে বলিল—আজই চলো না জগার মা—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে! কতটুকুই বা দেখলাম। দু'চারটে ছাড়া সব ঘরগুলোই তো বন্ধ।

জগার মা বলিল—সেই ভালো মা, আজ দুপুরবেলা সব দেখিয়ে দিই। তখন যার জিনিস তার হাতে দিয়ে আমার ছুটি। তারপরে কতকটা যেন নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—আর আমি হয়েছি যেন যক্ষিবুড়ি—সমস্ত পুরীটা আগলে ব'সে রয়েছি। কিন্তু আর কতকালই বা। এই বলিয়া সে নিজের কপালে একবার হাত ঠেকাইল।

বাস্তবিক এতবড় বাড়ির অতি সামান্য অংশই মুক্তামালা দেখিয়াছিল। চৌধুরীদের সকল শরিকের বাড়ি পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমি অধিকার করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে বিরাজমান। কবে কতকাল আগে আদিপুরুষ পিঁপড়িয়া ওঝার সেই বেলগাছতলার মৃৎকুটীর প্রথম ইষ্টকালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে বাড়ির প্রাচীনতম অংশগুলি হইতে

আধুনিকতম অংশগুলি দেখিলে অন্তত তিন-চারটা শতাব্দীর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনতম অংশ এখন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অযোগ্য, জীর্ণ ইষ্টকস্তূপ মাত্র। তাহার উপরে অশ্বত্থে, বেলে, বটে, পাইকড়ে অরণ্যের ভূমিকা। সেখানে ঢোলকলমি আর বুনো ফুল ফোটে। গাছের শিকড় আর দেয়ালের ইঁট পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন শক্ত গাঁথুনির সৃষ্টি করিয়াছে যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পেও আর তাহাকে টলাইতে পারে না। সেই ভাদ্রের বড় ভূমিকম্পে চৌধুরীদের বাড়ির গোটা একটা নূতন মহল ধ্বসিয়া পড়িল, গাঁয়ের কোঠাবাড়ি বড় একটা খাড়া ছিল না,—কিন্তু এই প্রাচীন অংশের জীর্ণ স্তূপের একখানা ইঁটও খসিল না। লোকে অবাক্ হইয়া বলাবলি করিল—সেকালের কাজই আলাদা। একালে কেবল ফাঁকি, কেবল ফাঁকি। আসল রহস্য যদি তাহারা জানিত, বুঝিতে পারিত প্রকৃত কারিগরি সেকালের নয়—আদিম কালের। সকলের সেরা কারিগর উদ্ভিদ্‌রাজ নমনীয় শিকড়ের বন্ধনে এমন গাথুনির সৃষ্টি করিয়াছে বাসুকির শির নড়িয়া তাহা ছিন্ন করিতে অক্ষম। যে বন্ধন নমনীয় তাহার মতো দৃঢ় আর কি? যে বন্ধন যত বেশি নমনীয় তাহা তত দৃঢ়। অদৃশ্য বন্ধন দৃঢ়তম। চৌধুরী-বাড়ির প্রাচীনতম এই অংশে এখন আর কেহ থাকে না, অনেককাল হইল তাহা মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। সেখানে গাছতলাতে পালে পালে শিয়াল, বন-বিড়াল, খটাস নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। শীতকালে কখনো কখনো এক-আধটা পলাতক বাঘ আসিয়া আশ্রয় নেয়। দিনের বেলায় গাছের ডালে ডালে নিম্নমুখী বাদুড়ের দল ঝুলিতে থাকে, রাত্রিবেলা হুতুম অন্ধকারের মন্ত্রীর মতো সকল কথাতেই হুম হুম বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করে। রাত্রির প্রহরে প্রহরে শিয়ালগুলি চৌধুরীদের ঘড়ির সঙ্গে অগণ্য দোহারের মতো প্রহর ঘোষণা করে। শজারু খড় খড় শব্দে নিস্তব্ধতাকে কণ্টকিত করিয়া আহারান্বেষণে বাহির হয়। আর, একটা পুরাতন মহানিমের গুঁড়িকে জড়াইয়া গাছের আলোছায়ায় রং মিলাইয়া পড়িয়া থাকে—একটা বিরাট অজগর সর্প। ওটা চৌধুরীদের বাস্তু। পৌষমাসের সংক্রান্তিতে বাস্তুপূজা উপলক্ষে একটা

ছাগলকে সবলে সেই মহানিমের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। আগাছার অন্তরাল হইতে একবার কেবল হতভাগ্য পশুটার একটা অর্ধব্যক্ত কাতরধ্বনি ওঠে, আর বারেকের জন্য মাত্র আগাছাগুলি নড়ে, তাহার জীবনান্তের শেষ রহস্যটুকু জানিবার জন্যেও লোকে অপেক্ষা করে না—পালাইয়া চলিয়া আসে। সে স্থানটা এমনি দুর্গম ও বিভীষিকাময় যে চোরডাকাতও প্রাণভয়ে সেখানে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সম্মত হইবে না। সেখানে সারা বৎসর কেবল বাতাসের শন্‌শন্‌ আর পশুপক্ষীর রব। জায়গাটা কেবল মানুষের ব্যবহারের বাহিরে গিয়া পড়ে নাই, মানুষের স্মৃতির সীমানারও বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে—ওটা যেন মানুষের পরিচিত পৃথিবীর ভূখণ্ড নয়, কোন্‌ পরিত্যক্ত পৃথিবীর একটা অপার্থিব অংশ। ওটা যেন নিস্তব্ধতার অদ্বৈতবাদের জগৎ।

দুপুরবেলা আহারাদির পরে জগার মা একগোছা চাবি হাতে করিয়া মুক্তামালার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুক্তামালা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। জগার মার পিছনে পিছনে সে বাহির হইয়া পড়িল, সঙ্গে থাকিল বাদলি।

বাদলি বলিল—দাও না জগার মা চাবির গোছাটা আমার হাতে, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

জগার মা বলিল—তুই থাম্‌ তো ছুঁড়ি, ও চাবি যখন দেবো একেবারে মালিকের হাতেই দেবো। কষ্ট ক'রে এতদিনই যদি বইতে পারলাম, আর ক'টা দিনও পারবো।

জগার মা নূতন মহলের পিছনের প্রাচীরের একটা দরজার মরিচা ধরা তালা খুলিয়া ফেলিল। বলিল, এসো বৌমা আমার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই।

মুক্তামালা এখানে ইতিপূর্বে প্রবেশ করে নাই, এমন কি এদিকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহার মনে হইল, হঠাৎ যেন বাস্তবের তীর হইতে আরব্যোপন্যাসের একটা উপশাখার স্বচ্ছ হাঁটুজল স্রোতের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। জগার মা বলিল—বৌমা, এটা তোমার শাশুড়ির বাগান। তার ফুলের সখ ছিল, কত রকম ফুলের গাছই না

লাগিয়েছিল। তার মৃত্যুর পরে এদিকের দরজায় সেই যে চাবি পড়েছিল—আর আজই বোধ হয় প্রথমবার খুললো।

মুক্তামালা দেখিল, সত্যই একটা ফুলের বাগান। কিন্তু বহুকালের অযত্নে অধিকাংশ ফুলের গাছ মরিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও যাহা অবশিষ্ট—তাহার সৌন্দর্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রাচীরের ধার দিয়া সারিবন্দী ডালিমের গাছ, মানুষের নিত্য স্পর্শ হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহারা স্বচ্ছ সবুজ পল্লব-প্রাচুর্যে আর শরতের সোনাঢালা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। এক পাশে গোটা দুই নাতিবৃহৎ শিউলির গাছ—সকালবেলার ঝরা ফুলগুলি শুষ্ক, শাখায় শাখায় অগুন্তি অস্ফুট কুঁড়ি। আর একদিকে একসার পাতাবাহারের গাছ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া চোখে পড়ে—উত্তর দিকে প্রকাণ্ড একটা দারুচিনির বৃক্ষ। ঘনশ্যামল, চিক্কণ কোমল পাতার সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ তাহার বলিষ্ঠ শাখাগুলির কি বঙ্কিম ভঙ্গিমা—যেন বংশীধ্বনি-বিমোহিত একটা শ্যামল অজগর মনের গোপন আনন্দকে প্রকাশ্য রূপ দিবার চেষ্টায় মনোহর ভঙ্গীতে অর্ধোত্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ডালিম গাছের উপরে গোটা দুই টুনটুনি পাখী; আর দারুচিনির পল্লবের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত একটা হলদে পাখীর পাখার পীতাভ ছটা। বাগানের মাঝখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা গোলাকার চাতাল, পাশেই একটা লবঙ্গের গাছ।

মুক্তামালা সেই চাতালটার উপরে গিয়া বসিল। বলিল, জগার মা, এত সুন্দর বাগান এত কাছে, আর আমাকে এতদিন দেখাওনি!

জগার মা বলিল—সবই তোমাকে দেখাবো ভেবে রেখেছি মা, কিন্তু যে ঝড় মাথায় ক'রে তুমি এসেছ, সময় পেলাম কই। তা ছাড়া, বর্ষাকালে এদিকের আগাছা আর জঙ্গল এত বেশি হয় যে, তখন ঢোকা সহজ নয়। বৌমা, তোমার শাশুড়ির খুব ফুলের সখ ছিল। তিনি কত জাতের, কত রঙের গোলাপের গাছ লাগিয়েছিলেন, আর লাগিয়েছিলেন গাঁদার গাছ। আর ওই দিকটায় ছিল নানা রঙের সন্ধ্যামালতী। সন্ধ্যাবেলা নিজের হাতে গাছে জল দিতেন। আমি বলতাম, বৌ, তুমি নিজে দাও কেন, তোমার কি ঝি-চাকরের অভাব আছে

নাকি? তা শুনে তোমার শাশুড়ি বলতেন, ওদের বললে ওরা ফাঁকি দেয় —ভাবে এ বুঝি কাজ নয়। সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মাদুর পেতে বসতেন। কাছারির কাজ শেষ হ'লে তোমার শ্বশুর এসে বসতেন—প্রকাণ্ড আলবোলায় ক'রে তামাক আসতো তাঁর জন্যে। তোমার শাশুড়ি বলতেন, তোমার তামাকের গন্ধে আমার ফুলের গন্ধ নষ্ট হয়ে গেল। তা শুনে তোমার শ্বশুর হেসে বলতেন, বড়বউ, তোমার ফুলের গন্ধের চেয়ে আমার তামাকের গন্ধ অনেক ভালো—এ যে বাইশ টাকা সেরের তামাক। আজ সে-সব দিন কোথায় গেল মা! বৃদ্ধার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। মুক্তামালার মন উদাস হইয়া যাইত, শরতের রোদ সহজেই মন উদাস করিয়া দেয়—তাহার সহিত পুরাতন সুখস্মৃতি মিশ্রিত হইলে তো আর কথাই নাই।

জগার মা বলিল—চলো বৌমা, এখনো অনেক দেখবার আছে। তাহাকে অনুসরণ করিয়া দুইজনে উঠিয়া পড়ে। জগার মা বাগানের দক্ষিণ দিকের আগাছা ও লতাপাতা ঠেলিয়া প্রাচীরে একটা দরজা আবিষ্কার করে। মুক্তামালা অবাক্ হয়—এখানে দরজা ছিল, সে তো বুঝিতে পারে নাই। দরজা খুলিয়া জগার মা বলে—এসো বৌমা, ভয় নেই।

তাহারা একটা পুরাতন মহলে ঢুকিয়া পড়ে।

মুক্তামালা দেখে—জীর্ণপ্রায় চকমিলানো একটা মহল। মেঝেতে সিমেণ্ট নাই, খোয়া পিটাইয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—এখন অব্যবহারে বন্ধুর। ছাদ নীচু, আস্তরখসা, দেয়ালে নোনা ধরিয়াছে, জানলার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়, যাহা আছে অতি উচ্চে, অতিশয় ক্ষুদ্র। ইটগুলা এখনকার মতো নয়, পাতলা, চৌকা, দরজার কাঠ ও হুড়কা এখনো খুব মজবুৎ। সে বুঝিতে পারে, এসব বাড়িঘর তখনকার দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—চোর-ডাকাতের উপদ্রবের সময়ে চৌকিদার-পুলিশের চেয়ে দরজার হুড়কার উপরেই লোক যখন বেশি নির্ভর করিত। তাহার নাকে আসে একটা বদ্ধ-ঘরের ভাপসা গন্ধ।

জগার মা বলে—বৌমা, এই বাড়িতেই তোমার শ্বশুর বাল্যকালে কাটিয়েছেন। তোমার শাশুড়িও এই বাড়িতে এসেই উঠেছিলেন। এই দেখো, এইটে ছিল তাঁদের শয়নঘর—এই দেখো এখানে জ্বলতো পিতলের পিলসুজে তেলের বাতি, এখনো দেয়ালে ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে।

মুক্তামালার মনে চমক খেলিয়া যায়। সে ভাবে, আলোর চেয়ে ধোঁয়ার দাগেরই আয়ু বেশি। আলো নিভিয়া যায়—ধোঁয়ার দাগ মিলায় না।

—এদিকে এসো মা। এই শয়নঘরের দু'পাশে দু'টো কোঠা দেখেছ? একটা দক্ষিণের কুঠুরি, একটা উত্তরের কুঠুরি। এই উত্তরের কুঠুরিতে তোমার শাশুড়ির সব সৌখিন জিনিস থাকতো, কত খেলনা—কাঁচের, চীনেমাটির। কড়ি-বসানো সুন্দর একটা বাক্স ছিল—অমন সুন্দর জিনিস আর দেখলাম না। আর ওই দক্ষিণ দিকের ঘরটায় লোহার দরজা দেখেই বুঝতে পারছো, ওই ঘরটা থাকতো সোনা-দানা মোহর টাকা-কড়িতে ভরা। রূপোর ছাতি, রূপোর আশাসোটা, রূপোর চৌদল বাসন হাওদা এমন যে কত ছিল, তার ঠিক নেই। ওই কোণে বড় বড় দুটো সিন্দুক-ভর্তি মোহর আর সোনার থান ছিল।

এমন সময়ে অন্ধকার হইতে গোটা দুই চামচিকা ফড় ফড় করিয়া উড়িয়া যায়—মুক্তামালা চমকিয়া ওঠে। জগার মা বলে—ভয় নেই মা, চামচিকা। বাদলি হাসিয়া ওঠে।

জগার মা বলে—আবার হাসির কি হ'ল রে?

বাদলি বলে—চামচিকের শব্দে কি বউঠাকরুন মূর্ছো যাবে যে তুমি সাবধান করে দিচ্ছ? এতে আবার ভয়ের কি আছে?

জগার মা বলে—আছে রে আছে। সব কথা তো সবাই জানে না।

মুক্তামালা ও বাদলির কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। তাহারা শুধায়, কিসের ভয়, বলোই না জগার মা।

জগার মা বলে—কর্তা হঠাৎ ওই নতুন মহল তৈরি করতে গেল কেন?

যারা জানতো সে কথা, তাদের আজ তো কেউ বেঁচে নেই। সব পুরোনো কথার খানাদার হয়ে কেবল আমি রয়ে গিয়েছি।

মুক্তামালা বলে—বলো না জগার মা, কি হয়েছিল। তোমার গল্প আমার খুব ভালো লাগে।

জগার মার মুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সে বলে, এই দালানে একটা দোষ ঘটেছিল। এই বংশেরই কোনো এক বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল, সে অনেকদিন আগের কথা, সবাই ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু তোমার শাশুড়ির আসবার পর থেকে এই দালানে উপদ্রব আরম্ভ হ'ল। এসব কথা তোমার শাশুড়ির নিজ মুখে শুনেছি।

তোমার শাশুড়ি তো নতুন বউ। এতবড় চৌধুরীবংশ—সকলের সঙ্গে তখনো তার পরিচয় ঘটেনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার শাশুড়ি এই দালানের ছাদের উপর বসে আছেন, তখনো তোমার শ্বশুর ভিতরে আসেন নি। তোমার শাশুড়ি ব'সে ভাবছেন তো ভাবছেন—হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ, পিছনে ফিরে তাকালেন, ভাবলেন, হয়তো স্বামী আসছেন। কিন্তু স্বামী কই? দেখলেন, লাল-পেড়ে শাড়ি-পরা, ঘোমটা-দেওয়া একটি বউ। তোমার শাশুড়ি ভাবলেন, চৌধুরীবাড়িরই কোনো বউ হবে। তোমার শাশুড়ি ভবতারিণী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একখানা আসন এনে বসতে দিলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হ'ল না যে, এ বউ এলো কোন্ পথ দিয়ে। ছাদে ওঠবার একমাত্র সিঁড়ি আগ্‌লে তো ব'সে ছিলেন নিজে। সে যাক্ গে—তিনি তো আসন পেতে দিলেন। কিন্তু বউ আর বসে না। তিনি যতই বসতে বলেন, বউ মুচকে মুচকে হাসে, কিন্তু কিছুতেই আর বসতে চায় না। এমন সময় সিঁড়িতে তোমার শ্বশুরের পায়ের শব্দ শুনে ভবতারিণী তাড়াতাড়ি উঠেছেন, ইচ্ছা যে স্বামীকে আসতে নিষেধ করেন। স্বামীকে নিষেধ ক'রে ফিরে এসে দেখেন—কই, কেউ কোথাও নেই। না, কোথাও নেই। ভাবলেন, নেমে গিয়েছে। কিন্তু তখনো খেয়াল হ'ল না, যাবে কোন্ পথে। ভবতারিণী তখন ছেলেমানুষ বউ, এসব কথার কিছুই সে স্বামীকে বললো না। আর বলবার আছেই বা কি? এমনি ভাবে দিনকতক যায়, হঠাৎ

সেই বউটিকে তোমার শাশুড়ি দেখতে পেলো, সেই রকম লালশাড়ি পরা। বউ কাছে আসে, কিন্তু কথাও বলে না, বসতে দিলেও বসে না। তোমার শাশুড়ি ভাবলো, ওই মেয়েটিও তার মতো নতুন বউ, তাই লজ্জায় কথা বলছে না। ভবতারিণীর মনে হ'ল—আমিও তো একলা, ভালোই হয় এই নতুন বউটির সঙ্গে ভাব জ'মে উঠলে, দু'জনে ব'সে ব'সে দিব্যি গল্প করা যাবে।

সেই পুরানো দিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধা জগার মা, নিজেও প্রাচীনকালের একটা জীর্ণ অট্টালিকা, বাস্তবের অপেক্ষা স্মৃতির রাজ্যেরই সে যেন প্রকৃত অধিবাসী, সে এই কাহিনী বলিয়া যায়—আর মুক্তামালা ও বাদলি নিস্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিতে থাকে। স্থান-মাহাত্ম্য এমন গুরুতরভাবে মুক্তামালার বুকের উপর চাপিয়া না বসিলে এ কাহিনী হয়তো সে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এ কাহিনী বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি? এই চামচিকা-ওড়া, চুনবালি-খসিয়া-পড়া, স্মৃতির-দীপাঙ্ক-আঁকা, সিক্ত, রিক্ত, নিস্তব্ধ অট্টালিকায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া একাহিনী বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে তাহার গা ছম ছম করিয়া ওঠে, মনে হয় সেদিনের সেই লালপেড়ে শাড়িপরা বউটি কার্নিসের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবে এমন মোটেই অসম্ভব নয়। অনেককাল পরে মানুষ আজ তাহার কাছাকাছি আসিয়াছে। মুক্তামালার ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে ভয় হয়—অথচ কৌতূহল দৃষ্টির একটা অংশকে উপরের দিকে টানিয়া তোলে। একবার তাহার মনে হয় কাহিনীর বাকিটা শুনিয়া কাজ নাই, কিন্তু ভয়ের গল্প আর লঙ্কার ঝাল গলাধঃকরণ করা কঠিন, না-করা আরো কঠিন। কাহিনীর স্রোত আবার বৃদ্ধার স্খলিত বচনে অবারিত হইয়া যায়।

—একদিন বিকালবেলা তোমার শ্বশুর শোবার ঘরে এসে দেখেন যে ভবতারিণী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধোলেন—কোথায় চললে? ভবতারিণী বললো—আজ এত আগে এলে কেন? আমি যে চলেছি ওবাড়ির নতুন বউটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে।

তোমার শ্বশুর কেবল শুধোলেন—কোন্ বউ ?

স্বামীর গম্ভীর স্বরে বিস্মিত হয়ে ভবতারিণী বললো—বোধ করি পাশের বাড়ির হবে। অনেকদিন থেকে আমাদের ছাদের উপরে যাতায়াত করছে—কিন্তু কিছুতেই কথা বলে না। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্বামী সবলে তার হাতটা ধ'রে ফেলে বললো—খবরদার, যেয়ো না।

ভীত ভবতারিণীর মুখ থেকে শুধু বেরুলো—কেন ?

—ও মানুষ নয়।

—মানুষ নয়! ব'লেই ভবতারিণী মূর্ছিত হয়ে পড়লো—স্বামী তাকে ধ'রে ফেললো।

মুক্তামালা স্তম্ভিত হইয়া শোনে।

জগার মা বলে—তারপরে তোমার শাশুড়ির শরীর ভেঙে পড়বার মতো হ'ল। সর্বদাই মন-মরা হয়ে থাকে। তোমার শ্বশুর তখন, এখন যে মহলে তোমরা বা'স করছ সেই মহলটা তৈরি ক'রে নিয়ে উঠে চ'লে এলো। তখন থেকেই বাড়ির অংশটা জনশূন্য।

দীপ নিভিয়া গেলে সলতে-পোড়া গন্ধ রহিয়া যায়; কাহিনীর শেষে তাহার স্মৃতি রহিয়া গেল। জগার মা বলিল—চলো বৌমা, আর একটা মহল বাকি আছে, পূজোর দালান, দেখিয়ে নিয়ে ফিরে যাই, বেলা বোধহয় শেষ হয়ে এলো।

তাহারা তিনজনে বিরাট একটি চণ্ডীমণ্ডপের খিলানের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। দেয়ালে দেবাসুরের যুদ্ধ, বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন প্রভৃতি আখ্যানের কাজকরা। দালানের মাঝখানে অতি পুরাতন একখানা চন্দনকাঠের তক্তপোষ, দেবীপ্রতিমা স্থাপিত হইত। কুলুঙ্গির উপরে কতকালের একটা ভগ্ন ধূপদানি, ইতস্তত মাটির প্রদীপ ছড়াছড়ি যাইতেছে।

জগার মা বলিল—এ তোমাদের পুরানো মণ্ডপ। যে মণ্ডপে তোমাদের পূজো হয়ে থাকে সেটাও তোমার শ্বশুরের গড়া। এ মন্দিরে পূজো হয় না ব'লে এর মাহাত্ম্য কিছু কম মনে ক'রো না যেন। যেখানেই যা হোক্ আগে এই বুড়ো মণ্ডপের নামে একটা পূজো দিতেই হবে। আর দেবেই বা না কেন ?

এযে জাগ্রত মণ্ডপ, কতদিনের পীঠস্থান। শোনো বৌমা, একটা কথা বলি, কবে ম'রে যাই, কে আর এসব কথা বলবে? কখনো অস্নাত, বা একা, বা সন্ধ্যার সময়ে এদিকে এসো না। কেন?—রাত-বিরেতে ওঁরা এখানে আসেন। কত লোকে দেখে দবকে উঠেছে, কত লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, মারাও গিয়েছে ব'লে শুনেছি। দেবতার দর্শন পাপী অশুচির সইবে কেন? ওঁরা যে আসেন তার প্রমাণ হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা এখানে কাঁশর ঘণ্টা বাজে, ধূপ-ধূনোর গন্ধ ওঠে, কত লোকে দেখেছে। আর তাও বলি বৌমা, ওঁদের লীলাখেলার মধ্যে মানুষের আসবার দরকারই বা কি?

এই পর্যন্ত বলিয়া সে বলিল--এবারে চলো বেলতলাটা দেখিয়ে নিয়ে ফিরে যাই। জগার মা বলিল—এই স্থানটুকুই চৌধুরীদের আদিপুরুষদের বাসস্থান। চৌধুরীদের সব ভাগ হয়েছে, কিন্তু এটুকু ভাগ করবার কথা কেউ মনে করতেও সাহস পায়নি। এতটুকু জমি—দাম লক্ষ টাকা।

বৃদ্ধা লক্ষ শব্দটাকে বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিল, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল না মূল্যটা মাত্র এক লক্ষ না লক্ষ লক্ষ।

—হাঁ—বলুক তো কেউ জমিটা ভাগ ক'রে নেবো—দেখি কার বুকের কত পাটা! কিম্বা কেউ কারুর দরজা বন্ধ করুক তো দেখি কত সাহস! দুই শরিকে কতবার মামলা-মোকদ্দমা মারামারি-কাটাকাটি, এমন কি মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—কিন্তু বৌমা, বেলতলার উপর হাত দিতে কেউ তো সাহস করলো না। এইটুকু ভয়-ভক্তি আছে ব'লেই চৌধুরীদের এখনো সব যায়নি। যেদিন এ ভয়টুকু যাবে—বলিতে বলিতে তাহারা বেলতলায় ছ'আনির দিকের দরজার কাছে আসিয়া পৌছায়। জগার মা একটা চাবি চাহিয়া লইয়া তালা খোলে। তারপরে তিনজনে সবলে টানাটানি করিয়া শালকাঠের দরজা খুলিয়া ফেলে।

জগার মা চমকিয়া ওঠে, বলে—দরজা গেল কোথায়? এখানে দেয়াল গেঁথে দিল কে? বৃদ্ধা শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়ে।

—হায় হায়, এ দুর্মতি কার হ'ল? চৌধুরীদের আর কিছু থাকলো না।

হায় হায়, এবারে চৌধুরীদের পাপের ভরা পূর্ণ হ'তে আর কিছু বাকি থাকলো না।

এইরূপ খেদোক্তি করিতে করিতে এই ভয়াবহ ঘটনা নবীননারায়ণকে জানাইবার জন্য সে রওনা হইল। দরজা খোলাই পড়িয়া রহিল। মুক্তামালা ও বাদলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

৫

নবীননারায়ণ খবর পাইবামাত্র সোনা সর্দারকে সঙ্গে লইয়া বেলতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল সত্য সত্যই ছ'আনির দরজা অপর দিক হইতে প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জহিরুল্লা মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তখনই সে সোনা সর্দারকে পাঠাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল।

অশথ গাছটা কাটিবার পর হইতে দশানি অনেক উৎপাত তাহার উপরে করিয়াছে। এই সব ব্যবহারে সে মনে মনে বিরক্তি বোধ করিত, কিন্তু আজ এই প্রথম তাহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। যেন হঠাৎ এক পলকে দেহের সমস্ত রক্ত গিয়া তাহার মাথায় উঠিল। বৈঠকখানায় গিয়া সে সুস্থ হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার যদি চিন্তা করিবার মতো মনের প্রকৃতিস্থতা থাকিত তবে বুঝিতে পারিত এই এক বৎসরকাল সময়ের মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন তাহার হইয়াছে। সে যে কখনো জমিদার সাজিয়া বসিবে, প্রজা শাসন করিবে, শরিকের সহিত দাঙ্গা করিবে—এ সমস্ত তাহার চিন্তার অতীত ছিল। জমিদার-পুত্র হইলেও জমিদারী মনোবৃত্তি হইতে সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে, জমিদারী চাল-চলনের উর্ধ্বে সে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস! সে জানিত সে আধুনিক যুগের মানুষ। জমিদার যতই শিক্ষিত হোক, যতই একালীন হোক, সে আধুনিক যুগের মানুষ হইতেই পারে না—কারণ জমিদারি ব্যাপারটাই প্রাচীন যুগের ছাপ মারা।

কিন্তু একটা বৎসরে তাহার কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আর দৈবের কি শ্লেষ। সে গ্রামে আসিয়াছিল মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, যেমন আগে অনেক বার আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখে পুরাতন অশথ গাছটা নূতন করিয়া পড়িয়া গেল। গাছটা কাটিয়া খানিকটা জমি আবাদের যোগ্য করিয়া তুলিবার কি খেয়াল তাহার মাথায় চাপিল। এই খেয়াল তাহাকে এবং সমস্ত গ্রামকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—আর এই সব মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে গ্রামে থাকিতে বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মনোবৃত্তির একটা ওলটপালট হইতে শুরু করিয়াছে।

সে নিজে জমিদার সাজিয়া বসিবে না স্থির করিয়াছিল। এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষার স্থান কলিকাতা হইতে পারে—কিন্তু জোড়াদীঘি গ্রাম কখনোই নয়। এখানকার আবহাওয়া প্রাচীন যুগের বিদ্যুতে ঠাসিয়া ভরা। আর এই যে তাহার পৈতৃক ভবন, বহুযুগের এবং বহুতর পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও কর্মকীর্তির স্থিরাবর্ত রচনা করিয়া বিরাজমান, এখানে কলিকাতার আধুনিক মনোবৃত্তি রক্ষা করিয়া চলা কি সম্ভব? তৃণখণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনই হোক নদীর আবর্তে পড়িয়া গেলে অসহায়ভাবে তাহাকে চক্রাকারে ঘুরিতেই হইবে। নবীননারায়ণের আজ সেই অবস্থা। এক বৎসরের দীর্ঘবিলম্বিত আঘাতে এবং বেলতলার দরজা বন্ধ হইবার আকস্মিক সংঘাতে তাহার ভিতরকার প্রাচীনদিনের স্মৃতির চাবুক খাওয়া রক্তধারা জাগিয়া উঠিল। সে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার পূর্বগামী পিতামহগণ এই কাপুরুষতার জন্য তাহার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে নিরন্তর ধিক্ ধিক্ ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে। পূর্বতনের বিপুল ভারে তাহার অধুনাতন নিতান্ত অসহায় ও পীড়িত বোধ করিতে লাগিল। সে স্থির করিল—এই অপমানের—এ অপমান আর ব্যক্তিগত মাত্র নয়, তাহার পূর্বজ সমস্ত বংশধারকদের এই অপমানের—একটা যথার্থ বিহিত করিতেই হইবে। আর অবহেলা করা উচিত হইবে না।

ইতিমধ্যে সোনা সর্দারের সঙ্গে জহিরুল্লা মিস্ত্রি আসিয়া সেলাম করিয়া

দাঁড়াইল। নবীন বলিল—এই যে এসেছ। দেখো, এক কাজ করতে হবে। বেলতলার আমাদের দিকের দরজাটা কে যেন প্রাচীর তুলে গেথে দিয়েছে। ভেঙে ফেলতে হবে।

এই প্রাচীর যে দশানির হুকুমে গাঁথা হইয়াছে এবং গাথিয়াছে স্বয়ং জহিরুল্লা সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু মিস্ত্রির ব্যবসায় জহিরুল্লার একচেটিয়া, কাজেই তাহার উপরে রাগ করিলেও তাহা প্রকাশ করা চলে না। বিশেষ, তাহার নিরপেক্ষতার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। নবীন জানিত, সে যেমন নিস্পৃহভাবে প্রাচীর গাথিয়াছে তেমনি নিস্পৃহভাবে ভাঙিয়া ফেলিবে। এমন নির্বিকার লোকের উপর রাগ করা মনুষ্যস্বভাব-সুলভ নয়।

নবীন বলিল—এখনি কাজ আরম্ভ করতে হবে, একশো টাকা পাবে।

জহিরুল্লার মুখে চিরসংলগ্ন হাসির আভা একটু উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে ভাবে, এমন না হইলে আর গ্রামের একমাত্র রাজমিস্ত্রি হইয়া সুখ কোথায়। সে ভাবিল, যে প্রাচীর গড়িতে সে পঁচিশ টাকা পাইয়াছিল তাহাই ভাঙিতে পাইবে একশত! এমন হইলে ভাঙা ছাড়িয়া আর কে গড়ার কাজে হাত দিবে?

জহিরুল্লা কাছারি হইতে নগদ একশত টাকা চাহিয়া লইয়া প্রাচীর ভাঙিতে চলিল—সঙ্গে নবীন চলিল।

দমাদম হাতুড়ির আঘাতে স্বল্পক্ষণে-গড়া প্রাচীর স্বল্পতরক্ষণে ভাঙিয়া পড়িল। এবারে দশানির লোক প্রস্তুত ছিল, পাঁচ-সাতজন লাঠিয়াল। সদ্য-উন্মুক্ত দরজা দিয়া নবীন যেমনি প্রবেশ করিয়াছে অমনি লাঠিয়ালেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ তাহার গায়ে হাত দিল না—কিন্তু ইহার চেয়ে বোধ করি তাহাও ভালো ছিল। তাহারা বলিল—হুজুর, আজ একবার দশানির বাড়িতে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

নবীন দেখিল সে নিতান্ত অসহায়। বল প্রকাশ করিলে এটুকু মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ না থাকিতে পারে। অনিবার্য অপমান আগ বাড়াইয়া গ্রহণে তাহার

গ্লানির লাঘব হয়। উপায়ান্তরহীন হইয়া সে দশানির বাড়িতে প্রবেশ করিল। দশানির দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জহিরুল্লার নিরপেক্ষতা এতই বহু-প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত যে, কেহ তাহাকে কোনদিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ মাত্র করিল না।

৬

কাজটা কীর্তিনারায়ণের অভিপ্রেত ছিল না। তাহার অনুচরেরা আদেশের সীমা লঙ্ঘন করিয়া কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে—কীর্তিনারায়ণের তাহাদের শাসন করাই উচিত ছিল। নবীন যদি সোজা বৈঠকখানায় গিয়া উঠিত, তবে ব্যাপারটা ওইখানেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু সে বৈঠকখানায় না গিয়া কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে কোথায় থাকিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিল। তাহার এই একগুঁয়েমিতে কীর্তিনারায়ণ ক্রুদ্ধ হইল—ভাবটা এই যে, উনি ভাঙেন তবু মচকান না। আচ্ছা দেখা যাইবে কতক্ষণ এই একগুঁয়েমি থাকে। তাহকে অন্তঃপুর-মহলের একটি ঘরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল।

কীর্তিনারায়ণ ভাবিল—মন্দ হইল না, এবারে অশ্বত্থতলা ও অন্যান্য যেসব জায়গা-জমি অনেক দিন হইতে বেদখল করিবার ইচ্ছা আছে, সেগুলি লিখাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অপ্রত্যাশিত এই সুযোগ হইতে এতখানি লাভের সম্ভাবনা আছে মনে হইবামাত্র সে খুশি হইয়া উঠিল এবং এইমাত্র যে অনুচরদের উপর তাহার রাগের আভাস জমিয়া উঠিতেছিল, তাহাদের প্রতি সে একপ্রকার প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতা বোধ করিতে লাগিল।

রাত্রিবেলা আহারের ডাক পড়িলে কীর্তিনারায়ণ ভিতরে গিয়া দেখিল, পাশাপাশি দুইখানা আসন পড়িয়াছে। সে শুধাইল—মা, আর একজন কে? সেরপুরের কুটুম এসেছে নাকি? সেরপুরে তাহার শ্বশুরালয়।

অম্বিকা দেবী বলিলেন—তুই বোস্ না! খাওয়ার লোকের অভাব?

কীর্তি ভাবিল কোনো দূরাগত আত্মীয়স্বজন হইবে। সে খাইতে বসিয়াছে,

এমন সময়ে দেখিতে পাইল পাশের ঘর হইতে অম্বিকা দেবীকে অনুসরণ করিয়া নবীন আসিয়া পাশের আসনখানিতে বসিল। কীর্তিনারায়ণের মুখে অমাবস্যা নামিল। সে কোনো কথা না বলিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল। অম্বিকা দেবী বলিলেন, কিরে, ওকে চিনতে পারছিস্ না? ও যে আমাদের নবু।

কীর্তি বলিল—হুঁ!

অম্বিকা বলিলেন—হুঁ কি রে? তোর তো খাওয়ার সময়ে গল্প করবার অভ্যাস, আজ চুপ ক'রে রইলি কেন?

কীর্তি বলিল—না!

অন্যদিন আহারের সময়ে কীর্তির মুখ দুইভাবে চলে, আজ কেবল সে আহার করিয়া যাইতে লাগিল। হুঁ-না ছাড়া অন্য কোনপ্রকার দীর্ঘতর শব্দ বাহির হইল না। তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া সে উঠিয়া গেল।

পাশের ঘরে গিয়া সে মাকে ডাকিয়া লইয়া শুধাইল—ও কি-ক'রে এলো?

মা বলিলেন—সে কথা তো আমার চেয়ে তুই ভালো ক'রে জানিস যে, নবু কি-ক'রে এ বাড়িতে এলো। আর এলোই যদি, ভিতরে না এসে বাইরে কেন ব'সে রইলো।

কীর্তি বলিল—ওর সঙ্গে যে ঝগড়া।

অম্বিকা বলিলেন—সে তো নতুন নয়। দশানি-ছ'আনির ঝগড়া তো চিরকালই আছে। তাই ব'লে কি বাড়ির ছেলে না খেয়ে থাকবে? এমন কবে হয়েছে রে?

কীর্তিনারায়ণ আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল।

নবীনের আহার শেষ হইলে কীর্তিনারায়ণের স্ত্রী রুক্মিণী বলিল—ঠাকুরপো, শুতে চলো।

নবীন হাসিয়া বলিল—বৌঠাকরুন, আজ তো আমার নজরবন্দী হয়ে থাকবার কথা, তুমি পাহারা দিয়ে থাকবে নাকি?

রুক্মিণী বলিল—ঠাকুরপো, আমার নজরবন্দীতে চলবে কেন? আরো কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছি। তুমি তো সহজ লোকটি নও।

নবীন তাহার কথার তাৎপর্য না বুঝিয়া বলিল—আজ তোমাদের হাতে বন্দী, চলো।

রুক্মিণী তাহাকে লইয়া একটি ঘরে গেল। নবীন দেখিল, সেখানে পালঙ্কের উপরে শুভ্র শয্যা প্রস্তুত, আর তাহাতে রাশি রাশি সাদা ফুল ছড়ানো।

নবীন বলিল—বৌঠাকুরুন, এ যে দেখছি ফুলশয্যার আয়োজন। ভুল ক'রে আমাকে এ ঘরে আনোনি তো? ফুলশয্যায় কি নজরবন্দী চলে?

রুক্মিণী বলিল,—ভাই, নজরবন্দীর সূত্রপাত তো ফুলশয্যা থেকেই।

নবীন বিছানায় বসিতে বসিতে বলিল—নিতান্ত মিথ্যা বলোনি। কিন্তু এখানে সে পাহারাদারকে পাচ্ছি কোথায়?

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—চেষ্টায় নাকি সবই হয়। দেখাই যাক্ না।

এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল। নবীন জানালা দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই পদশব্দ শুনিয়া বলিল—পাহারাদার নিয়ে এলে নাকি?

রুক্মিণী বলিল, দেখই না চেয়ে।

নবীন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, রুক্মিণীর পাশে মুক্তামালা!

সে চমকিয়া শুধাইল—তুমি?

মুক্তামালার পরিবর্তে রুক্মিণী উত্তর দিল—হাঁ, ঠিকই ধরেছ, উনিই।

তারপরে মুক্তামালার দিকে চাহিয়া বলিল—কি ভাই, কড়া নজরবন্দী ক'রে রাখতে পারবে তো?

মুক্তামালা হাসিল। সে হাসিতে বাহিরের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল।

রুক্মিণী বলিল—ঠাকুরপো, তোমাদের ফুলশয্যা তো কলকাতায় সেরেছিলে, আমাদের নিয়ে যাওনি। সেই ফাঁকির শোধ তোলবার জন্যে অদৃষ্ট আজ সুযোগ দিয়েছে। দেখো, পছন্দ হয় কি না!

আজকার ঘটনার সূচনা ও পরিণাম স্মরণ করিয়া নবীননারায়ণ বলিল—বৌঠাকরুন, তোমরা, মেয়েরা, সব পারো।

রুক্মিণী হাসিয়া উঠিয়া বলিল—এই সহজ কথাটা সব সময়ে মনে রাখলেই

তো অনেক গোলমাল সহজে চুকে যায়।……কি ঠাকুরপো, ঘুম পাচ্ছে নাকি?

—'হাঁ' বললে কি বিশ্বাস করবে? ভাববে তোমাকে তাড়াবার কৌশলমাত্র; কাজেই বলছি 'না'। এখন এসো তিনজনে মিলে গল্প করা যাক্।

রুক্মিণী বলিল—ঠাকুরপো, তিনজনের গল্প ত্রিভুজের কোণে কোণে খোঁচা খেতে খেতে চলে, সে গল্প ফুলশয্যার রাতের নয়। ফুলশয্যার গল্প হবে দুইজনে। মন থেকে মনে বিনি-স্থতোর বিনি-ভাষার টানা-পোড়েন চলবে। কি বলো ভাই মুক্তা?

মুক্তামালা বলিল—দিদি, আমার বলবার আর অবকাশ রাখলে কোথায়?

রুক্মিণী বলিল—তবে আমি চল্‌লাম, তুমি এবার অবকাশ পাবে।

মুক্তামালা তাহার আঁচল টানিয়া ধরিল।

রুক্মিণী বলিল—আবার টানো কেন?

মুক্তামালা অপ্রস্তুত হইল। নবীন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—ওর বোধ করি ইচ্ছা যে, যাবার আগে তুমি ব'লে যাও যে 'বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।'

এই কথায় তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

রুক্মিণী বলিল—না ভাই, তোমাদের মতো রাত জেগে গল্প করবার বয়স আমার নেই। আমার ঘুম পাচ্ছে, চল্‌লাম। এই বলিয়া সে ঘরের বাহিরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে মুক্তামালার উপর দিয়া অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—এখনো তাহার পূর্ণ সম্বিত ফিরিয়া আসে নাই। প্রথমে সে শুনিল যে, ছোটবাবু দশানির বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। তারপরে শুনিল, যাওয়াটা স্বেচ্ছায় নয়, নিতান্ত বাধ্য হইয়া। ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দশানির বাড়িতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহার কি কর্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—একাকী ছাদের উপরে নীরবে বসিয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি প্রহরাতীত। এমন সময়ে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অম্বিকা দেবী আসিয়া উপস্থিত। সে প্রণাম করিলে

অম্বিকা বলিলেন—মা, আজ আমাদের বাড়িতে রাত্রে নবুর নেমন্তন্ন, তোমাকেও যেতে হবে।

এই বলিয়া অম্বিকা বলিলেন—চলো, তোমাকে নিতে এসেছি। সে অম্বিকার অনুসরণ করিয়া খিড়কি-পথে দশানির বাড়িতে প্রবেশ করিলে রুক্মিণী আসিয়া তাহার ভার গ্রহণ করিল। তার পরের সব ঘটনা পাঠকের বিদিত। নবীন ও কীর্তিনারায়ণের অবিবেচনায় যাহা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণত হইতে পারিত, অম্বিকা ও রুক্মিণীর, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সস্নেহ ও সুনিপুণ হস্তক্ষেপে তাহা একপ্রকার গার্হস্থ্য রোমান্সে পর্যবসিত হইয়া সকল দিক রক্ষা করিল।

ভোরবেলা অম্বিকাদেবী নিজে অনুগমন করিয়া নবীননারায়ণ ও মুক্তামালাকে ছ'আনির বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

৭

এই ঘটনার পরে কীর্তিনারায়ণের ধারণা জন্মিয়া গেল যে, মাতৃজাতীয় ব্যক্তিরা সংসারে থাকিতে সাংসারিক উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। নতুবা নবীনকে এমন মুঠার মধ্যে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল। লোকটাকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে কবলে পাওয়া গিয়াছিল। ছ'আনির যেসব সম্পত্তির উপরে পুরুষানুক্রমে দশানির লোভ, সে সমস্তর আজই আস্কারা হইয়া যাইত। যে মাতার অদূরদর্শিতার ফলে এমন সুযোগ ফস্কিয়া যায়, সে তো পুত্রের শত্রু। পত্নী-জাতীয় ব্যক্তির প্রতি কীর্তিনারায়ণের ধারণা যে ভিন্নরূপ ছিল তাহা নয়—কিন্তু মাতার চেয়ে পত্নীকে আয়ত্তে রাখা নাকি অনেক সহজ, বিশেষ সে জানিত যে তাহার স্ত্রী নিতান্ত ব্যক্তিত্বহীন। বড়জোর সে খানিকটা কান্নাকাটি করিবে—ততোধিক কিছু নয়। কিন্তু চোখের জলকে ভয় করিলে পুরুষমানুষের চলে না। কীর্তি জানিত যে, চোখের জলের অলকনন্দার পরপারেই সাংসারিক কামনার স্বর্গলোক—ওটা ডিঙাইতে দ্বিধা করিলে চলিবে কেন?

এই ব্যাপারের দু'চারদিন পরে কীর্তিনারায়ণ একদিন অম্বিকা দেবীকে বলিল—মা, তোমার কাশী যাবার ইচ্ছে ছিল—একবার ঘুরে এসো না।

পুত্রের প্রস্তাবে অম্বিকা চমকিয়া উঠিলেন। একবারমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা মাতৃস্নেহ পরীক্ষার ছল মাত্র নয়—নিতান্ত আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। তিনি কি উত্তর দিবেন, হঠাৎ ভাবিয়া পাইলেন না।

পুত্রস্নেহের গভীরতা পরীক্ষার জন্য অনেক মাতাই মাঝে মাঝে কাশী যাইবার প্রস্তাব করে, কিন্তু তাহাকে অন্তরের কামনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এমন উপদেশ কোনো শাস্ত্রকার দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। মাতার এই জাতীয় প্রস্তাব শুনিলে আদর্শ পুত্র রাগ করিবে, দুঃখ করিবে, বিবাহের পরে মাতা যে আর তাহাকে দেখিতে পারেন না, এমন অভিযোগ করিবে, পত্নীর নানারূপ নিন্দাবাদ করিবে, তাহাকে অবিলম্বে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। পুত্রের এইরূপ খেদোক্তিতে মাতা মনে মনে আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ঘনিষ্ঠতরভাবে লাভ করেন। কোনো মাতাই সংসার ছাড়িয়া কাশী যাইতে চাহেন না—যে যায়, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যায়। আর পত্নীদের কাশীর অনুরূপ পিত্রালয়। পত্নী যখন কঙ্কণ ও কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া এইমাত্র বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে—তখন কোনো স্বামী যদি ঠিকাগাড়ি ডাকিয়া আনে, তবে তাহার অর্থাৎ সেই হতভাগ্য স্বামীর পরিণাম স্মরণ করিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া ওঠে। মাতা ও পত্নীর অবস্থানের বিকল্প আছে বলিয়াই তাহাদের এত প্রতাপ। কোনো নির্বোধ স্বামীর হঠাৎ যদি কাশীযাত্রা বা বানপ্রস্থের ইচ্ছা জাগে, তবে নিতান্তই তাহাকে যাইতে হইবে, নতুবা ভবিষ্যতে খোঁটার হোঁচট তাহার পক্ষে অনিবার্য। সংসারে স্বামী-জাতীয়ের মতো অসহায় আর কে আছে? এই সরল সত্যটি আবিষ্কার করিতে অনেক সাধ্বী পত্নীরই কিছু সময় লাগে—তাই সংসার এখনো একেবারে অচল হইয়া যায় নাই।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—যাও না মা, ঘুরে এসো। আর যদি নিতান্তই না যাও, তীর্থ করলাম না ব'লে আমাকে ভবিষ্যতে আর দোষ দিয়ো না।

এই প্রশ্নের আর কি উত্তর আছে? অম্বিকা বুঝিলেন, তাঁহার যাইতেই হইবে, যাওয়াই ভালো।

তিনি চোখের জলের রূপান্তর হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—এতদিনে যে তোর হুঁশ হয়েছে সে আমার সৌভাগ্য। বুড়ো মাকে যে এখানকার মরা নদীতে না পুড়িয়ে গঙ্গা পাওয়াবার কথা মনে হয়েছে—তবু ভালো। আমি ভাবতাম যে, কীর্তির কি কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না। এখন দেখছি—না, আমার ছেলেটার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।

অন্য জননী হইলে কাঁদিয়া-কাটিয়া একটা অনর্থ করিয়া দিত এবং এই শুভ প্রস্তাব চোখের জলে ভাসিয়া যাইত। কীর্তি জানিত, তাহার মাতা সেরূপ সজল প্রকৃতির স্ত্রীলোক নহে। পুত্রের হাত হইতে এরূপ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইলে সে আর সংসারে থাকিবে না। আর খুব সম্ভব মাতার এই প্রকৃতি জানিত বলিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল—নিশ্চিন্ত ছিল যে, একবার কোনরকমে প্রস্তাবটা করিতে পারিলে মাতাকে কাশীবাসের নামে সরাইয়া দিয়া সংসারযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করা যাইবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রুক্মিণী স্বামীকে বলিল—মাকে নাকি কাশী যাবার কথা বলেছ?

কীর্তি বলিল—উনি তো অনেকদিন থেকে যাবেন যাবেন করছেন, পাঠানোই হয়ে ওঠে না। ভাবলাম আর দেরি করা উচিত নয়—একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

রুক্মিণী বলিল—কিন্তু এবারে প্রস্তাবটা কি তিনি করেছিলেন?

কীর্তি ঢোক গিলিয়া বলিল—হ্যাঁ, এবারে আর কি করবেন? কতবার নতুন ক'রে করবেন?

রুক্মিণী ভাবমূর্ছনাহীন কণ্ঠে বলিল—তার মানে, এবারে প্রস্তাবটা তুমি করেছ?

কীর্তি বলিল—করবো না? একটা কর্তব্য তো আছে?

কর্তব্যের উল্লেখে এত দুঃখের মধ্যেও রুক্মিণী হাসিয়া ফেলিল। স্থিরকণ্ঠে বলিল—কর্তব্য? আমি কিছুই বুঝি না—না? মা থাকতে তোমার যথেচ্ছাচার সুবিধামতো হচ্ছে না—না? সেদিন ও-বাড়ির ঠাকুরপোকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মার জন্যে ছেড়ে দিতে হ'ল, সে আপসোস কিছুতেই যাচ্ছে না—না? দেখো—এখনো শোনো, পাপের ভরা আর পূর্ণ ক'রো না। আর কিছু দিন এমন চললে এতবড় সংসার তোমার একলার পাপের ভারে তলিয়ে যাবে। এখনো সাবধান হও বলছি।

স্ত্রীর এবম্বিধ বাক্য ও ব্যবহার কীর্তিনারায়ণের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। সে বুঝিতে পারিল যে, স্ত্রীকে সে চিনিতে পারে নাই। কোন্ স্বামীই বা পারে? অথচ সকলেরই বিশ্বাস, আর কিছু না পারুক নিজের স্ত্রীকে সে বুঝিতে পারিয়াছে। যে দম্পতি দীর্ঘজীবন একত্র বাস করিল, তাহারাও পরস্পরকে চিনিতে পারে না। অতি-পরিচয় প্রকৃত পরিচয়ের অন্তরায়। তারায় তারায় ফাঁক আছে বলিয়াই তাহাদের আসলে চেহারাটা জানা যায়—আকাশ তারায় একলেপ্টা হইলে কাহাকে জানিতাম। চোখের কিনারের টলমলো একক জলবিন্দুটিকেই জানিতে পারা যায়—অগাধ সমুদ্র অজ্ঞেয়।

কীর্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—কিন্তু তুমি কেন এমন ক'রে বলছ?

জানালার বাহিরের আকাশের দিকে তাকাইয়া রুক্মিণী বলিতে লাগিল—আমি কেন এমন ক'রে বলছি, তা তুমি বুঝতে পারবে না জানি—কারণ এমন কথা আমার মুখে তুমি কখনো শোননি। তুমি ভেবেছিলে আমি এসে কাঁদাকাটি করবো, হাতে-পায়ে ধরবো, বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়ার কিংবা মার সঙ্গে কাশী চ'লে যাওয়ার ভয় দেখাবো—যেমন এতদিন হ'ত। কিন্তু না, আমার সহ্যের বাইরে গিয়েছে। মনে রেখো, সমুদ্র গভীর কিন্তু অতল নয়। চোখের জলেরও সীমা আছে।

বিস্মিত কীর্তিনারায়ণ স্ত্রী-চরিত্রের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত মূঢ়ের মতো বসিয়া থাকে।

রুক্মিণী বলিয়া চলে—আমি যদি তোমার হিতৈষী না হ'তাম, তবে সত্যিই হয়তো মার সঙ্গে কাশী চ'লে যেতাম—কিংবা এতদিন বাপের বাড়ি যেতাম। কিন্তু তুমি যেমনি হও না কেন, আমি তোমার মঙ্গল ছাড়া চাইনে। আমি কাশী যাবো না, বাপের বাড়ি যাবো না, কোথাও যাবো না—এখানেই থাকবো। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ এই যে, তোমার পাপের পথে বাধা দেওয়ার শক্তি আমার নেই—তোমার ভয়াবহ পরিণাম আমাকে শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।

এই অপ্রিয় আলোচনা অন্তত ক্ষণকালের জন্যও থামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কীর্তি বলিল—আচ্ছা মাকে না-হয় নিষেধ করলেই হবে।

রুক্মিণী বলিল—নিজের মাকেও চিনতে পারোনি দেখছি। তাঁর সবচেয়ে কোমল স্থানে, সবচেয়ে নিদারুণ আঘাত আজ করেছো। এখন তাঁর পায়ে গিয়ে পড়লেও আর তিনি থাকবেন না। তারপরে নিজের মনেই যেন বলিয়া চলিল—সংসারে আর কিছুই পাইনি, এমন শাশুড়ি পেয়েছিলাম যে মায়ের অধিক।

কীর্তি বলিল—তোমাদের জন্যে দেখছি জমিদারি ছেড়ে দিয়ে আমাকে সন্ন্যাসী হয়ে উঠতে হবে।

জানালার দুটা শিক দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রুক্মিণী বলিতে লাগিল—তোমাকে কেউ যেমন সন্ন্যাসী হ'তে বলেনি, তেমনি পরস্বাপহারী হ'তেও বলেনি, তোমর কি যথেষ্ট নেই যে, পরের জিনিসের উপরে তোমার এত লোভ? সবাই জানে, ওই অশত্থগাছটা ছ'আনির। ওটাতে তোমার কি দরকার ছিল? তুমি ভাবো, আমি কিছুই জান্‌তে পাই না, শুনতে পাই না। সব জানি, সব শুনি। এত জেনেছি, এত শুনেছি যে, চোখের জল তাতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। আজকার জন্যে আর কিছুই বাকি নেই।

এই অপ্রীতিকর আলোচনা কীর্তিনারায়ণের আর সহ্য হইতেছিল না, সে গোপনে কক্ষ হইতে পলায়ন করিল—রুক্মিণী জানিতেও পারিল না।

রুক্মিণী পূর্ববৎ বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপের অর্ধেক ভাগ আমি নেবো—কিন্তু বাকি অর্ধেকের

ভারেই যে তুমি ডুববে। সে চিন্তাতেও কি তোমার ভয় হয় না? চুপ ক'রে রইলে কেন? উত্তর দাও।

পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল ঘর শূন্য। সে বুঝিতে পারিল, নিতান্ত শূন্যতার কাছেই এতক্ষণ সে সমস্ত কথা নিবেদন করিতেছিল। তাহার আর সহ্য হইল না। সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। সে বুঝিল, এখন হইতে বিরাট এক সর্বশূন্যতার মধ্যেই তাহাকে দিন যাপন করিতে হইবে। সংসারে তাহার একমত্র আশ্রয় ছিল জননীস্বরূপা তাহার শাশুড়ি—এবারে তিনিও চলিলেন—আসন্ন শূন্যতার দুর্বহনীয় ভারে তাহার অন্তর পীড়িত হইতে লাগিল। যাহার আর কোনো সান্ত্বনা নাই, চোখের জলই তাহার সান্ত্বনা। কিছুক্ষণ আগেও তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল, সেই শেষ সান্ত্বনা হইতেও বুঝি সে বঞ্চিত হইল। কিন্তু এখন দেখিল সেই সজল সান্ত্বনা হইতে বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। বিধাতা নির্মম কিন্তু নির্দয় নহেন। চোখের জলের বিরজা নদীর পরপারেই তাঁহার বৈকুণ্ঠ। মরুভূমি সে পথের শেষ সত্য নহে।

আজ অম্বিকা দেবীর কাশীযাত্রার দিন। চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় প্রকাণ্ড একখানা পাল্কি সজ্জিত—আটজন বেহারা পাশে অপেক্ষা করিতেছে। জিনিস-পত্র, বাক্স, পেঁটরা আগেই মহিষের গাড়িতে স্টেশনে রওনা হইয়া গিয়াছে—স্টেশন বারো মাইল পথ। আঙিনায় বাড়ির আমলা, বরকন্দাজ, গ্রামের অনেকে, বালক, বৃদ্ধ ও রমণী সমবেত—সকলেই নীরব। কীর্তিনারায়ণের প্রতি তাহাদের মনোভাব যেমনি হোক, সকলেই অম্বিকা দেবীকে তাহাদের কর্তামাকে ভক্তি করিত, ভালো বাসিত। কীর্তিনারায়ণের অত্যাচার হইতে অম্বিকা দেবী যে সব-সময়ে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিত এমন নয়, তবে একটা সান্ত্বনার ক্ষেত্র ছিল—আজ তাহাও অপসারিত হইতে চলিয়াছে, কাজেই সকলেরই মুখ বিষণ্ণ।

আজ কয়েকদিন হইল রুক্মিণী তাহার শাশুড়ির সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিয়াছে, কাল সারারাত্রি তাহার পায়ের উপরে পড়িয়া ছিল। রুক্মিণী বলিয়াছিল—মা, ছেলে যদি অপরাধী হয় তাই ব'লে কি মেয়েকে দণ্ড দিতে আছে?

সে বলিয়াছিল—তুমি চ'লে গেলে এতবড় বাড়ি যে শূন্য হয়ে যাবে। আর তুমি তো জানো মা, তোমার ছেলে দুরন্ত। তোমার ভয়েই সে তবু সাম্‌লে চল্‌তো—এখন তাকে সামলাবে কে?

অম্বিকা দেবী বলিয়াছিলেন—মা, তুমি আমার মেয়ের মতো মেয়ে। আমার মেয়ে হয়নি, তুমি সে অভাব পূর্ণ ক'রে ছিলে। নিজের মেয়ে হ'লে এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারতো!

তারপরে বলিলেন—তোমাকে তো আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। তুমি আর-দশজনের মতো হ'লে একটা বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে যেতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-রকম দিতে চাইনে, আর দিলেও তোমার বিশ্বাস হ'ত না। তোমাকে সত্যি কথাই বল্‌বো।

এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—এখন আমার যাওয়াই উচিত। কীর্তি যখন নিজের মুখে কাশী যাওয়ার কথা বল্‌তে পারলো—তখন কি আর আমার থাকা উচিত।

রুক্মিণী বলিল—তোমাকে তো একেবারে যেতে বলেনি, কাশীদর্শন করতে যেতে বলেছে।

অম্বিকা বলিলেন—মা, তুমি বুদ্ধিমতী। কোন্ কথার কি অর্থ তা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারো। ও দুই একই কথা হ'ল। বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি ছেলের, তার যাতে অসুবিধা হয় তেমন কাজ করা কি উচিত। আমি থাকলে ওর অসুবিধা। তাইতো আমাকে সরিয়ে দেবার জন্যে কাশীযাত্রার ছল উঠিয়েছে—একি আমি বুঝি না!

রুক্মিণী বলিল—মা, তুমি গেলে যে ওঁর দৌরাত্ম্য আরো বাড়বে।

অম্বিকা বলিলেন—সে আমি জানি। কিন্তু আমি থেকেই বা কি বাধা দিতে পারছিলাম।

রুক্মিণী বলিল—কিন্তু মা, তুমি চল্‌লে—ফিরে এসে আর এই বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তির কিছুই দেখতে পাবে না।

অম্বিকা বলিলেন—সে কথাও আমি জানি। এ সমস্তই যাবে। কেমন যেন বুঝতে পারছি এ সমস্তর কিছুই থাকবে না। আজ এ সমস্ত যেন শেষবারের জন্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো কালকে সমস্ত চত্বরগুলো একবার দেখে এলাম।

একথা সত্য। গতকল্য চাবির গোছা লইয়া রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া অম্বিকা প্রকাণ্ড এই বাড়ির সমস্ত মহলগুলি একবার ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এক একটা করিয়া দালান খোলেন আর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকেন—তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে কক্ষটা বন্ধ করিয়া নূতন কক্ষের দ্বারোন্মোচন করেন। এই রকম দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এই রকম করিতে করিতে যখন তাঁহার পুরাতন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, যেখানে তিনি ও তাঁহার স্বামী দীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন যাপন করিয়াছেন, তখন বধূকে একটা কাজের ছুতায় প্রেরণ করিয়া সেই পুরাতন পালঙ্কের উপরে উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুধারা অবারিত করিয়া দিলেন। বধূ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া শাশুড়িকে সেই অবস্থায় দেখিয়া গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। শাশুড়ি জানিল না যে, তাহার অজ্ঞাত অশ্রুর একজন সাক্ষী রহিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ি উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া প্রস্তুত হইলে বধূও নিজের অশ্রু মুছিয়া প্রবেশ করিল। তিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে বধূ ধূলিমাখা সেই পালঙ্কের উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মা, এইখানে একটু বসি। অগত্যা যেন শাশুড়ি তাহার পাশে বসিলেন।

রুক্মিণী অতিশয় সন্তর্পণে পুরাতন স্মৃতির একটু সূত্র ধরাইয়া দিল আর অমনি শাশুড়ি সেই সূত্র অনুসরণ করিয়া পুরাতন দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন

অম্বিকা বলিলেন—ওই যে ওখানে একটা জানলার দাগ দেখছ, ওখানে একটা জানলা ছিল, কি ক'রে সেই জানলা বন্ধ হ'ল তবে শোনো। ওই

জানলার পাশে মস্ত একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। রাতের বেলায় সেই গাছে হুতুম এসে বস্তো আর সারারাত হুম হুম ক'রে ডাকতো। আমি তখন কেবল বিয়ে হয়ে এসেছি। ওই ডাকে আমার বড় ভয় পেতো। ঘুম ভেঙে যেতো। ঘুম ভেঙে গিয়ে খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ব'সে থাকতাম। কর্তাকে জাগাতে ভয় হ'ত, আবার লজ্জাও কম হ'ত না। একদিন ওইভাবে পুঁটুলিটার মতো ব'সে আছি এমন সময়ে কর্তা ঘুম ভেঙে সেই অবস্থায় আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—অমন ক'রে আছো কেন? আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না, কেবল আঙুল দিয়ে কাঁঠাল গাছটার দিকে দেখালাম। কর্তা প্রথমে বুঝতেই পারেন না—শেষে বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন। আমার সে কি লজ্জা! অবশেষে তিনি উঠে হুতুমটাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর দিনে হুকুম দিয়ে কাঁঠাল গাছটা কাটিয়ে দিলেন। লোকে জিজ্ঞেস করলো, অত দিনের গাছটা কাটলেন কেন? তিনি আর আসল কথা প্রকাশ করলেন না, পাছে আমি লজ্জা পাই, বল্লেন শয়নঘরের পাশে বড় গাছ থাকলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়!

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু জানলা বন্ধ হ'ল কেমন ক'রে?

অম্বিকা বলিলেন—ব'সো মা, বল্‌ছি। ওই দিকেই তো একটু দূরে মস্ত আমের বাগান। সেই মুখপোড়া হুতুমটা কাঁঠাল গাছ থেকে উঠে গিয়ে সেই আমবাগানে বস্তো আর ডাক্‌তো—হুম, হুম। আমি ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বোকার মতো ব'সে থাক্‌তাম। কর্তা বললেন, তোমার জন্যে আমবাগানটা কেটে ফেল্‌তে হ'ল দেখছি।

আমি বললাম—করো কি, তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? লোকে কি বল্‌বে? তখন তিনি এদিকের জানলা মিস্ত্রি ডাকিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন।

তারপরে বধূর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এখনো যে পূব বাগানের ফজলি আম খেতে পারছো সে আমারি দয়ায়। আমি সেদিন বাধা না দিলে ওখানে ফাঁকা মাঠ হয়ে যেতো।

বধূ বলিল—মা, যা খাচ্ছি সবই তো তোমার দয়ায়।

এই কথায় অম্বিকার চোখ ছল্ ছল করিয়া উঠিল। মানুষের মনে হাসি ও অশ্রু বড় ঘনিষ্ট প্রতিবেশী।

তারপরে শাশুড়ি উঠিয়া গিয়া দেয়ালের এক স্থানে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন—এই যে পেয়েছি। বধূ নিকটে আসিয়া শুধাইল—কি মা?

অম্বিকা বলিলেন—এই যে একটা দাগ—দেখতে পাচ্ছ?

রুক্মিণী একটু ঠাহর করিয়া দেখিল, দেয়ালের এক স্থানে একটু কাটা চিহ্ন—ধূলি পড়িয়া পড়িয়া প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

অম্বিকা দেবী বলিলেন—যেন নিজের মনেই—কতদিনের দাগ, এখনো মেলায়নি! তারপরে বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—একদিন পান পছন্দ না হওয়াতে কর্তা বিড়দানি সুদ্ধ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, দেয়ালে লেগে ঝন্ ঝন্ ক'রে প্রকাণ্ড বিড়দানি প'ড়ে গেল—দেয়াল কেটে চিহ্ন হয়ে রইলো। আমি সেই শব্দে ছুটে এলাম।

রুক্মিণী শুধাইল—হঠাৎ তিনি রাগ করতে গেলেন কেন? শুনেছি, তিনি মাটির মানুষ ছিলেন।

অম্বিকা স্বামীর প্রশংসায় গৌরববোধ করিয়া বলিলেন—ছিলেনই তো। যারা তাঁকে দেখেছে, তারা বুঝতেই পারে না, অমন মানুষের এমন ছেলে হয় কেমন ক'রে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তাঁহার মনে হইল, কথাটা বলা উচিত হয় নাই—রুক্মিণীর মনে লাগিতে পারে। তাই বলিলেন—কীর্তি আমার সব দিকেই ভালো, কেবল রাগটা একটু বেশি। একটু থামিয়া বলিলেন—তা পুরুষমানুষের একটু রাগ থাকা দরকার।

রুক্মিণী বলিল—মা, সেই বিড়দানির কথাটা বলো।

অম্বিকা বলিলেন—আমার সাজা পান ছাড়া কর্তার পছন্দ হ'ত না। আমি দু'বেলা প্রকাণ্ড বিড়দানি ভর্তি ক'রে পান সেজে রাখতাম, তিনি দুপুরবেলা শোবার সময়ে আর রাত্রিবেলা ঘুমের আগে খেতেন। সেদিন আমার হাতে

কি যেন কাজ ছিল, চিন্তা নামে আবার এক বাপের বাড়ির ঝি ছিল, তাকে বললাম—তুই পান সেজে রাখিস। সেই পান মুখে দিয়েই কর্তা বুঝলেন আমার সাজা নয়—আর বিড়দানি ছুঁড়ে মারলেন দেয়ালে।

অম্বিকার মনে হইল, সেদিনের কিছুই আর নাই—শুধু ওই তুচ্ছ চিহ্নটা এখনো রহিয়া গিয়াছে। সেই সুখের দিনের, আনন্দের দিনের, দাম্পত্যগৌরবের মহিমায় ভরা দিনের একমাত্র ভগ্নদূতের মতো ওই নগণ্য ক্ষতচিহ্নটা। সেই চিহ্নটার কাছে দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। তালায় আবার চাবি পড়িল। কেবল ধূলিমলিন সেই পালঙ্কের যেখানে তাহারা বসিয়াছিল, সেখানে তাহাদের উপবেশনের ছাপ অঙ্কিত হইয়া রহিল। ধূলা পড়িয়া সেই ছাপ দু'টি ঢাকিয়া যাইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিবে। তখন শাশুড়ি-বধূর এদিনকার অভিনয়ের আর কোনো চিহ্ন থাকিবে না।

রাত্রে শাশুড়ির পাশে শুইয়া পড়িয়া রুক্মিণী বলিল—মা, তুমি সেকালের পাথরে গড়া, এসব ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হ'লেও সইতে পারবে—কিন্তু মা, আমি যে মাটির মানুষ, আমর যে সহ্য হচ্ছে না।

অম্বিকা বলিলেন—মা, যেদিন বাপ-মায়ের কোল ছেড়ে এই বাড়িতে এসেছিলাম সেদিন কি কম কষ্ট হয়েছিল? আবার আজ এই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি—কষ্ট হচ্ছে বই কি! কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি এও সহ্য হবে। তোমারও সহ্য হবে মা। সহ্য করাতেই নারীর নারীত্ব, আঘাত করাতেই যেমন পুরুষের পৌরুষ।

তারপরে রাত্রি অনেক হইলে বধূ ও শাশুড়ি নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। কেহই ঘুমাইল না। দু'জনেই জানিল যে অপরে জাগ্রত—তথাপি কেহ কাহাকেও সচেতন করিল না। রাত্রির প্রবহমাণ কালো প্রহরের অনুগামী-ভাবে দুজনে দুইটি অশ্রুর বিনুনি রচনা করিয়া চলিল। সেই দুঃখের ছদ্মবেশী সুখরাত্রির অবসানে এক সময়ে প্রভাতের পাখীর ঐক্যতান বাজিয়া উঠিলে ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তাহারা শয্যাত্যাগ করিল। কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করিল না।

তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া অম্বিকা দেবী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া গেল। সকলেই বুঝিল; অনেকেই বলিল, কর্তা-মাতার গ্রামত্যাগ করাতে গ্রামের একটা পর্ব শেষ হইতে চলিয়াছে। মেয়েরা চোখ মুছিতে লাগিল, পুরুষেরা নীরব। এতক্ষণের গোলমালে লক্ষ্মীর কথা কাহারো মনে পড়ে নাই। অম্বিকা বলিলেন—আমার কাশীযাত্রার সেথো দাদুয়া কই?

তখন লক্ষ্মীর খোঁজ পড়িয়া গেল। অম্বিকার কাশী যাইবার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিয়াছিল যে, সেও দাদুয়ার সঙ্গে কাশী যাইবে। অম্বিকা বলিতেন, কাশী যে অনেক দূর। লক্ষ্মী বলিত—দূর হইল তো কি হইল? তুমি যাইতে পারিলে আমি পারিব না কেন? অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিতেন—মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? লক্ষ্মী উত্তর দিত—কতক্ষণই বা ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরিয়া আসিবে। লক্ষ্মীর ধারণা ছিল যে, দাদুয়া কখনোই দীর্ঘকাল বাড়ি ছাড়িয়া থাকিবে না, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যে একটা নূতন দেশ দেখবার এই সুযোগ কেনই বা সে ছাড়িতে যাইবে!

এমন সময়ে একজন আসিয়া খবর দিল যে, লক্ষ্মী পাল্কিতে চাপিয়া বসিয়া আছে। সকলে বুঝিল, আজ তাহাকে লইয়া মুস্কিল বাধিবে ইতিমধ্যে টোলের সারদা ঠাকুর আসিয়া বলিলেন—কর্তা-মা, এবারে উঠতে হয়—লগ্ন সমুপস্থিত। অম্বিকা উঠিয়া গৃহবিগ্রহকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া আদি বেলতলায় প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পাল্কিতে উঠিলেন। রুক্মিণী বাড়ির বধূ, সে এত লোকেরা সম্মুখে আসিতে পারে না। শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে গিয়া সে আছাড় খাইয়া পড়িল।

অম্বিকা পাল্কিতে চড়িয়া লক্ষ্মীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—দাদুয়া, এবার আসি?

লক্ষ্মী বলিল—আবার আসতে যাবে কেন—আমিও তো সঙ্গে যাচ্ছি।

অম্বিকা বলিলেন—সে কি হয় মা, সে যে অনেক দূরের পথ।

লক্ষ্মী বলিল—দূরের পথ তো কি হ'ল? হেঁটে যেতে হবে না।

অম্বিকা বলিলেন—কাশীতে কি ছেলেমানুষে যায়?

লক্ষ্মী হটিবার নয়, সে বলিল—কেন? কাশীতে কি ছোট ছেলেমেয়ে নেই?

সকলে হাসিয়া উঠিল। লক্ষ্মী নামিবার কিছুমাত্র ত্বরা দেখাইল না, দিব্য নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল। এদিকে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সেই চুলের ফিতেটার প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে জড়াইতে লাগিল। তাহাকে নামাইবার আর কোনো উপায় নাই দেখিয়া কীর্তিনারায়ণ অগ্রসর হইয়া আসিল, চোখ বড় বড় করিয়া একবার মাত্র ডাকিল, লক্ষ্মী! পিতার ডাকে কন্যার মুখ শুকাইয়া গেল। সে পিতার চোখের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পাল্কি ছাড়িয়া নামিল, অম্বিকা তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, সে ধরা দিল না, ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। কীর্তিনারায়ণ একটা শুষ্ক প্রণাম করিয়া কর্তব্য সারিল, মাতা তাহার মাথায় একবার হাত রাখিলেন। বেহারাগণ পাল্কি কাঁধে তুলিল। দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পূর্বে অম্বিকা একবার শেষবারের মতো আজন্মের বাড়িঘর দেখিয়া লইলেন। পাল্কি চলিতে লাগিল।

পাল্কির দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া গ্রামদৃশ্য দেখিতে দেখিতে অম্বিকা দেবী চলিয়াছেন। এই গ্রামে পঞ্চাশ বৎসরকাল কাটিয়াছে, তবু ইহার অধিকাংশই তাঁহার অদৃষ্ট। যতদিন বধূ ছিলেন, বাড়ির বাহির হন নাই। প্রৌঢ় বয়সে সংসারের কর্ত্রী হইবার পরে তাঁহার গতিবিধির পরিধি অনেকটা বাড়িয়াছিল—তৎসত্ত্বেও গ্রামের কতটুকুই বা তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু চোখে না দেখিলেও সমস্তই তাঁহার কত পরিচিত। প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি বাড়িঘর, প্রত্যেকটি লোকের চেহারা ও ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধিগত।

দেউড়ি পার হইতেই অম্বিকা দেবীর চোখে পড়িল দশানির অতিথিশালা। কত পরদেশী লোক সেখানে আসিয়া বাসাহার পাইয়া থাকে। তখনি একজন পথিক ছাতির সহিত একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া অতিথিশালার রোয়াকে আসিয়া উঠিল। তারপরেই ওই যে গোয়ালঘর—গোরুর পাল মাঠে চরিতে গিয়াছে—কেবল দুটা গাই দাঁড়াইয়া শুষ্ক বিচালি চিবাইতেছে। গোয়ালঘরের পরেই

পিলখানা। হাতীটা দাঁড়াইয়া আছে—অম্বিকার মনে হইল, তাহার চোখে যেন জলের ধারা।

অম্বিকা দেবী চমকিয়া উঠিলেন—এই সেই বট! আহা, শীতের রোদ্দুরে জট মেলিয়া দিয়া সমস্ত গাছটা যেন চোখ বুঁজিয়া আরাম করিয়া রোদ পোহাইতেছে। সম্পূর্ণ গাছটা কখনো তিনি দেখেন নাই—ছাদের উপর হইতে তাহার মাথাটা দেখা যাইত। আর ওই যে আমবাগানের মধ্যে ছুতোরপাড়া। এত কাছে—তাঁহার ধারণা ছিল না-জানি কতই দূরে। ছুতোরদের ঠক ঠক করিয়া কাঠ কাটিবার শব্দ শীতের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তিনি শুনিয়াছেন। ওই শব্দটা শুনিতে তাঁহার বড় ভালো লাগিত। সেই যে ছেলেবেলায় রূপকথার তেপান্তরে রাজপুত্রের কাহিনী শুনিয়াছেন, তাহার অশ্বক্ষুরের ধ্বনি বলিয়া মনে হইত ছুতোরপাড়ার ওই ঠক ঠক আওয়াজকে! আর ওই যে বাদামতলার মুচির ঘর। তিলক বারান্দায় বসিয়া একটা ঢোলক মেরামত করিতেছে। তিলক তাঁহার খুব পরিচিত। যেদিন তাহারা ঘরে অন্নাভাব হইত, সে বিনা নোটিশে দশানির পাকশালার আঙিনায় গিয়া পাত পাতিয়া বসিয়া যাইত; বলিত—কর্তা-মা, প্রসাদ পেতে এলাম। অম্বিকা বলিতেন—এসেছিস্ বাবা, বোস্, বোস্। ও ঠাকুর, তিলক এসেছে, ওকে দেখে-শুনে দিয়ো।

হঠাৎ পাল্কির ডানদিকে একটা হল্লা শুনিয়া সেদিককার দরজা ফাঁক করিলেন, দেখিলেন ইস্কুলের টিফিনের ছুটি হইয়াছে, ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চোখে পড়িল—ঘোষেদের পেটরোগা বিশুকে! মা-মরা ছেলে। তাহার মায়ের মৃত্যুর পরে অনেকদিন তিনি বিশুকে মানুষ করিয়াছিলেন। অম্বিকা ভাবিলেন, বিশু এরি মধ্যে ইস্কুলে আসিয়াছে। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল ছেলেটাকে একটু কাছে আনিয়া আদর করেন। কিন্তু তাহা হইবার নয়—তিনি যে বড়ঘরের গৃহিণী, নিজের ইচ্ছামতো সব কাজ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল—লোকে কেন বড়লোককে সুখী মনে করে!

পাল্কি বাজারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অন্য পথে চলিল—এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িল। ওই যে তিনু গোয়ালা বাঁকে করিয়া দুধ লইয়া চলিয়াছে—দশানির বাড়ির জন্য। ও আজ কুড়ি বৎসরের অধিক দশানির বাড়ি দুধ জোগাইতেছে। এত বেলাতে! অম্বিকার মনে হইল বিলম্বের জন্য কতবার তিনি তিনুকে ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন। তিনু কখনোই রাগ করিত না। অম্বিকাকে দেখিলেই বলিত—দণ্ডবৎ হই কর্তা-মা! অম্বিকা যদি বলিতেন—তোর এত দেরী হ'ল কেন রে? তিনু বলিত—কর্তা-মা, জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার। ওই ছিল তার শেষ ও শ্রেষ্ঠ যুক্তি। অধিক কিছু বলিত না। অম্বিকার মনে হইল, আহা ও কত সুখী, ও গিয়া অনায়াসে দশানির দেউড়িতে প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাঁহার আর—। ওই যে রামহরি হরকরা থলি-ভরা চিঠিপত্র লইয়া গ্রামে চলিয়াছে। এতক্ষণ হাঁটিতেছিল, পাল্কি দেখিয়া ছুটিবার ভাণ করিতেছে। ওর থলি না-জানি শুভাশুভ কত সংবাদে পূর্ণ!

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামের মানব-সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল—তখন রহিল কেবল চারিদিকে অবারিত চাষের ক্ষেত—সরিষার ফুলে দিগন্ত অবধি পীতাভ। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, আর একদিন কবে যেন এমনি সরষে ফুলের পীতিমা। দেখিয়াছিলেন! কবে? কোথায়? ওঃ তাই বটে! সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা! তখন তাঁহার বয়স ছিল নয়, সেদিন তিনি নূতন বধূ-রূপে চেলি পরিয়া, ঘোমটা টানিয়া এই পথেই, এমনি ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেতের আল ভাঙিয়া, পাল্কি চড়িয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিতেছিলেন। সে আজ কত দিনের, কত বৎসরের কথা। আজও আবার সেইখানেই তেমনি ভাবে পাল্কি চড়িয়া চলিয়াছেন। একই পথ, তবু কত প্রভেদ! সেদিনও চোখে তাঁহার অশ্রু-যবনিকা ছিল, আজও সেই অশ্রু-যবনিকা! দুই দিগন্তের দুই অশ্রু-যবনিকার মধ্যবর্তী অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী তাঁহার জীবনখণ্ড বিস্তৃত। সেই জীবনের অধীশ্বরী অশ্রুর-ঘোমটা-টানা দিগন্তের পরপারে আজ কোথায় চলিয়াছেন। তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। বিদায়ের

পূর্বে কঠোর সংযমে যে বন্যাকে তিনি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—এখন তাহা বাঁধ ভাঙিয়া নামিল।

হঠাৎ পাল্কির কোণে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন—ন্যাকড়ায় জড়ানো কি যেন একটা নড়িতেছে। হাতে তুলিয়া দেখিলেন, অস্ফুটচক্ষু একটা বিড়ালছানা! লক্ষ্মীর বিড়ালছানা। সে যে পাল্কীতে উঠিয়াছিল, নামিয়া যাইবার সময়ে বিড়ালছানাটিকে রাখিয়া গিয়াছে। তাহার দাদুয়ার উদ্দেশে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বিড়ালছানাটি লক্ষ্মীর বড় আদরের ছিল। কাহাকেও ছুঁইতে দিত না, কাহাকেও কাছে যাইতে দিত না, নিজের হাতে সল্‌তে করিয়া দুধ পান করাইত, নিজের বিছানার পাশে শোয়াইত। কেহ চাহিলে লক্ষ্মী মারিতে যাইত, কেহ লুকাইয়া রাখিলে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিত।

কেবল তাহার এক ক্ষোভ ছিল যে, তাহার দাদুয়া এমন সুন্দর বিড়ালছানাটিকে কথনো কোলে লইয়া আদর করেন না। লক্ষ্মী বলিত—দাদুয়া, একবার কোলে নাও না। এই বলিয়া তাঁহার কোলে দিতে যাইত।

অম্বিকা বলিতেন—দূর, দূর, আমাকে আবার স্নান করাস্ না।

লক্ষ্মী বড় রাগ করিত। বলিত—আর কাউকে ছুঁতে দিই না, তোমার কোলে যে দিতে যাচ্ছি, তোমার ভাগ্যি!

অম্বিকা বলিতেন—সরিয়ে নিয়ে যা বাপু। ছুঁলে এখন অবেলায় আমাকে স্নান করতে হবে।

সেই বহু-আদরের বিড়ালছানাটি লক্ষ্মী তাহার বালিকাহৃদয়ের গোপন দানের মতো সকলের অজ্ঞাতসারে পাল্কির মাধ্য রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। সে খুব-সম্ভব ভাবিয়াছিল, দাদুয়া এবারে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে লক্ষ্মী তাহাকে কতখানি ভালোবাসে!

যে-বিড়ালছানাটিকে আগে কখনো স্পর্শ করেন নাই এখন তাহাকে সাগ্রহে কোলে টানিয়া লইয়া অম্বিকা দেবী জড়াইয়া ধরিলেন। চোখের জল দ্বিগুণ বেগে নামিল। বিড়ালছানাটি তাঁহার কোলের মধ্যে নীরবে

পড়িয়া রহিল, শব্দ করিল না, নড়িল না—সে কি অম্বিকার দুঃখের ভূমিকা বুঝিতে পারিতেছিল? অম্বিকার অশ্রু পড়িয়া বিড়ালছানার মাথা ভিজিয়া যাইতে লাগিল? পাল্কি চলিতেছে—বেহারাদের সুর-সংযত ধ্বনিতে বিশ্বের সমস্ত বেদনা ঘনীভূত হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাল্কি চলিতেই লাগিল।

১

যখন জোড়াদীঘি গ্রামে এই পারিবারিক বিবাদ সর্পিল গতিতে চলিতেছিল তখন বাহিরের জগতে তাহায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছিল না মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে। জোড়াদীঘির জমিদারের অনুচরেরা যখন রক্ত ঢালিতেছিল, জোড়াদীঘির জমিদারদের পরিবারবর্গ যখন অশ্রু ঢালিতেছিল, তাহাদের সমান্তরভাবে একটি রজতধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছিল। সেই ক্ষীণ ধারা জোড়াদীঘির উৎস হইতে বহির্গত হইয়া মহকুমা-আদালত, সদর-আদালত হইয়া বর্ধিত আয়তনে উচ্চ আদালত পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে—যে মহাসমুদ্রে বাঙলাদেশের সমস্ত রজত-প্রবাহিণী, রক্ততরঙ্গিণী, অশ্রু-স্রোতস্বিনী আসিয়া পর্যবসিত। এই ত্রি-প্রবাহিণী-স্রোতে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই—মানুষকে দেউলিয়ার কূল পর্যন্ত না লইয়া গিয়া ইহারা ছাড়ে না। জোড়াদীঘির দুই শরিক যুগপৎ এই প্রবল স্রোতে পড়িয়া গেল। প্রথমে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষিত হইত, কে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে। নিজেদের গতিবেগ-বৃদ্ধির জন্য স্রোতের টানের সহায়করূপে বৈঠা ফেলা, লগি মারা, পাল তোলা ও গুন টানিবার উৎসাহের অভাব হইত না। প্রত্যেক পক্ষই ভাবিত, আমি আগে গিয়া কূলে উঠিব! সর্বনাশের স্রোত কবে সার্থকতার কূলে তুলিয়া দেয়? কিন্তু অনেক সর্বনাশ আছে, চরম মুহূর্ত ছাড়া বুঝিতে পারা যায় না। আর বুঝিতে পারিলেও টান তখন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিবার পথ বন্ধ। অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ছাড়া

তখন আর গত্যন্তর থাকে না। তটস্থ ব্যক্তি ভীত বিস্ময়ে এই সর্বনাশের প্রতিযোগিতা দেখিতে থাকে—ভাসমান ব্যক্তি জড়বৎ নির্ভীক জড়ের আবার ভয় কি ?

জোড়াদীঘির দশানি ও ছ'আনিতে প্রবল মামলা বাধিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীর দল স্বর্ণ-সুযোগ দেখিয়া নাচিয়া খাড়া হইল। তাহাদের আদর-আপ্যায়নের অন্ত নাই। আদালতের ভাষায় সাক্ষী নারায়ণ। কিন্তু আসল নারায়ণ নির্বিকার। তাহাকে ষোড়শোপচার দিলেও খুশি, না দিলেও বিরাগ প্রকাশ করে না। কিন্তু সাক্ষীনারায়ণদের প্রকৃতি ভিন্ন। মুখর দেবতাদের সন্তুষ্ট করা সামান্য মানুষের কর্ম নয়। দু'পক্ষের সাক্ষীর দল তারিখে তারিখে মহকুমা-আদলতে হাজিরা দিতে লাগিল। যাহারা সারাজীবন হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত, তাহারা সামাজিক মান অনুসারে গাড়ি-পাল্কী দাবী করিল। গোরুর গাড়িতে চাপিলে নাকি তাহাদের কোমরে ব্যথা হয়, কাজেই পাল্কি ও এক্কার ব্যবস্থা করিতে হইল। চিঁড়া-দইয়ে যাহারা তৃপ্ত, তাহারা এক্ষণে কাঁচাগোল্লা ছাড়া অন্য কিছু খায় না, রসগোল্লা নাকি গলায় বাধিয়া যায়। এ রকম অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া গেলে সাক্ষ্যদান করিতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া বাবুরা নীরবে কাঁচাগোল্লা জোগাইয়া যাইতে লাগিল। ফল কথা জোড়াদীঘির অনেকেরই এই উপলক্ষে খোড়ো ঘর টিনের হইল, টিনের ঘর পাকা হইল, পাকা ঘরের আয়তন বর্ধিত হইল।

ওদিকে মহকুমার উকিল-মোক্তারগণ তালি-মারা তেলে-মলিন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া নূতন চাপকান কিনিল, অনেকেরই দু'চার বিঘা ভূসম্পত্তি বাড়িল। সদর আদালতে উকিলবাবুরা অপেক্ষাকৃত অভিজাত, তাঁহাদের লাভের অঙ্ক চাপকানে প্রকাশিত না হইয়া ব্যাঙ্কে অঙ্কুরিত হইয়া চক্রবৃদ্ধির সুদে নিত্য নূতন পল্লব বিকাশ করিতে শুরু করিল। আজকাল বড় মামলা বড় একটা জোটে না বলিয়া সদরের উকিলেরা বিষণ্ণ। তাঁহারা অভাবিতভাবে এই মামলাটিকে পাইয়া অনেক দিনের হারানো শিশুর মতো আদরে কোলে তুলিয়া

লইয়া নাচাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় শিশুটি পূর্ণিমামুখী চন্দ্রকলার মতো তিথিতে তিথিতে বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া একদিন শুভ প্রাতে উচ্চ আদালতে গিয়া উপনীত হইল।

উচ্চ আদালত! সে যে দুস্তর পারাবার। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ি, তেমনি উচ্চ, তেমনি নিরেট, কাণ্ডজ্ঞান ও সত্যের পক্ষে সমান দুর্ভেদ্য। সেখানে বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টারের দল নিয়মিত গতিতে চলাফেরা করেন, তাঁহাদের দেহ বিদ্যা ও মেদের স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এক-একজন বড় ব্যারিস্টার যেন এক-একখানি মানোয়ারি জাহাজ, তাঁহার আগে পিছে জুনিয়ারের দল ডেস্ট্রয়ার জাহাজস্বরূপ, মুহুরির দল ইউ-যোটের মতো নিশুব্ধ, সতর্ক; নবীন উকিলগণ সিন্ধুশকুনের মতো লুব্ধ সঞ্চরণশীল; আর হতভাগ্য মক্কেল খালাসীর মতো প্রত্যেকের প্রচণ্ড জঠরানলে সাধ্যাতীত ক্ষিপ্রতায় কয়লা নিক্ষেপ করিতেছে—নিছক কয়লা হইলে তত আপত্তি হইত না। আর এই নক্র-কুম্ভীর-চোরাপাহাড়সঙ্কুল পারাবারের বাতিঘর-স্বরূপ বিরাজমান 'মি-লর্ড' জজের দল। তাঁহারা জাগিয়া ঘুমান, ঘুমাইয়া শোনেন, গভীর গবেষণার প্রয়োজন হইলে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া কড়িকাঠ পর্যবেক্ষণ করেন; হাইকোর্টের সরস্বতী টিকটিকির মতো কড়িকাঠে লেপটিয়া বিরাজমানা। আর অন্নহীন উকিলের দল চারিদিগের চকমিলানো বারান্দায় অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধীত বিদ্যা ও ভুক্ত খাদ্য পরিপাক করিতে চেষ্টায় নিরত। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পাক-খাওয়া শেষ হইলে শূন্য উদরে গড়ের মাঠের ক্ষুধোদ্রেককারী হাওয়া খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন। হায়রে, নবীন উকিলের দল প্রাত্যহিক এই পাকচক্রপথে ভ্রমণ না করিয়া সরল পথে চলিলে এতদিন তাঁহারা আমেরিকা গিয়া পৌছিতেন! ওয়ার্ল্ড টুরিস্ট বলিয়া খ্যাতি রটিত, কাগজে ছবি উঠিত এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে পারা যায়, তাঁহাদের অন্নহীনতারও একটা সমাধান হইয়া যাইত।

ফল কথা, জোড়াদীঘির মামলা জারি, গরজারি, মোশান, আপীল, ছানি, রিভিউ প্রভৃতির কুটিল পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল—মহকুমা

হইতে সদরে, সদর হইতে কলিকাতায়। সর্বনাশ প্রহরে প্রহরে আপন মূর্তি ক্রমে প্রকাশ করিতে থাকিল।

২

গ্রামে বসিয়া মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির সুবিধাজনক হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া নবীননারায়ণ মুক্তামালাকে সঙ্গে করিয়া সদরে আসিয়া বাসা করিল। পদ্মার ঠিক উপরেই বাড়িটি।

একদিন সকালবেলা নবীননারায়ণ তাহাদের এস্টেটের পুরাতন উকিল তারিণীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তারিণীবাবু প্রবীণ উকিল। অনেক টাকা জমাইয়াছেন, কিন্তু কথাবার্তায় ও আচারব্যবহারে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পায় না। সেজন্য লোকটার কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি আছে। শহরের ছোট একটি গলিতে তারিণীবাবুর বাড়ি। বাড়িটি শহরের প্রাচীনতার একটি সাক্ষী। লোকে যখন রোদ-হাওয়াকে মানুষের শত্রু বলিয়া মনে করিত বাড়িটি তখনকার পরিকল্পনায় গঠিত। ছাদ নীচু, জানালা ছোট, কাঠের গরাদে, মেঝেতে সিমেণ্ট নাই, দরজায় ও চৌকাঠে অন্য রঙের অভাবে পুরু করিয়া আলাকৎরা মাখানো। বাড়ির বাহিরের ঘরে কেরোসিন কাঠের টেবিল ও খান দুই-তিন চেয়ার পাতিয়া তারিণীবাবু সেদিনকার আদালতের নথিপত্র দেখিতেছেন। তাঁহার পাশে জন দুই মুসলমান মক্কেল চেয়ারে উপবিষ্ট, আর জন দুই বসিবার স্থানের অভাবে পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের এক পাশে জীর্ণ তক্তপোষের উপরে তারিণীবাবুর মুহুরি খানকতক নথিপত্র লইয়া নাড়িতেছে, পাশেই একজন মক্কেল, তাহার সহিত অপরের অশ্রুতিগম্যভাবে কি যেন বলিতেছে। তক্ত-পোষের একধারে মলিন বিছানা। দেয়ালের কাছে একটি দড়ি টানানো, তাহার উপরে খান দুই কাপড়-গামছা। ঘরের অপর দিকে গোটা কয়েক তারের ফাইল, কাগজের স্তূপে পীড়িত। তারিণীবাবুর নিজের চেহারাও জীর্ণতায় এই বাড়ির অনুরূপ। মাথার চুল রুক্ষ, মুখে চোখে শিকারী বিড়ালের

সতর্ক দৃষ্টি ও সাদা পাকা গোঁফ, নাকে নিকেলের চশমা, কোঁচার খুট গায়ে, পায়ে খড়ম।

তারিণীবাবুর কৃপণ অপবাদের কথা বলিয়াছি। তাঁহার স্ত্রী চিররুগ্ণ, বাড়িতে পোষ্য অনেকগুলি, কাজেই একজন পাচক ছাড়া চলে না। পাচকের বেতনে তাঁহার তত আপত্তি নাই, কিন্তু সাধারণত পাচকগণের দোষ এই যে, রন্ধনের উপকরণ হিসাবে ঘৃত, তৈল, গরমমশলা প্রভৃতি দুর্মূল্য বস্তু দাবি করিয়া থাকে। সেইজন্য তারিণীবাবু শহরের উড়িয়া বামুনদের আড্ডায় গিয়া উৎকল দেশ হইতে সদ্য-আগত ব্রাহ্মণবটু আনিয়া কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সুবিধা। বালক বলিয়া বেতন অল্প, আর রন্ধনে অনভিজ্ঞ বলিয়া ঘি তেল প্রভৃতির ব্যবহার জানে না। ব্রাহ্মণবটুরাও প্রথম কিছুদিন জল ও অগ্নির সাহায্যে পাককার্য সমাধা করে। কিন্তু সংসর্গদোষ অচিরে দেখা দেয়। কিছুদিন পরে তাহারা ঘি ও তেল দাবি করিলে তারিণীবাবু তাহাদের ডিসমিস করেন। করিয়া আবার নূতন বটু সংগ্রহ করেন। কাল নিরবধি, তেমনি উড়িষ্যার ব্রাহ্মণবটুর সংখ্যাও অল্প নহে, এক রকম করিয়া চলিয়া যায়, বিশেষ অসুবিধা হয় না।

নবীননারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া তারিণীবাবুকে প্রণাম করিল। তারিণী-বাবু অমনি লাফাইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই যে বাবা নবীন। এসেচ, ভালো হয়েছে। আরে গ্রামে থেকে মামলা চালানো যায়! রামঃ। আমি কতবার তোমার নায়েব যোগেশকে বলেছি—আরে ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দাও। এখানে শহরের সঙ্গ-সহবৎও ভালো, আবার তদ্বির করবারও সুবিধে। তা ওদের ইচ্ছা, বাবুরা যাতে শহরে না আসেন। তোমরা গ্রামে ব'সে থাকলে ওদের পোয়াবারো, নয়-ছয় করতে পারে, কেবল আমার ভাগ্যে ঢন্ ঢন্! এই বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা বার-কতক নাড়িলেন।

নবীননারায়ণের অভ্যর্থনার আতিশয্য দেখিয়া উপবিষ্ট মক্কেলদ্বয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সুযোগে নবীনকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া তারিণীবাবু বসিলেন। চেয়ারের সংখ্যা বাড়িল না, কাজেই দণ্ডায়মানের সংখ্যা বাড়িল।

তারিণীবাবু শুধাইলেন—তা বাসা নিলে কোথায় ?

নবীন বলিল—গোয়ালপাড়ায়।

তারিণীবাবু বলিলেন—বেশ হয়েছে, পদ্মার খোলা হাওয়া পাবে। বৌমাও তো সঙ্গে এসেছেন ?

নবীন বলিল—হাঁ।

তারিণীবাবু খুশি হইয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, স্থির হয়ে কিছুকাল ব'সো। ছটফট করলে মামলা হয় না—এ-ও একপ্রকার সাধনা।

তারিণীবাবু মিথ্যা বলেন নাই। পঞ্চ মকারের মধ্যে মোকদ্দমা অন্যতম। আর ফৌজদারি মামলার প্রতিষ্ঠা তো পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরেই। তা ছাড়া ফৌজদারি, দেওয়ানি দুই প্রকার মামলাতেই মানুষে বাধ্য হইয়া কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে শেখে।

তারিণীবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—হাঁ, মামলা করতে জানতেন তোমার বাপ! তুমি তো তাঁরই সন্তান। আমি যখন শুনলাম যে তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে পড়াশুনো নিয়ে সময় নষ্ট করতে আরম্ভ করলে, ভাবলাম—নাঃ, ছেলেটা বয়ে গেল। এবারে জমিদারি সব নষ্ট হয়ে যাবে। কতদিন আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি—ঠাকুর, ছেলেটার সুমতি দাও, পৈতৃক ধারা ফিরে পাক্‌! তা ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন দেখছি।

নিজের প্রার্থনার সার্থকতায় পুলকিত হইয়া বলিলেন—শুনবেন না? তোমাদের বাড়ির আমি কত কালের উকিল!

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—বাবা, জমিদারি-যজ্ঞের আমরাই পুরোহিত।

নবীনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এবারে মানুষের মতো মানুষ হ'তে চল্‌লে।

এই বলিয়া গোটা দুই গোঁফ টানিয়া তুলিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণেই হাওয়ায় ছাড়িয়া দিলেন।

—আজ কি আছে? একটা মোশন? না?—কোনো ভয় নেই। দাঁড়াও না, দশানিকে মজা দেখিয়ে ছাড়ছি!

তারপরে মুহুরিকে ডাকিলেন—বিজয়, ছ'আনির মোশানের নথি ঠিক আছে তো? এই যে ছ'আনির বাবু নিজে এসেছেন।

বিজয় ইতিপূর্বে নবীননারায়ণকে দেখে নাই—তবে তারীণীবাবুর কথাবার্তায় কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এখন পরিচয় পাইবামাত্র তক্তপোষ হইতে একলাফে নামিয়া আসিয়া নবীনকে প্রণাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল।

তারিণী বলিল—ছোকরার বয়স অল্প, কিন্তু চালাক-চতুর, বেশ চটপটে; যেমন কথায়, তেমনি কাজে।

তারিণীবাবু এই বালক মুহুরিটিকেও ব্রাহ্মণবটুর সংগ্রহরীতিতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উকিল ও মুহুরির মধ্যে কে বেশি চালাকচতুর বলা সহজ নয়। একের হাতে অপরের টাকা পড়িলে তলাইয়া যায়। ফল কথা, দুইজনেই রজতকাঞ্চনের পরমহংস, হাতে টাকাকড়ি পড়লে আঙুলগুলি আপনিই বাঁকিয়া আসে। তবে প্রভেদের মধ্যে এইটুকু যে, বিজয়ের সম্মুখে আজিও ভবিষ্যৎ প্রসারিত, সে ভাবে এখনো কত হইবে। তারিণীবাবুর পশ্চাতে অতীত লম্বমান—তিনি ভাবেন, কিছুই হইল না।

তারিণীবাবু নবীনকে বলিলেন—যাও বাবা, খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসো গে—এখান থেকে আমার সঙ্গেই যাবে। আমি ততক্ষণ হাতের কাজটা সেরে নিই।

নবীন মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিল, লোকে মামলা করিতে যায় কেন? তখন ঘরের মধ্যে তারিণীবাবু ভাবিতেছিলেন, লোকে মামলা না করিয়া বেস্ খেলিয়া, বই কিনিয়া, সদাব্রত করিয়া টাকা নষ্ট করে কেন?

নবীন আহারাদি শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তারিণীবাবু আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার পরনে একটি জিনের জীর্ণ প্যাণ্ট, নিজস্ব আকৃতি হারাইয়া অনেকদিন হইল তাহা তারিণীবাবুর নিম্নার্ধের আকার পাইয়াছে, গায়ে গলাবন্ধ কালো কোট; দুই পকেট নথির ভারে স্ফীত,

পায়ে তালি-মারা ডার্বি শু। বাড়ির সম্মুখে একখানি ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

তারিণীবাবু বলিয়া উঠিলেন—এই যে বাবা এসো, ওঠো ওঠো, উঠে পড়ো।

নবীন গাড়িতে উঠিল। তারিণীবাবু ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে গেলেন, বাহিরে আসিলেন, আবার গেলেন, আবার বাহিরে আসিলেন; এই রমক বার কয় আনাগোনা করিয়া, ছটফট করিতে করিতে অবশেষে তিনি গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি চলিতে শুরু করিলে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—বিজয়, তুমি করিমপুরের মক্কেলদের নিয়ে অন্য গাড়িতে এসো।

এই বলিয়াই গাড়ির সিটে হেলান দিয়া মুহূর্ত মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। নবীন বুঝিল, তাহার এস্টেটের প্রবীণ উকিলবাবুর ইচ্ছানিদ্রা। নবীনের মানবচরিত্র বুঝিতে এখনো অনেক বাকি।

শহর হইতে আদালত দুই মাইলের পথ। তারিণীবাবু প্রত্যহ এই পথটুকু যাতায়াত করিবার সময়ে ঘুমাইয়া লন। এই সময়ে ঘুমাইবার অনেক সুবিধা। প্রথমত আহারান্তে বিশ্রাম হয়, দ্বিতীয়ত শহরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে দর্শকগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা করে, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না; তৃতীয়ত প্রত্যেক মক্কেলের নিকট হইতেই স্বতন্ত্রভাবে তিনি যাতায়াতের যে ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন ঘুমের মধ্যে তাহা ভুলিবার প্রশস্ত সময়, কারণ আদালতে নামিয়াই তিনি এক দৌড়ে এজলাশে চলিয়া যান, তাঁহার সহগামীদের একজনকেই নূতন করিয়া আবার ভাড়া চুকাইয়া দিতে হয়।

গাড়ি আদালতের বটতলাতে পৌঁছিবামাত্র তারিণীবাবু ঘুম ভাঙিয়া একলাফে নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, নবীন গাড়ির ভাড়া চুকাইয়া দিল।

নবীন তারিণীবাবুকে খুঁজিতে লাগিল, অবশেষে দেখিতে পাইল তিনি জজ-কোর্টের বারান্দায় জন দুই মক্কেলকে সঙ্গে লইয়া স্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের নিকট হইতে স্ট্যাম্প কিনিতেছেন। সে পিছনে দাঁড়াইল।

তারিণীবাবু মক্কেলদ্বয়কে হিসাব বুঝাইতেছেন, বলিতেছেন—সোয়া বারো

আনার তিন খানা, দশ পয়সার পাঁচ খানা—হ'লো গিয়ে, হ'লো গিয়ে চার টাকা ছ' আনা ; পেস্কার বাবু দুই টাকা, নাজির সাহেব চার টাকা, হ'লো দশ টাকা বারো আনা ; আর গাউন ফি—পাঁচ টাকা, তাহ'লেই হ'লো চার আনা কম ষোল টাকা। আমার ফি না হয় পরেই দিয়ো।

গোলমাল বাধিল ওই 'গাউন ফি' ব্যাপারটাতে। মক্কেলদ্বয় গাউন ফি-র ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা বলিল—বাবু, গাউন ফি আবার কি ? ওই ফি তো কখনো দিইনি।

তারিণীবাবু বলিলেন, জজ সাহেবের কাছে কখনো মামলা করেছ ? তাই দাওনি।

তাহারা তখনো না বুঝিতে পারিয়া বলিল—সেটা আবার কি ?

তারিণীবাবু তাহাদের ডাকিয়া লইয়া জজের এজলাশের দরজায় দাঁড়াইলেন। জজ সাহেবের সম্মুখে কয়েকজন উকিল গাউন পরিয়া মামলার সওয়াল জবাব করিতেছিল। তারিণীবাবু তাহাদের গায়ের গাউন দেখাইয়া বলিলেন—ওইগুলোকে গাউন বলে।

একজন বলিল—ওই যে নীল আলখাল্লা ?

তারিণীবাবু হাসিয়া বলিলেন—আলখাল্লা নয়, গাউন। তোমাদের মামলার সময়ে ওই জিনিস আমাকে প'রে দাঁড়াতে হবে।

অপর একজন বলিল—তার আর দরকার কি ? আপনি কোট গায়ে দিয়েই দাঁড়ান, আমরা গরিব মানুষ।

তারিণীবাবু বলিলেন—মিঞা সাহেব, তোমরা গরিব মানুষ নও, ছেলে-মানুষ! গাউন গায়ে দিয়ে না দাঁড়ালে জজ সাহেব আমার কথা কানেই তুলবেন না।

তখন অপর জন বলিল—ওই বাবুদের কাছে থেকে চেয়ে-চিন্তে নেন না—

তারিণীবাবু বলিলেন—তার উপায় নেই, সাহেব। ওই গাউন থাকে জজ সাহেবের নিজের হেফাজতে। ও জিনিস বিলাত থেকে আসে—একেবারে মহারানীর নিজের হাতের শিলমোহর করা। দরখাস্ত ক'রে বের করতে

হয়—দরখাস্তের সঙ্গে নগদ পাঁচ টাকা জমা দিতে হবে। দাও, দাও, আর দেরি হ'লে অন্য উকিলবাবুরা বের ক'রে নেবে, আমি পাবো না, তোমাদের মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে। দাও, শীগগির।

অগত্যা তাহাদের একজন দুইখানি দশটাকার নোট বাহির করিল। অমনি তারিণীবাবু তাহার হাত হইতে নোট দু'খানি একপ্রকার ছোঁ মারিয়া লইয়াই মুহূর্ত মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে মক্কেলদের সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন তাহারা যেন ইতস্তত না ঘুরিয়া একটা বটগাছতলাতে গিয়া বিশ্রাম করে। একটা বট গাছও নির্দেশ করিয়া দিলেন।

নবীন তারিণীবাবুর অপূর্ব হিসাব ও গাউন ফি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, নড়িতেও ভুলিয়া গেল। এমন সময় পিঠের উপরে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দেখিল তারিণীবাবু। তারিণীবাবু বলিলেন—একটু পলিটিকস্ করতে হবে, নইলে ওরা পয়সা বের করতেই চায় না, উকিলকে বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেয়। তারপরে হাসিয়া বলিলেন—এ তোমাদের সাহিত্য নয় বাবাজী, সাহিত্য নয়—এ একটা 'লার্নেড প্রফেশন।' চলো, উকিল-ঘরে চলো, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

নবীন তারিণীবাবুর সঙ্গে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল তিনি নবীনের পরিচয় বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, নবীন এখনো তাঁহার পরিচয় পায় নাই।

৩

শেক্সপীয়র আদালতের দীর্ঘসূত্রিতার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু আদালতের ক্লান্তির উল্লেখ করেন নাই। দুপুরবেলায় আদালতে কয়েক ঘণ্টা ঘুরিলেই একটা স্বাস্থ্যবান্ লোক ভাঙিয়া পড়িবে, অথচ উকিলবাবুরা এই তপ্তকটাহে দিনের পর দিন ভর্জিত হইতেছেন, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, তাঁহাদের মেধা ও মেদ বাড়িতেছে। মফস্বল-আদালতের উকিলগণ সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত। আর মোক্তারবাবুরা একেবারে 'সুপার-ম্যান।' আদালত হইতে ফিরিয়াই তাঁহাদের

কাজ শেষ হয় না। গভীর রাত্রে প্রতিবেশিদ্বয়ের বেগুন ক্ষেতে ঢিল ছুড়িয়া সকালবেলা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিবার কারণ ঘটাইয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা দুই মোক্তারের মক্কেল-শ্রেণীভুক্ত হয়। ফল কথা, আদালত একটি কামরূপ কামাখ্যার মন্দির, এখানে একবার প্রবেশ করিলে ভেড়া না বনিয়া উপায় নাই।

তারিণী-চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে নবীন বাসায় ফিরিল, তাহার শরীর এমনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছিল না, কোনরকমে টলিতে টলিতে একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া ছাদের উপরে বসিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে ভিতর হইতে মুক্তামালার আহ্বান আসিল। নবীন ভিতরে গিয়া স্নান করিল, চা-পান করিল, আবার এই ছাদটিতে আসিয়া বসিল। এই বাড়ির মধ্যে, এই শহরের মধ্যে এই ছাদটুকুই বিশেষ করিয়া তাহার আশ্রয়। ছাদের ঠিক নীচেই পদ্মা।

নবীন সম্মুখে তাকাইয়া দেখিল ভাদ্রের ভরা পদ্মা কূলে কূলে কানায় কানায় পূর্ণ—যেন আর একফোঁটা বাড়িলেই কানা ছাপাইয়া যাইবে। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় একটানা জলরাশি, মাঝখানে একজায়গায় কতকগুলি গাছের আভাস, বুঝিতে পারা যায় ওখানে একটা স্থায়ী চর আছে, তারপরেই আবার জলরাশি—দক্ষিণের দূরতম দিগন্তে একটি অনতিস্থূল দীর্ঘ রেখা—নবীন বুঝিল ওটাই নদীর প্রসারের সীমা। ভরা পদ্মায় প্রচণ্ড স্রোত, কিন্তু জলতলের বিস্তারের জন্য তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কেবল নৌকাগুলির দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের গতি কি তীব্র!

আদালতের গ্লানিকর অভিজ্ঞতার পরে এখানে বসিবামাত্র নবীনের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত বিরক্তি দূর হইয়া গেল—তাহার সমস্ত সত্তা যেন আরামে 'আঃ' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিল। নিকটেই মুক্তামালা আর একখানা চৌকি টানিয়া বসিল। বলিল, এত বড় নদী আমি কখনো দেখিনি।

নবীন উত্তর দিল না, তাহার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তামালাও পদ্মার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া নীরবে তাকাইয়া রহিল; দুইজনেই

শিশুর মতো অবাক নেত্রে দেখিতে লাগিল। মহৎ প্রকৃতির নিকটে মানুষ মাত্রেই শিশু।

পূর্বদিক হইতে বাতাস আসিতেছে, পুব আকাশ হইতে মেঘ ভাসিতেছে, কালো মেঘের ছায়া জলে পড়িতেছে, ঘোলা জল কালো হইতেছে, নৌকার সাদা পালের উপরে পড়িয়া সাদা ম্লান হইতেছে, মেঘে মেঘে মিশিয়া এক হইতেছে, ছায়ায় ছায়ায় একাকার হইতেছে। পশ্চিম দিগন্তের এক স্থানে মেঘ নাই, সেখানে সূর্যাস্তের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে—সূর্যের স্বর্ণতোরণ ধীরে ধীরে জলের তলে চলিয়া যাইতেছে—জলের উপরে বিগলিত সূর্যকিরণ। হঠাৎ পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব তীর পর্যন্ত জলের উপরে কে যেন একটা স্বর্ণসেতু প্রসারিত করিয়া দিল। সেই ছায়াময় সেতু দেখিয়া নবীনের প্রাচীন কাহিনীর দুর্গসেতুর কথা মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেতু নামাইয়া দিয়া শেষ আশ্রয়প্রার্থীটিকে যখন দুর্গের মধ্যে সংগ্রহ করা হইত। নবীনের মনে হইল, প্রকৃতি তাহার স্বর্ণসেতু বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে, মানুষের সংসারের দিকে, প্রকৃতির কোলের পরমাশ্রয়প্রার্থীর দিকে। এমন দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ চলিতেছে—মানুষ বড় একটা চাহিয়া দেখে না। তাহার অনেক বেশি ঝোঁক আদালতের দিকে, তারিণীবাবু তাহার তরণের জন্য যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রতি মানুষের অত্যধিক বিশ্বাস।

নবীন আবার তাকাইয়া দেখিল, সমস্ত জলতল সমাপ্ত-দিগ্বিজয় সম্রাটের অসির মতো রক্তাক্ত। ধীরে ধীরে রক্তচিহ্ন ফিকে হইয়া আসিল। জলতল পাটল, ধূমল, কৃষ্ণ—সমস্ত অন্ধকার। আকাশের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তখন তারা উঠিয়াছে।

ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল, রাত্রি গভীর হইল, মুক্তামালা ও নবীননারায়ণ পাশাপাশি দুইখানি চৌকিতে নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ কোনো কথা বলিল না। দিবসের কর্মকোলাহলস্তব্ধ নৈশজগতে পদ্মার গর্জন কোনো অতিকায় দৈত্যগুণীর একতারার অপার্থিব সঙ্গীতের মতো অনন্তশব্দ সেই

প্রহরগুলিকে প্লাবিত করিয়া ধ্বনিত হইতে থাকিল। কল কল, ছল ছল, খল খল, গল গল, ঘল ঘল—অবিরাম, অবিশ্রান্ত, অনাদ্যন্ত, অনন্ত! মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই। নদীতে নৌকা নাই, নৌকায় দীপ নাই, ভাদ্র মাসের মন্থর বায়ুমণ্ডলে বায়ুতরঙ্গ নাই, অন্ধকার জগতে স্পর্শযোগ্য বস্তু নাই—বিশ্ব যেন একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত, আর তাহার বিষয়-স্বরূপ সমস্ত বিশ্ব যেন শব্দরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—কল কল, ছল ছল, খল খল, গল গল, ঘল ঘল! নবীনের মনে হইল—সৃষ্টির আদিগোমুখী-নিঃসৃত অনাদি নাদব্রহ্ম অবিরাম নির্গলিত হইতেছে। তাহার মনে হইল, স্রষ্টার মানসকুহর হইতে বিশ্বের আদি রূপ নিঃসারিত হইয়া চলিয়াছে—পদ্মা নহে, পদ্মযোনির বেদধ্বনি-উদ্গিরণ। নবীন চাহিয়া দেখিল—আকাশের দূরতম প্রান্তে গূঢ় ভবিষ্যতের মতো ঘনকৃষ্ণ শিলাখণ্ডের উপরে বিদ্যুতের বহ্ন্যক্ষর ইন্দ্রের বৈদিক স্তবমন্ত্রকে মুহুর্মুহু ক্ষোদিত করিয়া দিতেছে। প্রাক্‌সৃষ্টিপূর্ব এক অপূর্ব অভিজ্ঞতায় নবীনের সমস্ত শরীরমন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, চিন্তার শক্তি তাহার রহিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে না জানি, রাত্রি তখন কত গভীর না জানি, মুক্তামালা বলিল—শুতে চলো।

নবীন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া মৃতের মতো শুইতে চলিল। বিছানায় গিয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। নবলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কিছুতেই সে সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছিল না। দিনের বেলায় আদালতে গিয়া মানুষের এক রূপ দেখিয়া আসিয়াছে, আবার রাত্রের আর এক রূপ তাহার চোখে এইমাত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে। দুই-ই বিশ্বের অন্তর্গত। কিন্তু দুই-ই কি সত্য? দুই-ই কি সমান সত্য? সত্যের কি শ্রেণীভেদ সম্ভব? তাহার মনে হইল, অগ্নিশিখা ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু দাহিকা শক্তির বিচারে সব অগ্নিই সমান, সব অগ্নিই এক। তবে সত্যের আবার শ্রেণীভেদ কিরূপে সম্ভব? তবে কি এ দুইটি সমান সত্য নয়? অর্থাৎ একটা সত্য আর একটা মিথ্যা, অথবা একটা সত্য

আর একটা তাহার বিকার, যেমন লৌহ আর মরিচা? অথবা এ দুই-ই সত্য, কেবল শক্তির অভাবে নবীন তাহাদের সমন্বয় করিতে পারিতেছে না।

এই রকম কত কি ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। অনেক বেলায় যখন তাহার ঘুম ভাঙিল প্রথমেই মনে পড়িল এখনই তারিণীবাবুর কাছে যাইতে হইবে। তাহার মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

৪

জোড়াদীঘি ছাড়িয়া নবীননারায়ণকে সহসা কেন সদরে আসিয়া বাসা লইতে হইল? কিছুকাল আগে একটা চরের দখল লইয়া ছ'আনি দশানিতে বিবাদ বাধে। সেই বিবাদের ফলে দুই পক্ষের লাঠিয়ালে মারামারি হইয়া উভয়ের পক্ষের কয়েকজন লাঠিয়াল আহত হয়। নিরপেক্ষ দারোগা রমানাথবাবু তদন্ত করিয়া দুই পক্ষের কয়েকজন লাঠিয়ালকে চালান দেন। প্রাথমিক তদন্তের ফলে মহকুমা-হাকিম তাহাদিগকে 'সেশনে' প্রেরণ করিয়াছেন। সেশনের বিচার হইবে জজের কাছে—সদরে। এই মামলার যথোপযুক্ত তদ্বিরের জন্যই নবীন শহরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

নবীনের নায়েব ও অন্যান্য কর্মচারিগণ তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, এই সামান্য কাজের জন্য হুজুরের শহরে যাওয়া উচিত নয়—মান-মর্যাদার হানি হইবে। কিন্তু এই যুক্তি নবীনের মনে ধরিল না, সে ভাবিল, বলিল যে, যাহারা তাহার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে তাহারা যাহাতে সুবিচার পায় সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাহার।

কর্মচারীরা বলিল—দশানির বাবু তো গ্রামেই রহিলেন তবে তাঁহারই বা শহরে যাইবার প্রয়োজন কি?

এ যুক্তিটাও নবীনের নিকটে অচল বলিয়া মনে হইল। সে বলিল, দশানির বাবুর কর্তব্যবোধকে সে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

বস্তুত ছ'আনির বাবু শহরে মামলা তদ্বিরের উদ্দেশ্যে গেলে আর কাহারও

না হোক, তাহার কর্মচারীদের বিশেষ অসুবিধার কারণ ছিল না—একরূপ খরচ করিয়া আর-একরূপ হিসাব লিখিবার জন্মগত স্বাধীনতা লোপ পাইবে বলিয়া তাহাদের বিশেষ আশঙ্কা ছিল।

নবীন অভিযুক্ত লাঠিয়ালদের পরিবারবর্গের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সপরিবারে শহরে চলিয়া আসিল।

ইহা দেখিয়া কীর্তিনারায়ণ খুব একচোট হাসিয়া লইল। বলিল, ভায়া এইভাবে মামলা তদ্বির করবেন তা হ'লেই হয়েছে। আদালত থেকে আদালতে ঘুরেই যে দম ফুরিয়ে যাবে। বাবা—এসব এম-এ, বি-এ পাশ করা নয়। দেখো না কেন, আমি তো কোথাও যাইনি, তবু আমার লাঠিয়ালদের জামিনে খালাস ক'রে আনলাম—আর আমার ভায়ার ?

কীর্তিনারায়ণ এই গর্বটুকু করিলে করিতে পারেন, যেহেতু নবীননারায়ণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পক্ষের লাঠিয়ালদের জামিনে মুক্ত কবিতে পারে নাই। এমন যে হইল, তার কারণ আইনের পুস্তকগত সদর রাজপথটাই নবীন জানে। কিন্তু আইনের রাজ্যে রাজপথের চেয়ে গলিঘুঁজির মাহাত্ম্যই অধিক—সে-সব অন্ধিসন্ধির খবর আদর্শবাদী নবীনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দশানির বাবু ফরাসের উপরে গড়াইতে গড়াইতে কোথায় কি কলকাঠি নাড়িয়া দিল, তাঁহার পক্ষের লোকে জামিন পাইল, নবীনের লোকে পাইল না।

নবীনের বাসার নীচের তলাটা মামলার সাক্ষী-সাবুদে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে। সাক্ষীদের প্রধান টোলের পোড়ো শশাঙ্ক ঠাকুর। স্বাভাবিক টানে তাহার দশানির দিকে যাইবার কথা—কিন্তু একটা অস্বাভাবিক টানে সে ছ'আনির পক্ষভুক্ত হইয়াছে। বাদ্‌লি মুক্তামালার সঙ্গে শহরে আসিয়াছে।

ছ'আনির অপর একজন সাক্ষী নীলাম্বর ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর। জ্যেষ্ঠপুত্র দিগম্বর দশানির প্রধান সাক্ষী। নীলাম্বর ঘোষ গীতাধ্যয়নের ফলে এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছে যে, স্বয়ং নারায়ণ ও নারায়ণী-সেনা প্রাচীনকালে

পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষভুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নীলাম্বর দুই পুত্রকে দুই পক্ষে ভর্তি করিয়া দিয়াছে,—যে পক্ষই জয়লাভ করুক, তিনি ফাঁকিতে পড়িবেন না। গীতাকে তেমন করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে সাংসারিক উন্নতির সোপান না হইয়া যায় না।

আজ রবিবার। আদালত নাই, কিন্তু আদালতের নেপথ্যবিধান আছে। তারিণীবাবু ও বিজয় মুহুরি ছ'আনির পক্ষের সাক্ষীদের তালিম দিবার উদ্দেশ্যে ছ'আনির বাসাবাড়িতে আসিয়াছেন।

নীচের তলার বড় হলঘরে দ্বিপ্রহরের আহারান্তে সাক্ষী শিখানো চলিতেছে। ছ'আনির প্রধান সাক্ষী শশাঙ্ক পণ্ডিত ও পীতাম্বর ঘোষ।

তারিণীবাবু সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন—আমাদের মামলা হচ্ছে যে, মুকুন্দপুরের চর আবহমানকাল থেকে ছ'আনির দখলে। ছ'আনির প্রজারা চিরকাল এই চরে চাষ ক'রে আসছে। যেদিন মারামারি হয়, সেদিনও সকালে তারা চাষ করছিল, এমন সময়ে দশানির লাঠিয়ালেরা গিয়ে তাদের মারপিট শুরু ক'রে দেয়।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—এবারে পঞ্চাননবাবু ব'লে দিন সেদিন সকালে আপনাদের কোন্ কোন্ প্রজা চাষ করছিল।

ঘাড়-টান পঞ্চানন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া বলিল যে, রহিম আর করিম দুই ভাই আউশ ধান বোনবার জন্যে লাঙল দিচ্ছিল—

তারিণীবাবু বলিলেন—বেশ, বেশ, তাহ'লে রহিম আর করিমকেও সাক্ষী মান্‌তে হয়—

এমন সময়ে শশাঙ্ক তারিণীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—মহাশয়, যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন, তবে আমি একটা কথা বলি। রহিম আর করিম না লিখে রহিম আর কেদার লিখুন।

তারিণীবাবু বলিলেন—কেন?

শশাঙ্ক বলিল—রহিম ও করিম আর রহিম আর কেদার দুটো নামই

সমান সত্য। এ রকম ক্ষেত্রে যে সত্যে অধিকতর ফললাভের আশা, তাই করতেই শাস্ত্রকারগণ পরামর্শ দিয়েছেন।

তাহার যুক্তির ধারা সকলে অনুসরণ করিতে অসমর্থ দেখিয়া ব্যাখ্যার ছলে শশাঙ্ক বলিল—মহাশয়, দিনকাল খারাপ। বিচারক যদি হিন্দু হয়, তবে দুটি মুসলমান নামে তাহার সুবিচার-ইচ্ছা জাগ্রত না করতেও পারে, আবার বিচারক মুসলমান হ'লে দুটি হিন্দু নাম তেমন ফলপ্রদ না হ'তেও পারে, কিন্তু একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান হ'লে বিচারক যিনিই হোন না কেন, সুফল অবশ্যম্ভাবী।

তাহার অকাট্য যুক্তিতে তারিণীবাবু চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন—পণ্ডিত মশায়, এ প্রতিভা কোথায় পেলেন?

শশাঙ্ক সবিনয়ে বলিল—গীতা পাঠ করেছি কিনা, তবু তো এখনো সমাপ্ত করতে পারিনি।

তারিণীবাবু বলিলেন—গীতা তো আমিও পড়েছি, রোজ সকালে এক অধ্যায় ক'রে পাঠ করি। কিন্তু কই, এমন—! বিস্ময়ে আর কথা বলিতে পারিলেন না।

শশাঙ্ক বলিল—হবে, হবে। সবই গুরুর ইচ্ছা। বলিয়া সে কপালে হাত ঠেকাইল।

তখন তারিণীবাবু বলিলেন—পঞ্চাননবাবু, তবে তাই লিখে নিন। রহিম আর কেদার—আর পাশে লিখে রাখুন, একজন মুসলমান, অপরজন হিন্দু।

পঞ্চানন সেইরূপ লিখিয়া লইল।

তারিণীবাবু বলিলেন—পণ্ডিত মশায়, আপনি তো দেখলেন যে, দশানির লেঠেলরা এসে ওদের উপরে চড়াও হয়েছে?

শশাঙ্ক বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারিণীবাবু পুনরায় শুধাইলেন—কিন্তু মুকুন্দপুরের চর জোড়াদীঘি থেকে দশ মাইল পথ, আপনি হঠাৎ সেখানে গেলেন কেন?

শশাঙ্ক বলিল—গোবিন্দপুর থেকে ফিরছিলাম, পথে মুকুন্দপুরের চর পড়ে—

তারিণীবাবু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আর শশাঙ্ক উত্তর দিতে লাগিল।

—গোবিন্দপুরে কেন গিয়েছিলেন ?

—আমার একজন খাতক ওখানে থাকে।

—আপনি কি তেজারতির ব্যাবসা করেন ?

—অল্প স্বল্প ক'রে থাকি।

—বেশ ; কিন্তু পীতাম্বর ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায় ?

—মুকুন্দপুরের বড় বটগাছের তলায়।

তারিণীবাবু বলিলেন, পীতাম্বরবাবু, আপনি হঠাৎ ওখানে গেলেন কেন ?

পীতাম্বর ঘোষ বলিল—আজ্ঞে, শ্বশুরালয় থেকে ফিরছিলাম।

তারিণীবাবু বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনকে জেরা করিলেন; কিন্তু দুই সাক্ষীই ভগবদ্দত্ত সত্যদর্শনের ক্ষমতা লইয়া অবতীর্ণ, তাহাদের বর্ণিত ঘটনায় কোথাও রন্ধ্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না—আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এমন এক-জোড়া সাক্ষী পেলে আমি মামলায় দিগ্বিজয় ক'রে আসতে পারি।

এমন সময়ে রাস্তায় শব্দ উঠিল—চাই ক্ষীরমোহন।

সাক্ষী, উকিল সকলে একযোগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

তারিণীবাবু বলিলেন—বিজয়, ও বুঝি মোহন ময়রা ? আহা, ও-রকম ক্ষীরমোহন তৈরি করতে আর কাউকে দেখলাম না।

পঞ্চানন ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্ষীরমোহন-ওয়ালাকে ডাকিল।

ময়রা ভিতরে ঢুকতেই তারিণীবাবু শুধাইলেন—কি মোহন, ভালো তো ?

মোহন বলিল—আজ্ঞে নিজের মুখে আর কি বলবো—

শশাঙ্ক বলিল—তার চেয়ে আমাদের মুখেই পরীক্ষা হোক। এই বলিয়া একটা ক্ষীরমোহন তুলিয়া লইয়া আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তারপরে আর একটা, তারপরে আর একটা।

—পণ্ডিতমশায়, বলুন না কেমন ? বলিয়া তারিণীবাবু মুখে একটা একটা করিয়া ক্ষীরমোহন ফেলিতে লাগিলেন। তখন উকিলে আর সাক্ষীতে ক্ষীরমোহন গ্রাসের একপ্রকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। আর সকলে ক্ষীয়মাণ আধার লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই অধিকতর বিমর্ষ হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ-ছয় সের ক্ষীরমোহন উদরসাৎ করিয়া তারিণীবাবু ও শশাঙ্ক দুইজনেই স্বীকার করিল, মিষ্ট উৎকৃষ্ট, কিন্তু তাঁহাদের সেই পূর্বের আহার-শক্তি আর নাই।

তারিণীবাবু উদারভাবে বলিলেন—মোহন, দাও, সকলের হাতে হাতে দিয়ে দাও। তখন বাকি সকলে মুহূর্ত মধ্যে ভাণ্ডটির উপরে গিয়া পড়িল।

দোতলার বারান্দা হইতে নবীন তাহার এস্টেটের প্রবীণ উকিলবাবুর ও প্রধান সাক্ষী শশাঙ্কর সর্বগ্রাসী শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল এবং কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নও হইল। তাহার মনে হইল, মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ইঁহারা দুইজনে বাঁচিয়া থাকিলে হয়। এত ঠেকিয়াও নবীনের কিছুমাত্র সাংসারিক জ্ঞান হয় নাই—সংসারে সর্বগ্রাসীরাই চিরজীবী।

৬

পদ্মার চরে বিকালবেলা নবীন ও মুক্তামালা বেড়াইতে গিয়াছে। এই চরটাই ছিল তাহাদের সান্ধ্যভ্রমণের স্থান। শহরের পথঘাট পরিষ্কার নয়, আর যে-অঞ্চলটা পরিচ্ছন্ন সেখানে সান্ধ্যবায়ুভুক দলের এমন জনতা যে রীতিমত বায়ুর দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা। তাই তাহারা নদী পার হইয়া চরে যাইত। এখন শীতকালে নদী পার হওয়া কঠিন নয়। হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, কোন কোন স্থলে জুতা ভেজে মাত্র, জুতা খুলিয়া হাতে লইলেই হইল। চরের দক্ষিণ দিকে গভীর নদী—উত্তর দিকটা শীতকালে নৌকা চলাচলের অযোগ্য হইয়া যায়।

ভরা বর্ষায় ছাদে বসিয়া এই চরের মগ্নপ্রায় গাছপালার মাথাগুলি নবীন দেখিয়াছে—কিন্তু এখনও চরটার অধিকাংশই জলের গ্রাস হইতে মুক্ত। চরে এখন রবি-শস্যের পালা চলিতেছে। যতদূর দেখা যায়, কচি মশুর ছোলা মটর আর সর্ষের ভুঁই। মটর ক্ষেতে ছোট ছোট নীল বেগুনী আর লালের ছোপ দেওয়া ফুল। সর্ষের ফুলও দেখা দিতেছে, কাছে হইতে তেমন চোখে পড়ে না—দূরে দাঁড়াইয়া নিরিখ করিলে একটা পীতাভ প্রলেপ

ভাসিয়া ওঠে। চরের মাঝখানটাতে গৃহস্থের বাড়ি। বর্ষার সময়ে অনেকেই শহরে চলিয়া আসে, কেবল যাহাদের বাড়ি উচ্চতম ভূমিখণ্ডে তাহারা থাকিয়া যায়; তাহাদেরও অনেকে থাকে না, নিতান্ত না ঠেকিলে বা নিতান্ত দুঃসাহসী না হইলে কেহ বর্ষাকালে সেখানে বাস করে না। এখন গৃহস্থেরা সবাই ফিরিয়া আসিয়াছে, যাহাদের বাড়িঘর পড়িয়া গিয়াছিল তাহারা আবার বাড়িঘর তুলিয়াছে। সেই গৃহস্থপল্লীর কাছে বাঁশের ঝাড়, কলাগাছ, বেগুনের ক্ষেত, লাউ-কুমড়োর মাচা, আম-কাঁঠালের গাছও কিছু কিছু আছে। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যেক গৃহ হইতে ধূমরেখা উঠিতেছে—আর সবগুলি ধূম্ররেখা মিলিত হইয়া সেই চাষী পল্লীর শিরঃস্থিত নিস্তব্ধ বায়ুস্তরে একটি কালিন্দীপ্রবাহ রচনা করিয়া তুলিয়াছে। কালিন্দীপ্রবাহ না বলিয়া কালীয় হ্রদ বলাই উচিত, ধূমস্তরে গতি নাই—হ্রদের মতো অচঞ্চল এবং নিস্তব্ধ।

চরের শুষ্ক জমিতে উঠিয়া নবীন ও মুক্তামালা জুতা পায়ে দিল এবং পুনর্বার যাত্রা করিবার আগে একবার পরপারবর্তী শহরের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। দুজনে দেখিতে পাইল, নদীর অর্ধবৃত্তাকার তীরভূমিতে বঙ্কিম অট্টালিকাশ্রেণীর সৌধশুভ্রতার উপরে দূরত্বের নীলাভ অঞ্জন অর্পিত হইয়া সমস্ত যেন কেমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। শহরের মাথার উপরেও ধূমস্তর জমিয়াছে। যেন রাত্রের প্রহরী ইতিমধ্যেই মাথায় কালো পাগড়িটা বাঁধিয়া পাহারা দিবার জন্য প্রস্তুত।

নবীন বলিল—বলো তো মুক্তি, আমাদের বাড়িটা কোথায়?

তখন দুইজনে অগণ্য অট্টালিকার ভিড়ের মধ্যে তাহাদের বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল।

নবীন বলিল—ওইটা।

মুক্তা বলিল—দূর, ওটা কেন হবে, আমাদের বাড়ি যে তে-তলা।

নবীন ভুল বুঝিয়া বলিল—তাও তো বটে! তবে ওইটা।

মুক্তা বলিল—ওইটা? কিন্তু অত গাছপালা এলো কোথা থেকে?

নবীনের আবার ভুল হইয়াছে।

এবারে মুক্তামালা বলিল—ওই দেখো বাঁ-দিকে ওইটা। দু'পাশে একতলা দুটো বাড়ি, পিছনে মস্ত চারতলা। আর ওই দেখো, আমাদের রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে।

নবীন অনেক ঠাহর করিয়া বুঝিল, ওটাই বটে! শুধাইল—বুঝলে কি করে?

মুক্তামালা সপ্রতিভ ভাবে বলিল—আমার রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে পারি।

নবীন ঠাট্টা করিয়া বলিল—রান্নাঘরে কি কি রান্না হচ্ছে তাও বোধকরি বলতে পারো?

মুক্তামালা আবার সপ্রতিভ ভাবে বলিল—তাও পারি, কারণ রান্নার জোগাড় আমিই দিয়ে এসেছি।

দুইজনে হাসিয়া উঠিল। নবীন বলিল—চলো ওই গাঁয়ের দিকে যাই। দেখা যাবে ওদের বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে কেমন বলতে পারো।

দুইজনে আবার হাসিল। হাসি আর যৌবন ঘনিষ্ঠ মিত্র।

তখন দুইজনে সর্ষে ক্ষেতের আল বাহিয়া ঘন ঘন দিক্-পরিবর্তন করিয়া চলিতে লাগিল। সর্ষে ফুলের ঈষৎ মদির গন্ধ, তার সঙ্গে শিশির-ভেজা চষা-মাটির গন্ধ, সন্ধ্যাবায়ুস্তরের খড়পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ—সবসুদ্ধ মিলিয়া এক রূপকথার আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য শালিখ পাখীর ডাক, অদূরস্থিত আখের ক্ষেতের মধ্যে ব্যস্ত বাবুই পাখীর অকারণ যাতায়াতের পাখার শব্দ, বিলম্বিত গাভীটির করুণ আর্তস্বর, এমনি বহুতর শব্দজাল ভেদ করিয়া তাহারা চলিল। একবার আল ঘুরিতেই তাহাদের মুখ পশ্চিমে ফিরিল। সেখানে বনরেখার বাধাহীন অতিদূর পশ্চিমে না-জানি কোন্ চোরাপাথরে ঠেকিয়া এইমাত্র সূর্য্যাস্তের ভরা তরী বানচাল হইয়া গিয়াছে। রাশিরাশি লাল নীল হলদে বস্তুপুঞ্জ নীল সমুদ্রে ভাসমান, আর সবার পিছনে দিগন্তের ঠিক কোণের কাছেই অগ্নিশিখা-

পরিমণ্ডিত সূর্যগোলকের তরণী একটু একটু করিয়া অতলে তলাইয়া চলিয়াছে। একি নৈরাশ্যের সমারোহ, ধ্বংসের একি অকারণ আড়ম্বর। কয়েকটা জলচর পাখী উড়িতেছে—ওরা কি এই উপমা-সিন্ধুর সিন্ধু শকুনের দল ?

এই চিত্রার্পিত সন্ধ্যার কোনখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। নবীনের মনে হইল তাহারা যেন মানবজগতের সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহার মনে হইল নিকটে ছদ্মবেশী বহুদূরস্থিত এই ভূখণ্ড মানব ও প্রকৃতির 'নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ড' —এখনো কাহারো একাধিপত্য নয়, যে যখন পারে আসিয়া অতর্কিতে উপস্থিত হয়, কার্যসিদ্ধি করিয়া আবার তখনি সরিয়া পড়ে।

আরো একটু অগ্রসর হইতেই তাহাদের চোখে পড়িল দূরের ভূখণ্ড উচ্চতর। সেই ভূমিখণ্ডের উপরে তরল অন্ধকারে অস্পষ্টীকৃত দুইটি মানবদেহের সীমানার ছাপ। একটি আগে, একটি পিছে, একটির অপেক্ষা একটি দীর্ঘতর। আরো একটু ঠাহর করিয়া দেখিলে অনুভূত হয় আগেরটি পুরুষ, পিছনেরটি নারী—দুইটির মাথায় দুইটি ছোট ছোট বোঝা। তদধিক কিছু বুঝিবার উপায় নাই, তদধিক কিছু বুঝিবার প্রয়োজনই বা কি। মানবমূর্তি দুটির অঙ্গ হইতে মনুষ্য-সংসারের মনুষ্যসংস্কারের আর সমস্ত লক্ষণ, আর সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কেবল অবর্জনীয়তম অপরিহার্যতম গুণটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারা নরনারী—শস্যভারবাহী। পৃথিবীর অঞ্চলস্খলিত-স্নেহকণা-বাহী, জীবলীলার অনিবার্যতম প্রতীকবাহী, নশ্বর অথচ অবিনশ্বর, ভূতলসংলগ্ন অথচ আকাশস্পর্শী, চিরচঞ্চল ও চিরস্থায়ী নরনারী। তাই বলিয়াছিলাম, এতদধিক বুঝিবার আর প্রয়োজনই বা কি ? কিম্বা এতদধিক আর বুঝিবার আছেই বা কি ? এতদধিক যাহা বোঝা যায়—সবই ভুল বোঝা, সবই অকিঞ্চিৎকর।

মূর্তি দুটি উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত, নবীন ও মুক্তামালা নীচে ; তাহাদের মনে হইল মূর্তি দুটির মাথা যেন আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। মূর্তি দুটি দূরে ছিল, তাই মনে হইল তাহারা যেন চলিয়াও চলিতেছে না—স্থির দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাদের মনে হইল, সেই অশরীরীবৎ মূর্তি দুটি যেন শরীরী-জগতের একমাত্র অধিবাসী-যুগল। তাহাদের মনে হইল জগতের শেষ রহস্য যেন অকস্মাৎ তাহাদের চোখে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল—পৃথিবী ও মানুষ। পৃথিবী ও মানুষের নিজস্বতম, মৌলিকতম, চিরন্তনতম মূর্তি, শস্যদাত্রী পৃথিবী ও শস্যগ্রহীতা মানুষ।

এই মহারহস্যের সমীপে নিজেদের শিশুবৎ মনে হইল, তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, এক প্রকার ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ে তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে ভুলিয়া গেল, তাহাদের মন আদিম অনুভূতিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যতক্ষণ না সেই মানবমূর্তি দুটি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহারা নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া নিরেট হইয়া উঠিলে পুরাতন পথে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল।

সেদিন রাত্রে নবীন ও মুক্তমালা ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল। নবীন বলিতেছিল—দেখো মুক্তি, আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়—পৃথিবী কাদের ? এ প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিকরা, অর্থনীতিকরা, একভাবে দিয়ে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়। তাঁরা বলেন, যারা প্রতক্ষ্যভাবে ধনোৎপাদন করছে, যেমন কৃষক, যেমন শ্রমিক—পৃথিবী আসলে তাদেরই। আমার মনেও এই প্রশ্ন ছিল, উত্তর খুঁজেছি, পাইনি। আজ সন্ধ্যায় চরে বেড়াতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম—পৃথিবী কাদের।

নবীন বলিতে লাগিল, পৃথিবী তাদেরই যারা একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে পৃথিবীর বুকের কাছে রয়েছে, তারা কৃষক হ'তে পারে, শ্রমিক হ'তে পারে। আবার তা ছাড়াও আরো কিছু হ'তে পারে। মানুষের সভ্যতা মানুষকে পৃথিবীর নিবিড় সান্নিধ্য থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে আনছে। শহরের মানুষ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, গ্রামের মানুষ অনেক কাছে, বনের মানুষ আরো কাছে।

যারা পৃথিবীকে কর্ষণ ক'রে মাঠে মাঠে শস্যরাশি হিল্লোলিত ক'রে দিচ্ছে তারাই পৃথিবীর আপনার; সেই শস্যকে যারা কলে ভাঙছে, চাল করছে, তেল করছে, আটা ময়দা করছে, তারা পৃথিবীর তেমন আপন নয়। আবার যারা পৃথিবীর গর্ভ থেকে কয়লা তুলছে, সোনা রূপো তুলছে প্রথমত তারা পৃথিবীর বুকের কাছে থাকলেও তারা পৃথিবীর আপন নয়—কেননা, তাদের কারবার প্রাণহীন বস্তুকে নিয়ে। পৃথিবী যে উচ্ছিষ্টকে সযত্নে নিহিত ক'রে রেখেছে তা মানুষের সংসারে তুলে নিয়ে এসে তাদের কারবার। তারা পৃথিবীর পর।

নবীন বলিয়া চলিল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারের পটে শস্যরাশিবাহী ওই যে অস্পষ্ট দুটি মূর্তি দেখতে পেলাম ওরাই পৃথিবীর সবচেয়ে আপন। ওদের মূর্তির মধ্যে মানুষের চিরন্তন রূপ ধরা পড়েছে, যে মানুষ আদিমকাল থেকে শস্যসংগ্রহ করছে, পৃথিবীর আপন হাতের সেই প্রসাদ ঘরে ব'য়ে নিয়ে এসে সকলে মিলে জীবন ধারণ করছে। ওরাই পৃথিবীর আপন, পৃথিবী ওদেরই, কেননা পৃথিবী স্বেচ্ছায় ওদের কাছে তার শ্যামল প্রসাদ মাঠে মাঠে অবারিত ক'রে দিয়েছে।

এই বলিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মুক্তি, আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি।

মুক্তামালা বলিল—তবে কি সভ্যতা সেই আদিম সম্বন্ধের শত্রু?

নবীন বলিল—তা নয়, প্রকৃত সভ্যতা সেই সম্বন্ধেরই পোশাক। প্রকৃত সভ্যতা পৃথিবীকে সজ্ঞানে ভালোবাসতে শেখায়, আপন ভাবতে শেখায়—সেই ভালোবাসা থেকেই মহৎশিল্পের সৃষ্টি। কবিরা, শিল্পীরা—তারাও পৃথিবীর আপনার, কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে তারা ভালোবাসতে পারে। আকাশে যে সুধাসঞ্চারী মেঘরৌদ্রের লীলা, ধরাতলে অমৃতপ্রলেপবিস্তারী যে শস্যক্ষেত্রের হিল্লোল, শ্যামল তৃণের প্রসার, সমুদ্রে যে নীলিমার হিল্লোল, পর্বতে যে ধবলিমার উচ্ছ্বাস, এ সবকে যারা আপন মনে করে তারাই তো, তারাও তো পৃথিবীর আপনার।

মুক্তামালা শুধাইল—তবে কি একজন কৃষক আর একজব কবি সমান?

নবীন বলিল—সমান বই কি—তবে প্রভেদ এইটুকু যে কৃষকজন্মা আত্ম-

অগোচরে পৃথিবীকে ভালোবাসে, আর শিল্পীরা ভালোবাসে সজ্ঞানে। একজন পৃথিবীর শিশুপুত্র, আর একজন বয়ঃপ্রাপ্ত সাবালক। এ দুইয়ে যেটুকু প্রভেদ তার বেশি নয়।...তরুলতা গুল্ম যেমন শিকড় দিয়ে সাগ্রহে পৃথিবীকে আঁকড়ে' প'ড়ে রয়েছে, মানুষের পক্ষে তেমন দৈহিক সান্নিধ্য আর সম্ভব নয়—কিন্তু সে অভাব পূরণ ক'রে নিয়েছে মানুষ ভালোবাসা দিয়ে। উদ্ভিদ, কৃষক ও কবি—এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে আপন। আর-সবাই কেবল পরস্বাপহারী, কেবল পরগাছা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তারা পৃথিবীর কাছে থেকে যা গ্রহণ করছে, ভালোবাসা দিয়ে তা শোধ করছে না।

নবীন আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল। মুক্তামালা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়া বাহিরের শীতের আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। স্বচ্ছ কুয়াশায় চতুর্দিকে শুভ্র অস্পষ্টতা আর আকাশে অর্ধসমাপ্ত তাজমহলের মতো অষ্টমীর অপরিণত চন্দ্র। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, যেন সে মুমূর্ষু, আর দেয়ালঘড়ির কাঁটা দুটি সেই অসাড়ের অঙ্গে পলে পলে একটা করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

মুক্তামালা বলিল—দেখো, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছি, বলা হয়নি, সময় পাইনি, সুযোগ আসেনি, কিন্তু আজকে তুমি আপনিই সেই কথার সীমান্তে এসে পড়েছ—তাই বলছি।

তারপরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—বুড়ো অশথ গাছটাকে কেটে হয়তো ভালো করনি। তুমি এইমাত্র বললে যে, তরুলতা মাত্রেই পৃথিবীর আপনার, ওরা প্রায় মানুষের সগোত্র। একথা যদি সত্যি হয় তবে বুড়ো অশথ সম্বন্ধে সে কথা আরো কত বেশি সত্য! মানুষ ওকে পূজনীয় ক'রে তুলেছিল। তোমার মাথায় তখন কি পাগলামি চাপলো তুমি তাকে কাটলে। এমন বুদ্ধি কখনো তোমার তো হয় না। আর দেখো না কেন, অশথ গাছটি কাটবার পর থেকেই তুমি কি রকম ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছো—এখনো সে পাক খোলবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

[illegible] বলিল—মুক্তি, তোমার কথা হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো ওই

গাছটার জীবনান্তের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাজালের কোনো নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমি অনেক সময়ে ভেবেছি কোনো একটা সুযোগ পাবামাত্র সমস্ত ঘটনাজাল চুকিয়ে দিয়ে আবার কল্‌কাতায় ফিরে যাবো। এমনভাবে গ্রামে ব'সে শয়নতানের সাকেরেদি করা আমার কর্ম নয়—ও কীর্তিদাদাই ভালো পারে।

মুক্তা বলিল—কিন্তু অমন লোকের অমন মা, অমন বউ কেমন ক'রে হয়?

নবীন বলিল—ওই তো স্বভাবের নিয়ম, ইস্পাতের তলোয়ারের আশ্রয় কোমল মখমলের খাপ।

তারপরে সে মনের মধ্যে নাড়া খাইয়া বলিয়া উঠিল—নাঃ এবারে আমি জোড়াদীঘির এই পর্বটিকে চুকিয়ে দিতে বদ্ধপরিকার হয়েছি। অশ্বত্থ গাছটার সম্বন্ধে যে সব কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তার মূলে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু সে সব বিচার ক'রে লাভ নেই। আমি দেখছি ওটাকে কাটবার পর থেকে আমার বিপদের আর অন্ত নেই—একটার পরে একটা আসছেই। এই মামলার আসামীদের জামিনে খালাস ক'রে আনতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।

মুক্তামালা তাহার কথায় মনে মনে খুশি হইয়া উঠিল।

নবীন বলিল—তারপরে একবার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে হাতের কাজকর্মের একটা বিলিব্যবস্থা ক'রে দিয়ে—ব্যস্—জননী জন্মভূমিকে গড় ক'রে কল্‌কাতায় পলায়ন। আমাদের জননী জন্মভূমির এমন যে দুরবস্থা তার কারণ কীর্তি-নারায়ণের মতো লোকেরাই তার ধারক বাহক। ও কাজ ভদ্রলোকের দ্বারা হবার নয়।

নবীনের মতিগতির পরিবর্তনে মুক্তামালার আনন্দের অন্ত রহিল না। রাত্রি সুগভীর দেখিয়া তাহারা শুইতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চতুর্দিকে শিবাধ্বনি উঠিল। তাহারা যেন উচ্চস্বরে নবীনের সঙ্কল্পকে ব্যঙ্গ করিতে থাকিল।

ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, তা .হয় না, তা হয় না, হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া—এখনি কি হয়েছে! এখনি কি হয়েছে! হুয়া হুয়া হুয়া! আরো হবে! আরে[illegible]!

কিন্তু নবীন সে ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিল না, বলিল, গভীর রাত্রের শিয়ালের ডাক আমার বেশ লাগে।

মুক্তামালা বলিল—কিন্তু—কিন্তু আমার বড় ভয় করে। মনে হয় ওদের ডাক যেন শ্মশানযাত্রীর হরিধ্বনি! এই বলিয়া সে নবীনের নিকটে সরিয়া আসিল।

৭

নবীননারায়ণ তারিণীবাবুকে বলিল—আমি আর মামলা চালাবো না।

শুনিয়া তারিণীবাবু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না, এমন অসম্ভব কথা জীবনে তিনি শোনেন নাই। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কিঞ্চিৎ কাটিলে তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—কালে কালে কতই কি যে দেখলাম! জমিদারের ছেলে মামলা করবে না, বামুনের ছেলে সন্ধ্যাহ্নিক করবে না, চাষার ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হবে! দেশের হ'ল কি!

এই বলিয়া তিনি কপালে হাত ঠেকাইলেন। তারপরে নবীনকে শুধাইলেন—মামলা করবে না তো করবে কি?

নবীন বলিল—মামলা ছাড়া আর কিছু কি করণীয় নেই?

তারিণীবাবু বলিলেন—আর কি আছে তা তো জানিনে। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন—একবার তোমার পিতার কথা স্মরণ ক'রে দেখো, মামলা করতে করতেই তিনি সাধনোচিত ধামে গিয়েছেন।

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। যেন দিব্যদৃষ্টির ফলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন নবীনের পিতা পরলোকে গিয়াও স্বর্গীয় আদালতে মামলার তদ্বির করিতেছে। তারিণীবাবুর মনে বোধ করি আশা ছিল যথাসময়ে সাধনোচিত ধামে গিয়া তিনি পুরাতন মক্কেলের উকিলরূপে নন্দনকাননের বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত আদালতে সওয়াল জবাব আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীন বলিল—এই মামলাই আমার শেষ মামলা।

তারিণীবাবু বলিলেন—তাহলে আসামীদের জামিনের কি হবে ?

নবীন বলিল—যেমন ক'রে হোক তাদের জামিনের ব্যবস্থা করুন। সরকারী উকিলকে ধরুন, অপর পক্ষের উকিলকে ধরুন, যত টাকা লাগে তাদের জামিনে খালাস করতেই হবে।

তারিণীবাবু বলিলেন—সরকারী উকিলের তেমন আপত্তি নেই। অপর পক্ষের উকিল হরিচরণের আপত্তিতেই সরকার পক্ষের জোর।

নবীন, বলিল—তবে হরিচরণকে রাজি করান। তারিণীবাবু বলিলেন, বাবা নবীন, তাকে তো দেখোনি—বেটা চামার।

নবীন বলিল—শুনেছি সে টাকার বশ।

তারিণী বলিল—টাকার বশ নয় কে ? আচ্ছা, আমি দেখি কতদূর কি করতে পারি। আজ দুপুরে আদালতে গিয়ে তাকে ধরবো, তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা করলে লোকটা খুশি হ'তে পারে।

নবীন বলিল—তাই করবো। আপনি তাকে দেবার জন্যে কিছু টাকা রাখুন। এই বলিয়া তাঁহার হাতে এক তাড়া নোট দিল।

হরিচরণ দাস অপর পক্ষের উকিল। সে যে বড় উকিল এমন নয়। কিন্তু আদালতের নেপথ্যবিধানের উপরে তাহার অসীম প্রভাব। আদালতের অন্তরালে যেখানে গোপন টাকার চলাচল, সাক্ষী ভাঙানো, দলিল জাল, উপঢৌকন প্রেরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেই রসময় রসাতলের প্রধান ব্যবস্থাপক হরিচরণ দাস। যে কাজ অন্য উকিলেরা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে—হরিচরণ সেখানে নাচিয়া খাড়া হয়। লোকটা আবার স্থানীয় লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। আদালতের নিকটবর্তী লোকাল বোর্ডের আফিসে তাহার আফিস। এখানে বসিয়া সুকৌশলে টাকা হস্তান্তর করিয়া সে সত্যের মুখে তুড়ি মারিয়া হাসিতে থাকে।

পুরাণে বলে যে, দেবতাগণ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৌন্দর্য তিল তিল চয়ন করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হরিচরণ দাসের বিধাতা বিশ্বের যাবতীয় জন্তু-জানোয়ারের রূপ ও গুণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না, দেখিলেও বিশ্বাস করা কঠিন।

মহিষের বর্ণ, হস্তীর আয়তন, কোকিলের চক্ষু, সিন্ধুঘোটকের গোঁফ, সর্পের কুটিলতা, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, কুকুরের স্বজন-বিদ্বেষ, শিয়ালের ধূর্ততা, বিড়ালের তস্করবৃত্তি, পেচকের মুখশ্রী, বায়সের সতর্কতা, হংসের লোলুপতা, বৃশ্চিকের হুল-বিদ্ধন ক্ষমতা, সিংহের ক্রোধ, ভল্লুকের জড়তা যদি একত্র করা যায় এবং তাহার সহিত মানুষের অপরিমিত লোভ জুড়িয়া দেওয়া যায়—তবে হরিচরণ দাসের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারে। কিন্তু একেবারে দোসর হয় না, যেহেতু মিথ্যা-বাদিতা স্তাবকতা প্রভৃতি গুণ পশুতে কোথায় ?

এহেন হরিচরণ দাস লোকাল বোর্ডের আফিসে বসিয়া একজন মক্কেলের নিকট হইতে ফি আদায় করিতেছিল। ফি না বলিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছিল বলাই উচিত, কিন্তু আদালতের এলাকার মধ্যে এমন বে-আইনী কাণ্ড হইতেছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, মনে করিবে লোকটা স্বভাব-নিন্দুক, তাই ফি বলিয়াই পরিচয় দেওয়া উচিত।

বৃটিশ রাজ্যের আদালত এক বিচিত্র বস্তু। বৃটিশের আদালত একাধারে বিদ্যালয় ও ব্যবসায়, শ্মশান ও সূতিকাগৃহ, পীঠস্থান ও সমাধিক্ষেত্র, তাড়িখানা ও বারাঙ্গনা-গৃহ, মরুভূমি, ও মেরুভূমি, দানসত্র ও পান্থনিবাস, মক্কা এবং কাশী। শ্মশানে নাকি সকলেই সমান। এখানে সকলেই অসমান। তুমি দুই টাকা দিলে এক রকম বিচার পাইবে, চার টাকা দিলে তার কিছু বেশি, ষোল টাকা দিলে আরো একটু বেশি। কিছু দিতে না পারিলে কিছুই পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, বিচিত্র এই বস্তু। বৃটিশ এদেশ ত্যাগ করিলেও তাহার এই 'অবদান' থাকিয়া যাইবে বলিয়াই কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে। এহেন আদালতের ছত্র-ছায়ায় বসিয়া হরিচরণ নিঃসঙ্কোচে ফি আদায় করিতেছে।

লোকটা হরিচরণের টেবিলের উপরে দুইটা টাকা রাখিয়া করজোড়ে বলিতেছে—বাবু, আর কিছুই নেই।

হরিচরণ ও-রকম কথা অনেক শুনিয়াছে; সে বলিল, রামপিয়ারী, তোরা দুইজনে ওকে ধর্।

তখন রামপিয়ারী ও অপর একজন চাপরাশি আসিয়া লোকটার দুই হাত

ধরিল। স্বয়ং হরিচরণ উঠিয়া তাহার পিরানের পকেটে হাত ঢুকাইয়া সাড়ে তেরো আনা পয়সা বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

লোকটা আবার বলিল—বাবু, খোদার কসম, আর কিছুই নেই।

হরিচরণ হাঁকিল, রামপিয়ারী, ধুতি।

রামপিয়ারী পাশের ঘর হইতে একখানা ময়লা খাটো ধুতি আনিয়া দিল।

হরিচরণ আবার বলিল—পরাও।

রামপিয়ারী লোকটাকে বলিল—এইখানা পিন্ধিয়া তোমার ধুতি ছোড়কে দাও।

লোকটা প্রথমে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, কিন্তু শত্রুপক্ষের চতুরঙ্গ বাহিনীর সংখ্যা দেখিয়া অগত্যা ধুতি পরিবর্তন করিল।

তখন রামপিয়ারী লোকটার পরিত্যক্ত ধুতির তিন প্রান্ত হইতে একুনে দুই টাকা দশ আনা খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

হরিচরণ গুনিল—দুই টাকা, আর দুই টাকা দশ আনা, হল গিয়ে চার টাকা দশ আনা, আর সাড়ে তেরো আনা, হ'ল গিয়ে পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা। মোট পাওনা ষোল টাকা! তা'হলে বাকি থাকলো এখনো দশ টাকা সাড়ে আট আনা।

এইবার সে অন্তরালের দিকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—কই যতীনবাবু, এদিকে আসুন!

যতীনবাবু নিকটে আসিলে বলিল—লোকটার কাছে পঁচিশ টাকার খত লিখে নিয়ে সাড়ে দশ টাকা দিন! দেখবেন, টাকা ওর হাতে দেবেন না।

রামপিয়ারীর পাহারায় যতীনবাবু লোকটাকে লইয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল।

তখন উপস্থিত সকলের দিকে সগর্বে তাকাইয়া হরিচরণ বলিল—কলিকালে কি সোজা আঙুলে ঘি ওঠে?

বাস্তবিক তাহার তর্জনীটি বাঁকাই বটে। ছোটবেলা কুলগাছ হইতে

পড়িয়া গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল আর সোজা হয় নাই। পরবর্তী জীবনে বাঁকা আঙুলের ইঙ্গিত নিজ জীবনে সে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে! অনিচ্ছুক মক্কেলের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার টেকনিক ও লোওয়াজিমা সর্বদা তাহার প্রস্তুত। কেহ কখনো এ পর্যন্ত বলিতে পারে নাই যে হরিচরণ দাস টাকা আদায়ে ঠকিয়া গেল। তাহার অগাধ অর্থ। এবং তাহার পত্নীটি উন্মাদ, আর দুইটি সন্তানের মধ্যে একটি বোবা।

এমন সময়ে নবীননারায়ণকে সঙ্গে করিয়া তারিণীবাবু প্রবেশ করিলেন। নবীনকে দেখিবামাত্র হরিচরণ লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল আর মুখে বিনীত হাস্য বিকাশ করিয়া, হাত কচলাইয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া এমন ভাব করিতে লাগিল যে অত্যন্ত প্রভুভক্ত কুকুরও তেমন করিয়া বিদেশাগত প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে পারে না। হরিচরণ দাস কুকুরের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

সে বলিল—ছোটবাবু শহরে এসেছেন শুনেছি, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমার এখানে তাঁর পায়ের ধূলো পড়লো।

তারিণীবাবু বলিলেন—উনি জামিনের তদ্বিরের জন্যই আপনার কাছে এসেছেন।

হরিচরণ বলিল—এ আর শক্ত কি! আমাকে তলব করলেই যেতাম।

নবীন বলিল—সে কি হয়? আমার কাজ, আমারই আসা উচিত।

হরিচরণ বলিল—আপনার কাজ আমাদেরই কাজ, কি বলেন? এই বলিয়া সে তারিণীবাবুর দিকে তাকাইল।

তারিণীবাবু বলিলেন—যা'হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

হরিচরণ বলিল—ছোটবাবু যা হুকুম করবেন তাই হবে।

তখন তারিণীবাবু নবীনকে বলিল—শুনলে তো বাবা, তোমার আর থাকা নিষ্প্রয়োজন, তুমি আর কষ্ট ক'রে থেকে কি করবে, বাড়ি যাও।

নবীন নিষ্কৃতি পাইয়া পলাইয়া বাঁচিল। তারিণীবাবুও বাঁচিলেন—কারণ নবীনের উপস্থিতিতে নিজের মন ও পরের টাকার থলি খুলিয়া তদ্বির করা কঠিন।

তারিণী ও হরিজন দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে হরিচণকে নগদ হাজার টাকা এবং সরকারী উকিলকে পাঁচ শত টাকা দিলে তাহারা আর জামিনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবে না। তারিণীবাবু জামিনের তদ্বির বলিয়া নবীনের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা আদায় করিল। দেড় হাজার পূর্বোক্ত দুইজনকে দিয়া পাঁচশত নিজে রাখিল। সম্পূর্ণ রাখিতে পারিল না। একশত টাকার একখানা নোট বিজয়কে ভাঙাইতে দিল, সে আর তাহা ফেরৎ দিল না। ইহাতে তারিণীর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ হইল না, শিষ্যের কৃতিত্বে গুরু হিসাবে সে একপ্রকার সূক্ষ্ম গর্ব অনুভব করিল।

যথাসময়ে জজের নিকটে জামিনের দরখাস্ত 'move' করা হইল। জজ রোখ ধরিয়া বসিলেন, নগদ দশ হাজার টাকা জামিন দিতে হইবে। নবীনের উকিল বলিল, তাহার প্রয়োজন নাই; নবীন নিজে জামিন হইতেছে, সে মস্ত জমিদার। কিন্তু জজ সাহেব কিছুতেই শুনিলেন না। এমনকি সরকারী উকিল ও হরিচরণ অবধি উভয়েই বলিল যে, নগদ জামিনে প্রয়োজন নাই। তাহারা অকৃতজ্ঞ নহে। কিন্তু জজ সাহেব অটল। জজ সাহেব ছোঁয়াটে কম্যুনিস্ট, জমিদারির প্রতি তাঁহার ঘোরতর অনাস্থা, নগদ টাকা ছাড়া তিনি আর কিছু বোঝেন না। অগত্যা নগদ জামিনের হুকুমই বজায় রহিল।

হুকুম শুনিয়া নবীন মাথায় হাত দিয়া বসিল। নগদ দশ হাজার টাকা অবিলম্বে তাহার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কয় বৎসরের মামলা-মোকদ্দমায় তাহার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ প্রায়। এত নগদ টাকা সে কোথায় পাইবে। সে শুষ্ক মুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মুক্তামালাকে কিছু বলিল না। কিন্তু কথাটা মুক্তামালার অজ্ঞাত থাকিল না। শশাঙ্কের নিকটে বাদলি শুনিল, বাদলির নিকটে মুক্তামালা শুনিল।

মনের দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া নবীননারায়ণ ছাদের উপরে পায়চারি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রহরে প্রহরে বাড়িতে বাড়িতে এক সময়ে আকাশ নক্ষত্রে ভরিয়া গেল—আর একটিমাত্র নক্ষত্র বসাইবার স্থানও যেন অত বড় আকাশটাতে নাই। অন্যদিন আদালত হইতে ফিরিয়া সে মুক্তামালার কাছে বসিত, আদালতের অভিজ্ঞতা বলিত; আজ মুক্তামালার কাছেই গেল না। মুক্তামালা ডাকিল, কাছে আসিল। কোনো সাড়া পাইল না। আহারের সময় মুক্তামালা ডাকিল, নবীন যন্ত্রের মতো আহার সমাধা করিয়া আবার ছাদের উপরে আসিয়া পায়চারি শুরু করিল। সে ভাবিতেছিল—দশ হাজার টাকা অবিলম্বে সে কোথায় পাইবে? না পাইলে লোকগুলাকে জামিনে খালাস করা যাইবে না, তবে তাহারা কি হাজতেই পচিতে থাকিবে? উকিল বলিয়াছিল, আসামীদের জামিনে খালাস করিয়া আনিতে না পারিলে 'কেস' খারাপ হইয়া যাইবে, সকলেরই দণ্ড হইতে পারে। নবীন ভাবিতে লাগিল—সে সব তো পরের কথা! আপাতত দশ হাজার টাকা সে কোথায় পায়? ভাবিয়া ভাবিয়া সে কোনো কূল পাইল না।

রাত্রি অনেক হইলে মুক্তামালা তাহাকে শুইতে ডাকিল। যন্ত্রচালিতবৎ নবীন আসিয়া শয়ন করিল—কিন্তু ঘুম কোথায়? সে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মুক্তামালার কণ্ঠস্বরে সে চোখ মেলিল।

মুক্তামালা বলিল—তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি—নাও।

—কি? বলিয়া নবীন চোখ মেলিল।

'এই নাও' বলিয়া ছোট একটি বাক্স স্ত্রী স্বামীর হাতে দিল।

নবীন হাতে লইয়া দেখিল, মখমলের আবরণে ঢাকা ছোট একটি বাক্স।

মুক্তামালা বলিল—ঢাকনাটা খোলো।

মখমলের আবরণ সরাইতেই একটি হাতীর দাঁতের কারুকার্য করা বাক্স প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

নবীন শুধাইল—এর মধ্যে কি আছে ?

মুক্তামালা বলিল—খুলেই দেখো না।

কৌতূহলী নবীন বাক্সের মুখ খুলিল, অমনি অজস্র রশ্মিবিচ্ছুরণ তাহার চোখ ঝলসিয়া দিল, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে সে বুঝিল অনেকগুলি অলঙ্কার !

বিস্মিত নবীন শুধাইল—এ কার ?

মুক্তামালা প্রসন্নমুখে বলিল—আমার, কাজেই তোমার।

নবীন মূঢ়ের মতো শুধাইল—কি হবে ?

মুক্তামালা বলিল—জামিনের টাকা।

—জামিনের টাকা ! তুমি শুনলে কোত্থেকে ?

—যেখান থেকেই হোক, শুনেছি।

নবীন দৃঢ়স্বরে বলিল—না, তা হবে না। এই বলিয়া সে বাক্সের ডালা বন্ধ করিল।

মুক্তামালা বলিল—আচ্ছা দাও তবে, রেখে দিই। আজ থেকে আমার অলঙ্কার পরা শেষ।

চমকিয়া উঠিয়া নবীন স্ত্রীর অঙ্গের দিকে চাহিল, দেখিল কোথাও অলঙ্কার নাই, কেবল দুই মণিবন্ধে খান দুই করিয়া চুড়ি অবশিষ্ট আছে।

নবীন শয্যাত্যাগ করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, একি ! কেন এমন করতে গেলে ?

তারপরে সে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল—তুমি কি ভাবো আমার এমনি অর্থাভাব যে, তোমাকে নিরলঙ্কার ক'রে মামলার খরচ চালাবো ? তুমি কি ভাবো আমি এতই নির্মম, এতই পাষণ্ড !

আবেগের সহিত সে বলিতে লাগিল, না, না, কিছুতেই তা হবে না। আমার মামলা-মোকদ্দমা বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত রসাতলে যাক্, তবু এ হ'তে পারে না !

গহনাগুলি দিবার সঙ্কল্পে অবশ্যই মুক্তামালার কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে স্বামীর যে প্রণয় প্রকাশিত হইতে দেখিল তাহাতে তাহার সব ক্ষতি

পূরণ হইয়া গেল। অলঙ্কার তো স্বামীর প্রীতির চিহ্ন, আজ সেই প্রীতিকেই যখন সে এমন প্রকট দেখিল—এখন চিহ্নগুলা গেলে কি এমন ক্ষতি? আর এগুলা থাকিলে কি প্রীতির পরিমাণ বাড়িবে? বরঞ্চ এগুলার ত্যাগের সঙ্কল্পেই তো প্রীতি নিষ্কোষিত হইয়া পড়িল! এ যে অপ্রত্যাশিত! অপ্রত্যাশিত সুখই তো সুখ! যে-সুখ প্রত্যাশিত সে তো ধার-পড়িয়া-যাওয়া খড়্গ!

নবীন কাণ্ডজ্ঞানহীন বালকের মতো, যুক্তিবিরহিত প্রণয়ীর মতো কেবলি বলিয়া যাইতে লাগিল—না না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না! আমার সব রসাতলে যাক্, তবু এ হ'তে পারে না।

ড্রেসিং টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া বাম করতল টেবিলের উপরে রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুক্তামালা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার ছায়া কাকচক্ষু দর্পণে প্রতিবিম্বিত। ঘোমটা স্থানচ্যুত, ললাট নির্মল, ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ, কুঞ্চিত চূর্ণালক নূতন আষাঢ়ের মেঘের মতো কমনীয় কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া অংসবিলম্বী, কপোল পাণ্ডুরাভ, চোখ দুটিতে ঘনীভূত অপরিমেয় করুণা, প্রাচীন হস্তিদন্তের-বর্ণাভ নিটোল সুডৌল সৌন্দর্যের দ্রবীভূত চন্দনে চন্দ্রিকা-চিক্কণ বাম বাহুর করতল টেবিলের উপরে ন্যস্ত। সরোবরে পূর্ণবিকশিত পদ্ম যেমন না কাঁপিয়াও কম্পিত বলিয়া মনে হয়—তেমনি তাহার ছায়াটি বেপথুমতী! দর্পণ-বিম্বিতা পদ্মিনী কি আরো সুন্দরী ছিল? লোকে ছায়াকে মিথ্যা বলে কেন? কই, ওই ছায়াময়ীর অলঙ্কারের অভাব তো চোখে পড়ে না। যে প্রকৃত সুন্দরী, অলঙ্কারে তাহার সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হয় মাত্র। মুক্তামালার চাঁপারঙের শাড়ির অঞ্চল চাঁপার গন্ধে বিমূঢ় বসন্তের বাতাসের মতো ঈষৎ সঞ্চারিত হইতেছিল। আর দক্ষিণ বাহুতে ব্লাউজের হাতটি কেমন বাহুর মাপে মাপে খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে—এক তিলও অবকাশ নাই, গৌর বাহু বেড়িয়া কচি কলাপাতা ব্লাউজের প্রান্ত।

নবীন তখনো বলিতেছিল—না, না, সব রসাতলে যাক্!

মুক্তামালা ধীরে ধীরে বলিল—তবে তাই যাক্। এই বলিয়া সে অলঙ্কারের বাক্সটি তুলিয়া লইয়া বলিল—এই অলঙ্কারগুলোও রসাতলে যাক্।

নবীন বলিল—ও কি করো! ও কি করো!—এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। মুক্তামালা জানালা দিয়া বাক্সটা নদীগর্ভে ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল।

বাক্সটা টেবিলের উপর নামাইতেই তাহর দৃষ্টি ছায়াময়ীর দিকে পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল। ওই কি তাহার পত্নীর ছায়া? হঠাৎ তাহার মনে হইল, ওই ছায়াটিই যেন সত্য। কায়া তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। পদ্মিনীকে দর্পণে দেখিয়া দিল্লীর সুলতান তবে প্রতারিত হন নাই। কিন্তু লোকটা নিতান্ত ভাগ্যহীন বলিয়াই সত্যের রহস্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল। নবীন চমকিয়া উঠিল। এক শ্রেণীর সৌন্দর্য আছে যাহাতে লোকে উন্মত্ত হইয়া ওঠে, সে সৌন্দর্যের দেবতা—রতি ও মদন। আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্যে লোকের মনে পূজার ভাব জাগ্রত করে, তাহার দেবতা—লক্ষ্মী! মুক্তামালার সৌন্দর্য দ্বিতীয় শ্রেণীর, অন্তত এই মুহূর্তে তো বটে! নবীন, কি করিতেছে বুঝিবার আগেই, তাহার পায়ের কাছে আসিয়া নত হইয়া বসিয়া পড়িল, কিছু বলিতে পারিল না, কেবল মাথা নাড়িয়া প্রকাশ করিতে থাকিল—না, না!

তখন অসীম করুণাভরে মুক্তামালা হাত ধরিয়া স্বামীকে দাঁড় করাইল, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমার গহনা নেই ব'লে তুমি দুঃখ করছো? দেখো আছে কি না।

এই বলিয়া বুকের ব্লাউজ অপসারিত করিয়া স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বুকের উপরে চুম্বনের শতনরী হার অঙ্কিত করিয়া লইল। তারপরে স্বামীর মুখ দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে আনিয়া বলিল—দেখলে তো?

নবীনের চোখে তখন জল। মুক্তামালার মুখে তখন হাসি। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বড় কে? স্বামী? স্ত্রীর কাছে পুরুষ চিরকালই শিশু। একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েও তাহার পিতার চেয়ে অনেক বিষয়েই বড়। ইভ বড় বলিয়াই আদমকে লুব্ধ করিতে পারিয়াছিল। পুরুষ বুদ্ধিজীবী, নারী সংস্কারজীবিনী, সংস্কারের তুলনায় বুদ্ধি নিতান্ত নাবালক। পুরুষ নারীর খেলার পুতুল। তবে যে কখনো কখনো পুরুষকে সে বড় বলিয়া স্বীকার করে—সেটাও খেলার রকমফের মাত্র।

তখন মুক্তামালা বলিল—হ'ল তো? এবারে এগুলো নাও।

নবীন বলিল—নিতেই হবে কি?

মুক্তামালা বলিল—কেন না নেবে?

নবীন বলিল—তবে দাঁড়াও। আপত্তি ক'রো না। আজ শেষ বারের জন্যে একবার পরো—কাল সকালে নেবো। সে বলিল—না, আমি নিজ হাতে পরাই।

মুক্তা সস্নেহে হাসিয়া বলিল—তাই পরাও।

তখন বাক্স হইতে একটি একটি করিয়া অলঙ্কার তুলিয়া টেবিলের উপর স্তূপীকৃত করিল। তারপরে মুক্তামালার বসন খুলিয়া ফেলিয়া দিল। করুণাময়ী পাষাণী আজ কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। নবীন স্বহস্তে তাহার সীঁথি হইতে পায়ের নূপুর অবধি যেখানে যে অলঙ্কার সাজে, পরাইয়া দিল। অলঙ্কার পরিয়া মুক্তামালার রূপ বাড়িল না। পূর্ণচন্দ্রের আর বৃদ্ধি সম্ভব কি? অলঙ্কারের শোভা বাড়িল। বিস্মিত শিল্পীর দৃষ্টিতে নবীন তাহাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল—নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—কি সুন্দর!

মুক্তামালার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিল। সে কি সৌন্দর্যগর্বে, না স্বামীর পরিশ্রমের সার্থকতায়?

নবীন আবার বলিল—মুক্তি, তুমি কী সুন্দর!

মুক্তামালা সস্নেহে স্বামীর মস্তকে হাত দিয়া বলিল—পাগল!

এই দাম্পত্য-অভিনয়ের দৃশ্যটি আর কেহ দেখিল না, কেবল আকাশের নক্ষত্ররাজি যাহারা সর্বকালের সর্ব দৃশ্যেরই নীরব সাক্ষী, বাতায়নের আকাশপথে কেবল তাহারাই লক্ষ্য করিল।

১

বাংলা দেশের গ্রামগুলির কি যেন এক মোহিনী শক্তি আছে। মানুষকে কখন্ যে এই গ্রামগুলি আকর্ষণ করিতে শুরু করে কেহ বলিতে পারে না, হঠাৎ এক সময়ে মানুষে আবিষ্কার করিয়া বসে যে, সে বন্দী। গ্রামগুলি যে অবিমিশ্র ভালো এমন বলিতেছি না, ভালোর কি মোহিনী শক্তি থাকে? শয়তানের মোহিনী শক্তি কি দেবদূতে আছে? মন্ত্রের জাদু কি খাদ্যে সম্ভব? স্বর্গের ইন্দ্রজাল পৃথিবী কোথায় পাইবে? বাঙলার গ্রামগুলি শয়তানের উচ্ছিষ্টীকৃত স্বর্গ। স্বর্গই, তবে তাহাতে শয়তানের হাত পড়িয়াছে; অমৃতই, তবে তাহা উচ্ছিষ্ট।

মানুষকে মহৎসঙ্কল্পচ্যুত করিতে এমন দ্বিতীয়টি আর নাই। উদ্যম হইতে আলস্যে, সঙ্কল্প হইতে শৈথিল্যে, জাগরণ হইতে স্বপ্নে, বাস্তব হইতে বায়বীয়ে, প্রচেষ্টা হইতে নৈষ্কর্ম্যে প্রেরণ করিতে সত্যই এমন দ্বিতীয়টি আর নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি গ্রামগুলির দোষ দিব? স্বর্গে যে শয়তান প্রবেশ করিয়াছিল, সে তো স্বর্গের দোষে নহে। বাঙলার পল্লী-অঞ্চলের মজা পুষ্করিণীগুলি এখন ম্যালেরিয়ার আকর—কিন্তু তাই বলিয়া যে-সব পরোপকারী এসব খনন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কি দোষ দেওয়া যায়? দোষ যারই হোক, দোষ যতই হোক, এমন মোহকর বস্তু জগতে বুঝি আর নাই।

এই আম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা, শটি-ভাটির আগাছায় পূর্ণ, মজ্জিতপ্রায় নদী-সরোবরের লীলাস্থল, প্রকৃতি যেখানে প্রবল, মানুষ যেখানে দুর্বল, দিবাভাগ যেখানে রাত্রির চেয়ে মৌন, আবার রাত্রি যেখানে চন্দ্রলোকের ঐশ্বর্যে দিবসের

চেয়েও প্রোজ্জ্বল, বন যেখানে গৃহসংলগ্ন, গৃহস্থ যেখানে পোষমানা, গবাদি যেখানে উদ্দাম, শ্বাপদ যেখানে স্বাধীন, উৎক্রোশ-ফিঙা-কাক, চোখ গেল, বউ কথা কও, শালিখ, কোকিল, ঘুঘু, হুতুম ও বাদুড়, পেঁচা ও পাপিয়া, শিয়াল, সজারু, নেউল, নেকড়ে, সাপ ও শ্বাপদ—সকলেই এই মোহিনী মায়ার সঞ্চারী ভাব—ইহাকে সঞ্চারিত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া মানুষের মনের দিকে বিতানিত করিয়া দিতেছে।

শহরের লোকে গ্রামের এই রহস্যের কথা অবগত নয়। যাহারা অতিথির মতো এখানে আসে, দু'রাত্রির জন্য আসে, কেবল দেখিবার জন্য আসে, তাহারা এ রহস্যের কথা জানিতে পায় না। কিন্তু দু'রাত্রির স্থলে তিন রাত্রি হইলেই মোহিনী তাহার ক্রিয়া শুরু করিয়া দেয়। মানুষে যখন সচেতন হইয়া ওঠে, তাহার অনেক আগেই সে বন্দী।

এই যেমন নবীননারায়ণ দু'দিনের জন্য জোড়াদীঘিতে আসিয়াছিল; কিন্তু আর কি সে ফিরিতে পারিবে? এখন কি সে সম্পূর্ণভাবে পরায়ত্ত নহে? কোনো কোনো বন্যবৃক্ষ আছে, নিকটস্থ প্রাণীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করে। ক্ষুধিত পাষাণের দোসর, ক্ষুধিত প্রকৃতি এই গ্রামগুলি। সেই ক্ষুধিত প্রকৃতির বন্দী নবীননারায়ণ।

তাহার কলিকাতা-বাসের মহৎ সঙ্কল্প এখানে আসিয়া কক্ষচ্যুত; এমন কি সদরে গিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়াই অতীতের সমস্ত জের চুকাইয়া দিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে—সেই শুভ সঙ্কল্পও টিকিল না, কেমন বানচাল হইয়া গেল।

প্রাচীন প্রাসাদের মতো প্রাচীন পল্লীগুলিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে, সে ব্যক্তিত্ব সর্বনাশকর, সে ব্যক্তিত্ব মায়ামোহকর, সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব মানুষকে অতলগর্ভ অতীতের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। গীতায় প্রোক্ত সৈন্যশ্রেণী যেমন প্রাণহীন, গ্রামগুলিও তেমনি অতীতজীব। বাঙলা দেশের আকাশেই পাশাপাশি দুই কাল বিরাজমান, গ্রামের অতীতাকাশ, শহরের বর্তমানাকাশ। যে কোনো লোক ইচ্ছা করিবামাত্র গ্রাম হইতে শহরে গিয়া পাঁচশ' বৎসর

অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে, যে কোনো লোক ইচ্ছা করিলে শহর হইতে গ্রামে গিয়া পাঁচশত বৎসর পিছাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা বিপজ্জনক। নদীস্রোতের অন্তর্গত 'দহে' পড়িলে যেমন উদ্ধার পাওয়া কঠিন, কালস্রোতের এই অতীতগর্ভ 'দহ'গুলিও তেমনি বিপদে পূর্ণ। পড়িলে ওঠা কঠিন। কতজনে পড়িয়াছে আর উঠিতে পারে নাই। নবীননারায়ণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পারিল না। পুঞ্জীভূত অতীতের স্মৃতি পাষাণের ভারের মতো তাহাকে তলাইয়া লইয়াই চলিল।

২

সদরের মামলা মিটিয়া গেলে নবীননারায়ণ ও মুক্তামালা জোড়াদীঘিতে ফিরিল। নবীন স্থির করিয়াছিল যে, যেমন করিয়াই হোক, ক্ষতি স্বীকার করিয়াই হোক আর অপমান সহিয়াই হোক, অতীতের ভুলভ্রান্তির জের চুকাইয়া দিয়া তাহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে। প্রথমেই যে কাজটি সে করিয়া বসিল, জোড়াদীঘির শাসননীতিতে তাহা অভাবিত। নবীন সরাসরি কীর্তিনারায়ণের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। কীর্তি তখন প্রশস্ত ফরাসের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গড়াইতেছিল। পদশব্দ শুনিয়া বলিল—কে, দুর্গাদাস নাকি?

কেহ উত্তর দিল না। তখন সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—নবীন যে! সে শুনিয়াছিল যে, নবীনরা গ্রামে ফিরিয়াছে; কিন্তু সে যে তাহার বাড়িতে আসিবে, কিছুতেই কল্পনা করিতে পারে নাই। সে উঠিয়া বসিল—কিন্তু কি কথা বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নবীন ফরাসের উপরে বসিল। কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না। নবীন ভাবিল, কি করিয়া আরম্ভ করিবে। কীর্তি ভাবিল, নবীনের মতলব কি, কিভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। দু'জনেই নীরব। নবীন বুঝিল, আর অধিকক্ষণ কথা না বলিলে নীরবতা দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিবে—তখন আর কথা বলা সম্ভব হইবে না, হয়তো নীরবেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই সে মনে মনে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়া

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দ্রুত বলিয়া গেল—আমি আর মামলা-মোকদ্দমা চালাবো না। যত ক্ষতি স্বীকার করতে হয় আমি রাজি আছি, আপনার কি কি চাই বলুন।

কীর্তি এমনোতরো প্রস্তাব জীবনে শোনে নাই। সে ভাবিয়া পাইল না, ইহা বিদ্রূপ না সত্য। সে চুপ করিয়া রহিল।

নবীন দ্রুত বলিয়া চলিল। ওই দ্রুতির দ্বারা ক্ষতস্থানকে যত শীঘ্র সম্ভব সে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চায়। যাহা বলিতে কষ্টকর, অথচ না বলিলেই নয়, কোনরূপে তাহা বলিয়া ফেলিবার এই প্রচেষ্টা। সে বলিতে লাগিল—জমিদারি করা, মামলা-মোকদ্দমা করা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। পরের উপকার হবে ভেবেছিলাম অশথ গাছটা কাটলে—কিন্তু ফলে দেখছি, পরের উপকার দূরে থাক্—নিজের অপকারের অন্ত নেই। একটা মামলা থেকে আর একটা মামলার সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থব্যয় আর মানসিক অশান্তির অবধি নেই। এ রকম ক'রে দীর্ঘকাল চালানো······না, এ আমার দ্বারা হবে না। যেমন ক'রেই হোক, সব মিটিয়ে দিয়ে আমি পালাতে চাই। আপনার কি কি দাবি আছে বলুন, আমি সব স্বীকার ক'রে নিয়ে দলিল ক'রে দিচ্ছি।

নবীনের কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাবে সে যে সত্য কথাই বলিতেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাত্র করিতেছে না, কীর্তি বেশ বুঝিতে পারিল। আর সে যে অবনতি স্বীকার করিয়া অযাচিতভাবে তাহার বাড়িতে আসিয়াছে—তাহার আন্তরিকতার ইহাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কীর্তি সমস্তই বিশ্বাস করিল—কিন্তু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

নবীন অনেকক্ষণ ঝোঁকের মাথায় বকিয়া থামিল। এসব ব্যাপারে মুস্কিল এই যে, একবার থামিলে পুনরায় আরম্ভ করা কঠিন—সূত্রপাতের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। বিশেষ, সে তো অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে—এখন উত্তরের আশা সে করিতে পারে।

কিন্তু কীর্তিনারায়ণ পূর্ববৎ নীরব। তাহার ইচ্ছা, কিছু বলে এবং দু'চারটা সময়োপযোগী ভালো কথাই বলে। তাহার ইচ্ছা বলে যে, ভায়া, আমিও আর

গোলযোগ করিতে চাই না, আমারও ক্ষতি বড় কম হয় নাই, অনেকদিন হইতেই সব মিটাইয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু পাকচক্রে পারিয়া উঠিতেছি না। এখন তুমি আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে, কাহারো যাহাতে আর অধিক ক্ষতি না হয়, এসো এমন একটা আপোষ করিয়া লই। কিন্তু কথাগুলি সে মুখে বলিতে পারিল না, ভাষার উপরে তেমন দখল নাই বলিয়া, তাহা ছাড়া তাহার অভ্যাসও একটা অন্তরায়। কীর্তিনারায়ণ সাধু প্রকৃতির লোক নহে; তাহার প্রকৃতির মধ্যে এখনো সাধুতার দু'চারিটি সূতা আছে; কিন্তু অভ্যাসে সে অবিমিশ্র অসৎ। সেই অভ্যাস এখন তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অভ্যাস নাই কাহাকেও মুখে মধুর কথা বলিবার—প্রকৃতির মধ্যে সাধুতার আবেদন থাকিলেও অভ্যাস তাহার পথ করিয়া দেয় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ হইল নবীননারায়ণ নীরব, কিছু না বলিলে সে হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতে পারে, আপোষের এমন অযাচিত সুযোগ নষ্ট হইবে। কাজেই কীর্তি একবার নড়িয়া বসিল; গোটা দুই পান মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এইভাবে ভাষার পথকে আরো বিঘ্নিত করিয়া বলিল—আপত্তি কি। আপোষ ......আচ্ছা। বেশ তো, ভালোই।

নবীন বলিল—তা'হলে আপনার সম্মতি আছে ব'লে ধ'রে নিলাম।

কীর্তি বলিল—তা এক রকম বই কি।

নবীন তাহাকে আর আয়াস স্বীকার করিতে বাধ্য করিল না। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনি অতর্কিতে প্রস্থান করিল, যাইবার সময়ে বলিয়া গেল—তাহ'লে আপনি একটু ত্বরা করবেন।

নবীন প্রস্থান করিলে কীর্তি আবার শুইয়া পড়িল। এইটুকু মানসিক পরিশ্রমেই সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল, হাঁকিল—বাতাস!

পাখাওয়ালা দূরে সরিয়া গিয়াছিল, স্বস্থানে আসিয়া জোরে পাখা টানিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা উভয় শরিকের কর্মচারী-মহলে প্রচারিত হইয়া

গেল এবং তাহারা সমূহ বিপদের আশঙ্কায় হতাশ হইয়া পড়িল। বাবুদের মধ্যে 'কাজিয়া' লাগিয়া উঠিলে তাহার প্রত্যক্ষ সুফল ভোগ যাহারা করে, কর্মচারিগণ তাহাদের অন্যতম ও প্রধান। তাহাদের বিশ্বাস, ছয় টাকা বেতনে মুহুরিগিরি ও পঁচিশ টাকা বেতনে নায়েবি করিবার জন্য তাহারা দুর্লভ মানব-জন্ম গ্রহণ করে নাই। তবু যে এমন কাজ করিতে হয়, তাহা কেবল মামলা-মোকদ্দমা বাধিবে এই আশায়। তখন বাবুদের টাকার থলি শরৎ-প্রভাতের পূর্ণবিকশিত পদ্মের মতো আপনি উন্মোচিত হইয়া গিয়া স্বর্ণরেণু উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, সুধাগন্ধের আমন্ত্রণে দিগ্বিদিকের ভ্রমরদল লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া আসে। সেই শুভ প্রভাতের আশ্বাসেই বাবুদের কর্মচারীর দল এত কষ্ট স্বীকার করে। সাধারণ সময়ে যে বাবু মাছের দাম চার আনা বেশি লাগিলে তর্জন-গর্জনের অবধি রাখেন না, মামলা বাধিয়া উঠিলে তিনিই একখানা জাবেদা নকলের জন্য যোল টাকা এবং চোরাই নকলের জন্য ততোধিক ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। লড়াইয়ের আসল অস্ত্র সোনার গুলী, নিতান্ত প্রাকৃত জনেই মাত্র লাঠি-বন্দুকের উপরে ভরসা রাখে।

জোড়াদীঘির বাজারে জগু সরকারের দোকানঘরে সন্ধ্যাবেলা উভয় শরিকের কর্মচারী ও তদ্বিরকারকদের একটি জয়েণ্ট মিটিং বসিয়াছে। মিটিংয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য, কি করিয়া বাবুদের আপোষের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যায়। এই গতকল্য যাহারা বাবুদের বিবাদের সূত্রে শত্রু ছিল, আজ তাহারা পরম মিত্রভাবে পরামর্শে নিযুক্ত। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, কেহ কাহারো শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সবই অবস্থাচক্রের ফের।

নীলাম্বর ঘোষ দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাকু সেবন করিতেছে—বাকি সকলে নীরব। নীরবতার কারণ আর কিছুই নহে, এইমাত্র তিনি একটি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সবই মায়া। শ্লোক-মাহাত্ম্যে সকলে নীরব, কিন্তু উক্ত শ্লোক ছ'আনির নায়েব যোগেশের পক্ষে 'টিয়ার-গ্যাস'এর কাজ করিয়াছে। সমস্তই মায়া হইলে তাহার গৃহিণীও মায়া—ইহাই স্মরণ করিয়া সে নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে।

এমন সময়ে নীলাম্বর ঘোষ একটি চোখ খুলিল। সকলে বুঝিল, খুড়ো কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নীলাম্বর ঘোষ আরম্ভ করিল—হুঁ, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। দেখো তোমরা, কিছুতেই হ'তে দেবো না।

তারপরে সরোষে সবিস্ময়ে বলিল—অকালে আপোষ! এমন অধর্ম ভগবৎ-গীতার দেশে কখনো হ'তে পারে না। স্বয়ং ভগবান কি করেছিলেন? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর লড়াই বাধিয়ে দিয়ে একটা সৈন্য জীবিত থাকতেও তো লড়াই থামতে দেন নি। এমন কি ইচ্ছামৃত্যু যে ভীষ্মদেব, তাঁকেও তো মৃত্যু স্বীকার করতে হয়েছিল। আর সেই দেশে কিনা—অকালে মাঝপথে দুইপক্ষে আপোষ হয়ে যাবে!

বদ্যিনাথ অল্পবয়স্ক, কিছু বেশি কথা বলে, সে বলিল—কিন্তু খুড়ো, বাবুদের এই মামলার সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ স্থাপন করা কি উচিত?

খুড়ো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কেন নয়? ধর্ম কি শিকেয় তুলে রাখবার জন্যে? হুঁ, তোমার আমার কাজে যদি না লাগলো, তবে ধর্মের কর্ম কি? হুঁ, আমার ক্ষেতে এবার কি রকম ফলন হবে, তা ওই মহাভারতে নিশ্চয় আছে, নতুবা অতবড় মহাভারত মানুষে সহ্য করছে কেন? হুঁ।

যোগেশ বলিল—যা নেই এ ভারতে, তা নেই এ ভারতে।

নীলাম্বর নিজের সমর্থন পাইয়া কেবল বলিল—হুঁ। কিন্তু হুঁকায় টান দিতে গিয়া কেবল জল মাত্র উদ্গাত হইলে বুঝিতে পারিল—ধর্ম-ব্যাখ্যার সুযোগে ঘাড়টান পঞ্চানন কল্কেটা তুলিয়া লইয়াছে। কাজেই খুড়ো নিতান্ত উদারভাবে হুঁকাটা অন্য একজনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—নাও। তবুও হুঁকাটা পঞ্চাননকে দিল না। নারায়ণ ও নারায়ণী-সেনার মতো হুঁকা ও কল্কে দুইপক্ষের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বন্টিত হইল। নীলাম্বর ঘোষ বৃথা মহাভারত পড়ে নাই।

এবারে নীলাম্বর ঘোষ এক চোখ বুজিয়া চিন্তা করিতে করিতে অপর চোখ খুলিয়া শ্রোতাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে করিতে আরম্ভ করিল—হুঁ, দেখো

না কি গ্রহের ফের! আমি পীতু আর দিগুকে দুইজনকে দুইপক্ষে জুটিয়ে দিলাম যে দু'জনের চেষ্টায় কাজ তাড়াতাড়ি এগোবে—কিন্তু……হুঁ। কাজটা কি জানই তো! ওই যে পুবদিকের টিনের ঘরখানা ফেলে দিয়ে দালান গাঁথতে শুরু করেছিলাম। তা অনেকটা এগিয়েছে, চারদিকের দেয়াল গাঁথা শেষ, এখন কেবল ছাদটা হ'লেই হয়। হুঁ! আমার পীতু আর দিগু দু'জনেই বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। পেতোও যেমন, আবার তেমনি সমস্তই বুড়ো বাপের হাতে দিত। যেদিন শুনলাম যে, পীতুর সাক্ষ্যে অপর পক্ষের উকিল একটাও সূচ ফোটাতে পারেনি, সেদিন কি আমার আনন্দ! আদালত-সুদ্ধ সেদিন ওই একমাত্র বলা-কওয়া—হাঁ, সাক্ষী দিচ্ছে বটে নীলাম্বর ঘোষের বেটা! কই, কারো তো সাহস হ'ল না যে বলে মিথ্যা বলছে।

জগু সরকার এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, বাজে খরচ ও বাজে কথার লোক সে নয়। এবারে সে বলিল—সে কথা ঠিক ঘোষ মশাই, বানানো সত্যি আসল সত্যির চেয়ে অনেক বেশি জৌলুষদার।

নীলাম্বর বলিল—তা হোক। কিন্তু কেউ ধরতে পারলো কি মিথ্যা ব'লে? তাহ'লেই হ'ল!…তাছাড়া সত্যি কথা আজকালকার দিনে আর কে বলছে? আমরা গরিব মানুষ, আমাদের সব সময়ে সত্যি বলতে গেলে চলবে কেন? হুঁ! ও বিলাসিতা বড়মানুষেরা করতে পারে। তাই ব'লে আমি যে গুরু-পুরুতের কাছে মিথ্যা বলি, এমন কোন্ শালা বলতে পারে।

পুরোহিতের উল্লেখে কেহ কেহ শুধাইল—কেশরী ঠাকুরের অনুপস্থিতির কারণ কি? জগু সরকার বুঝাইয়া বলিল—ভট্টাচার্যের আসবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি ও শশাঙ্ক কালীশপুরে শার্দুল-স্বস্ত্যয়ন করতে গিয়েছেন। বোধ করি, আমাদের মিটিং ভাঙবার আগেই ফিরতে পারেন।

নীলাম্বর ঘোষ দুই হাত নাড়িয়া এবং দুই চোখ খুলিয়া বলিল—দেখ তো কি গেরো! এখন যদি বাবুদের মধ্যে আপোষ হয়, তবে আমার আয়ের পথ বন্ধ। যে চারটা দেয়াল তুলেছি সমুখের বর্ষাতেই তা প'ড়ে যাবে। আমি এখন কি করি?

বদ্যিনাথ বলিল—আপনি তো পণ্ডিত। সর্বনাশ যখন উপস্থিত, অর্ধ পরিত্যাগ করুন। দেয়ালের উপরে টিন বসিয়ে নিন! পুরো পাকা না-ই হ'ল—অর্ধেকই বা ক'জনের হয়।

এসব অর্বাচীন উক্তির কি উত্তর নীলাম্বর দিবে। সে অপ্রসন্ন হইয়া চুপ করিয়া থাকিল।

পাণ্ডিত্যের জন্যই হোক আর উদারতার জন্যই হোক, নীলাম্বর মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ তাহার একার মাত্র নহে। উপস্থিত সকলেরই এই অভিযোগ। প্রত্যেকেরই সাংসারিক উন্নতির পরিকল্পনা অর্ধপথে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। কাজেই মুখে কেহ কিছু না বলিলেও সকলেই নীলাম্বরের প্রতি, অর্থাৎ নিজের প্রতি, সহানুভূতিশীল। কেবল জগু সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ লাভের কারণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও সে আপোষ চাহে না—কারণ লোকটা বিনা কারণে পরের ক্ষতি চায় এবং পরের ক্ষতিতে আনন্দ পায়। পরের ক্ষতির প্রতি তাহার শিল্পিসুলভ কর্মফলহীন বিবিক্ত মনোভাব এই জাতীয় লোকেরাই সংসারে সবচেয়ে মারাত্মক।

এবারে জগু সরকার মুখ খুলিল—বলিল—আপোষ হ'লে সকলেরই ক্ষতি গ্রামের ছোট-বড় প্রধান পরামাণিক কেউই আপোষ চায় না। কিন্তু আপো[illegible] যাতে না হ'তে পারে, তার উপায় কি?

সক[illegible] তাহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিল—তবে উপায় কি?

নীলাম্বর বলিল—এখন তোমরা সকলে আছ, একটা উপায় স্থির ক'রে দাও যাতে আমার দেয়াল চারটে সামনের বর্ষায় না প'ড়ে যায়! বাবা, আমি নিতা[illegible] ছা-পোষা গরিব মানুষ, তা'হলে মারা পড়বো।

জগু সরকার আবার বলিতে শুরু করিল—বাবুরা আপোষ করবেন করুন কিন্তু তাঁদের হাত-পা তো আমরা—আমরা রাজি না হ'লে দেখি কেমন তাঁর আপোষ করেন। তাঁরা আপোষ করবেন, আমরা আপোষ ভাঙবো।

এতক্ষণে আশার একটি রন্ধ্র দেখিতে পাইয়া নীলাম্বরের মুখের অপ্রসন্নতা রজতরেখা দেখা দিল। তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন—অর্ধসমাপ্ত ইষ্টকাল

সমাপ্ত হইয়াছে, আর তিনি সেই সুদৃঢ় কক্ষের বারান্দায় বসিয়া ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া গীতা পাঠ করিতেছেন।

জগু বলিয়া চলিল—এখানে দুই শরিকেরই নায়েব উপস্থিত। আপনারা নিজ নিজ লেঠেলদের হুকুম দিন, যাতে অপরের প্রজাদের উপরে লাঠিবাজি শুরু করে। আর ছোটবাবুর দরদ ওই ইস্কুলটার উপরে—তার উপরেও হামলা শুরু হোক। দেখবেন তখন আপোষ থাকে কোথায়। বড়বাবু ভাববেন ছোটবাবুর কাজ, ছোটবাবু ভাববেন বড়বাবুর! আবার শুরু হয়ে যাবে। আর অমনি খুড়োর ছাদটারও একটা সুরাহা হবে।

খুড়ো আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, লাফাইয়া উঠিয়া জগুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বাবা জগন্নাথ, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, তোমার সোনার বাটখারা হোক বাবা। দেখো আমি যেন মারা না পড়ি।

সকলে জগুর বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই কিছুক্ষণ কাহারো মুখে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। প্রথমে কথা বলিল ঘাড়টান পঞ্চানন; সে বলিল—সরকার, আজ তুমি আমাদের পাঁচ-পয়জার মারলে। আমি চল্লিশ বৎসর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করছি—কই এসব বুদ্ধি তো আমার মাথায় আসেনি।

বলা বাহুল্য, জগুর কথায় এতগুলি হতাশ লোক নূতন আশার দিগন্ত দেখিতে পাইল। কলম্বসের নাবিকদলের যেন আমেরিকার তীরভূমি-দর্শন ঘটিল। সকলেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

জগু সে-সব প্রশংসা গুরুর পদে সমর্পণ করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল—সকলই গুরুর কৃপা।

এমন সময়ে কেশরী ও শশাঙ্ক গৃহে প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি ওইখানে মাথার বোঝাটা নামিয়ে একটু অপেক্ষা করো।

সকলে উঁকি মারিয়া দেখিল, একটি লোক মাথা হইতে সুবৃহৎ একটি বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

নীলাম্বর ঘোষ শুধাইলেন—ঠাকুর, এসব কি ?

কেশরী বলিলেন—আর বলো কেন ভায়া। এসব আমার শশাঙ্কের কীর্তি। হাঁ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন তার সার্থক হয়েছে বটে !

তারপরে নিজেকেই অভিনন্দিত করিয়া যেন বলিলেন—এমন ছাত্র কয়জনে পায় ?

নীলাম্বর বলিল—কি, তোমাকেও হার মানিয়েছে নাকি ?

কেশরী বলিল—তাতে অগৌরবের কিছু নেই—কারণ শাস্ত্রেই কথিত আছে যে—'সর্বত্র জয়মিচ্ছেৎ ছাত্রাৎ পুত্রাৎ পরাজয়ম্!' তা আমার শশাঙ্ক ছাত্রের মতো ছাত্র বটে !

বলা বাহুল্য, এত বড় সার্টিফিকেট পাইয়া শশাঙ্ক পুলকিত হইয়াছিল। সে সশব্দে মাটিতে মাথা ঠুকিয়া অধ্যাপককে একবার প্রণাম করিয়া লইল।

নীলাম্বর বলিল—বুঝলাম তোমরা দুইজনেই পরম পণ্ডিত—কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলেই বলো—আমরা পণ্ডিতও নই, অন্তর্যামীও নই।

কেশরী তখন শশাঙ্কের দিকে তাকাইয়া বলিল—শশাঙ্ক, তুমিই বলো, আমি বড় পরিশ্রান্ত।

শশাঙ্ক তখন সবিনয়ে আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল, মোকদ্দমা-লক্ষ্মীর কৃপায় মহাশয়দের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হচ্ছে, কিন্তু আমার শাস্ত্র পিতার—এই বলিয়া সে ভট্টাচার্যের দিকে তাকাইল, তারপরে আবার—আমার শাস্ত্র-পিতার কথা কি আপনারা চিন্তা করেছেন ? তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ওদিক দিয়ে অর্থাগম হবার আশা তাঁর নেই। অবশ্য গুরুর কৃপায় আমি দু-চার পয়সা পেয়েছি বটে—কিন্তু ছাত্রের অর্থ গুরু নেবেন কেন ? তাই আমি গ্রামে প্রত্যাবর্তন ক'রে গুরুর অর্থাগমের পথ চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম।

শশাঙ্কর গুরুভক্তিতে উপস্থিত সকলেরই মনে প্রাচীন কালের উতঙ্ক, আরুণি প্রভৃতি আদর্শ ছাত্রদের চরিত্র মনে পড়িয়া গেল, কলিকালেও যে এমন সম্ভব-ভাবিয়া তাহারা বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল। কেবল ভট্টাচার্য মাথা নাড়িয়া যুগপৎ সম্মতি ও আশীর্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শশাঙ্ক বলিতেছে—ক'দিন আগে আমি কালীশপুরের হাটে গিয়েছিলাম একটা তাগিদে। সেখানে কালীশপুরের বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি বড় মহাশয় ব্যক্তি। অনেক গল্প হ'ল; বললেন যে, তাঁর ছেলে সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সেই প্রসঙ্গে কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়লো যে তাঁর ছেলে যখন পাল্কি ক'রে গ্রামে প্রায় ঢুকেছে, তখন একটি বাঘ দেখতে পেয়েছিল।

আমি অমনি শুধোলাম যে, উত্তরে না দক্ষিণে? তিনি বললেন—উত্তরে। অমনি আমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বাবু শুধোলেন, হঠাৎ গাম্ভীর্য কেন? আমি বললাম—খবরটি বড় সুখবর নয়। কেন, কেন, বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি বললাম—বাঘটি যদি দক্ষিণে দেখা যেতো, তবে তত ভয়ের ছিল না। কিন্তু উত্তরভাগে দৃষ্ট বাঘ বড় চিন্তার বিষয়। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কেন? আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, ও তো সামান্য বাঘ নয়,—ও যে জটা বাঘ! অবশ্য জটা বাঘের নাম বাবু কখনো শোনেন নি—

শ্রোতাদের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, তাহারাও কখনো শোনে নাই।

তিনি বললেন, জটা আবার কি? আমি তখন তাঁকে নিয়ে একটি নিভৃত স্থানে ব'সে বললাম—দশভুজার পায়ের তলে যে-জানোয়ারটি থাকে, তাকেই বলে জটা বাঘ! বাবু বললেন—সে কি মহাশয়, সে তো সিংহ। আমি হেসে বললাম—ওই আপনাদের এক ভ্রম। সিংহ কোথায়। সিংহের মতো তার মাথায় জটা আছে বটে—কিন্তু ওর আসল নাম জটা বাঘ! সব শুনে বাবুর বিস্ময়ে আর মুখ দিয়ে রা সরল না। কেবলি বলতে লাগলেন—জটা বাঘ! জটা বাঘ! আমরা তো কিছুই জানতাম না। তারপরে বললেন—কিন্তু এখানে হঠাৎ কেন? আমি বললাম—হঠাৎ নয়, কামরূপ-কামিখ্যেয় ওঁর বাস, আহারান্বেষণে বেরিয়েছেন।

বাবু বললেন যে, আহার জুটেছে ব'লে তো মনে হ'ল না। আমি বললাম—সব রহস্য তো আপনারা অবগত নন, ওঁরা দৃষ্টিভোগ করেন। বাবু

শুধোলেন, অর্থাৎ ?—অর্থাৎ আবার কি, ওঁর নজরে যাকে পড়ে সে এক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়। আর উনি ক্যামিখ্যেয় ব'সে তৃপ্তির উদ্গার তোলেন।

সমস্ত শুনিয়া দুর্গাদাস কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিয়া উঠিল—আমিও যেন সেদিন একটা বাঘ দেখেছিলাম।

বিশ্বনাথ বলিল—সেটা বাঘ নয়, বনবেড়াল।

দুর্গাদাস বলিল—ঠিক তো ?

বিশ্বনাথ বলিল—ঠিক বইকি ! বাঘ হ'লে এতক্ষণ থাকতে কোথায় ? আরে বাপু, বড়লোকের ছেলে ছাড়া কেউ জটা বাঘ দেখতে পায় না।

দুর্গাদাস শুধাইল—বুঝলে কেমন ক'রে ?

বিশ্বনাথ বলিল—এখনি শুনতে পাবে।

ভট্টাচার্য বলিয়া উঠিলেন—আহা থামো না ! শশাঙ্কর কাহিনী অবধান করো।

অনেকেই বলিয়া উঠিল—তারপর ? তারপর ?

শশাঙ্ক বলিল—বাবুর তো মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি শুধোলেন—তা'হলে কি আমার—

আমি বললাম—শাস্ত্র সত্য হ'লে নিশ্চিত।

তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, ঠাকুর, আমার একমাত্র সন্তান, বাঁচাও। আমি বললাম—ভয় করবেন না। শাস্ত্রে উপায় এবং অপায় দুই-ই আছে। জটা বাঘ দেখলে যে শার্দূল-স্বস্ত্যয়ন করতে হয়, সে কথা শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবেই লিখিত রয়েছে। অতএব, ভয় কি ?

তখনি বাবু আমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ব'সে শার্দূল-স্বস্ত্যয়নের ফর্দ প্রস্তুত করলাম। আজ গুরু-শিষ্যে মিলে গিয়েছিলাম স্বস্ত্যয়ন সমাধা করতে।

ঘাড়টান পঞ্চানন শুধাইল—তা কি রকম হ'ল ?

শশাঙ্ক সবিনয়ে বলিল—তা ছ'মাস, বছরের আবশ্যক দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়েছে। বস্ত্র, তৈজস, ভোজ্য, তাম্র, কাঞ্চন, রজত কিছুই বাদ পড়েনি।

ভট্টাচার্য বলিলেন—অনেক খরচ করেছে।

বদ্যিনাথ বলিল—তা আর করবে না—একে জটা বাঘ তার উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর।

যোগেশ বলিল—জটা বাঘ একবার এ-গাঁয়ে আসে না!

বদ্যিনাথ বলিল—জটা বাঘ হিসেব ক'রে আসা-যাওয়া করে। বাবুদের যে বি-এ পরীক্ষা-দেওয়া পুত্র-সন্তান নেই!

শশাঙ্কর কাহিনী শুনিয়া নীলাম্বরের মনে হইল, গীতার চেয়ে অন্য শাস্ত্র পড়িলেই অধিকতর ফলপ্রদ হইত। সে স্থির করিল, একবার শাস্ত্রগুলা ঘাঁটিয়া দেখিবে। আর জগু সরকার ভাবিল—বাবা, এরা যে আমাদের চেয়েও পাকা ঠগ! আমাদের তবু কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয়, এরা খান-দুই তালপাতার পুঁথি লইয়া বেশ ব্যাবসা চালাইতেছে। সে মনে মনে গুরু-শিষ্যকে গড় করিল এবং নিজের পুত্র-সন্তান নাই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল।

শশাঙ্কর কাহিনী শেষ হইলে ভট্টাচার্য বলিলেন—এদিকের পরামর্শ কি হ'ল?

তখন সকলে মিলিয়া কখনো বা এককে কখনো যুগ্মকে, কখনো যৌথভাবে সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া জানাইল যে, উভয় পক্ষের প্রজাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে আর ইস্কুল-ঘরের উপর হামলা চালাইতে হইবে। শশাঙ্ক অগ্রণী হইয়া বলিল—ইস্কুল-ঘরের ভার আমি নিলাম। আপনারা অন্য বিষয়ে চিন্তা করুন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া সভাভঙ্গ হইল। গুরু-শিষ্য মুটের মাথায় গুরুভার বোঁঝাটি চাপাইয়া দিয়া টোলের দিকে যাত্রা করিল। খান-দুই ভালো শাড়ি ও গোটা-দুই তৈজস ও একটি সোনার নথ শশাঙ্ক গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—সেগুলির লক্ষ্য ভট্টাচার্য-গৃহিণীর পদপ্রান্ত নয়, স্থানান্তর। শশাঙ্ক ভাবিল, এই আত্মসাতে দোষ নাই, কারণ এই উপার্জনের কৃতিত্ব ষোল-আনাই

তো তাহার। তাহা ছাড়া শার্দূল-স্বস্ত্যয়ন ব্যাপারটাই যদি দূষণীয় না হয়, তবে সামান্ত কয়েকটা দ্রব্য সরাইলে এমন কি আর দোষ ?

বস্তুত বাবুদের পক্ষে আপোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান কিস্তির মামলামোকদ্দমা প্রায় তিন বৎসর হইল বাধিয়াছে। এই তিন বৎসর তাহাদের অবস্থা অবনতির ঢালু পথেই চলিয়াছে। আয় কমিয়াছে ব্যয় বাড়িয়াছে, অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে এবং মহাজনের দেনা বেশ ভারী রকম জমিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে গ্রামের অবস্থাও জড়িত। বাবুরা গ্রামের ইস্কুল, পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতির জন্য যে টাকা খরচ করিত তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে, ফলে গ্রামের আগাছা বাড়িয়াছে, পুকুর পঙ্কিল হইয়াছে এবং ইস্কুলের মাস্টারদের অনেক বেতন বাকি পড়িয়াছে। গ্রামের মধ্যে যাহারা সাধু প্রকৃতির লোক, সংখ্যা খুব বেশি নয়, তাহারা এই অকারণ অপব্যয়ে ও বিবাদে দুঃখিত, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির লোকের কথা কে কানে তোলে ? এইসব অপব্যয় যাহাদের ভাগে আয় হিসাবে উদিত হয় তাহাদের আহ্লাদের সীমা নাই। তাহারাই বাবুদের কর্ণেন্দ্রিয় দখল করিয়া বিরাজমান। সেখানে সাধু ব্যক্তির মৃদু মিনতির প্রবেশের অনেক বাধা।

নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন বাবুরাও লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু ফিরিবার পথ কই ? ফিরিতে সাহায্য করে এমন লোক কই ? কীর্তিনারায়ণের মতো দুর্ধর্ষ মামলাপ্রিয় ব্যক্তিরও অনেক সময়ে মনে হইয়াছে এইসব হাঙ্গামা চুকাইয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়। নবীননারায়ণের তো কথাই নাই, সে ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে নবীনের তরফ হইতে আপোষের প্রস্তাব আসিল।

নবীন ও কীর্তি দুজনেই সম্মত হইয়া নিজ নিজ কর্মচারীদের আপোষের সর্তাদি অবধারণ করিতে ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈয়ারি করিতে আদেশ দিল। এই অর্থক্ষয়কর বিপদ হইতে সম্মানজনকভাবে মুক্তি পাওয়া যাইবে ভাবিয়া দুজনেই আনন্দিত হইল।

মুক্তামালা ও নবীন তাহাদের আসন্ন কলিকাতা-বাসের কথা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিল।

মুক্তামালা শুধাইল—আবার কবে জোড়াদীঘি আসবে ?

নবীন বলিল—আর শীগগির আসছি না। এবারে যা বিপদে পড়েছি! তিন দিনের জন্যে এসে তিন বৎসর গেল!

তারপরে সে উৎসাহিত হইয়া বলিল—কলকাতাতেও বেশি দিন থাকবো না। ছোটনাগপুরের কোনো গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বছরখানেক থাকবো। সেখানে খরচ অনেক কম। তাহ'লে মামলার দেনা শোধ করবার একটা উপায় হবে।

প্রস্তাবটা মুক্তামালারও লোভনীয় মনে হইল। তখন দুইজনে বি এন আর ও ই আই আর-এর টাইম-টেবল লইয়া বাসযোগ্য স্থান নির্বাচনে লাগিয়া গেল। তাহাদের সব জায়গাই পছন্দ হয়, আবার পরেরটা আগেরটার চেয়ে বেশি পছন্দ হয়। ফল কথা, দুইজনেই অনেক দিন পরে খুশির হাল্কা হাওয়ায় দুলিতে লাগিল।

বাদলি ধরিয়া বসিল, বৌঠাকরুন, আমাকে যদি না নিয়ে যাও, তবে এর পরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

মুক্তামালা শুধাইল—কেন রে ?

বাদলি বলিল—শশাঙ্ক ঠাকুর আবার উৎপাত শুরু করেছে। যেদিকে দু'চোখ যায় আমি চ'লে যাবো।

মুক্তামালা বলিল—কিন্তু তোকে সঙ্গে নিলে যে শশাঙ্ক ঠাকুরও সঙ্গ নেবে।

বাদলি হাসিয়া বলিল—তা, নিয়ো-না! তোমার তো রাঁধুনী বামুনের দরকার। ঠাকুর রাঁধে ভালো।

—কেন, খেয়ে দেখেছিস নাকি ? দুইজনে হাসিয়া উঠিল।

দুই পক্ষে আপোষ হইতে চলিয়াছে, তাই স্বামার অনুমতি লইয়া রুক্মিণী ও লক্ষ্মী মুক্তামালার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। রুক্মিণীর

আগমনে মুক্তামালা অপ্রত্যাশিত আনন্দ পাইয়া বলিল—দিদি, একি স্বপ্ন নাকি ?

নবীন বলিল—বৌঠান, সেদিনের প্রতিশোধ নিতে পারলে মন্দ হ'ত না। এ বাড়িতেই দুজনের বাসর-ঘর করতাম।

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—আমরা ভাই পুরোনো হয়ে গিয়েছি। এখন কি আর বাসর-ঘর সাজে ?

লক্ষ্মীর এইসব অবান্তর আলাপ ভালো লাগিতেছিল না, সে বলিল—বলো তো কাকীমা, এটা কিসের বাচ্চা ?

তাহার হাতে অনুদ্গতপালক একটি চড়াইয়ের বাচ্চা। মুক্তামালা বলিল—বা, বা, এ যে চড়াইয়ের বাচ্চা। কি সুন্দর !

লক্ষ্মী রাগিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি কি—চ্ছু জানো না ! ঈগল পাখীর বাচ্চা এটা। চড়াই ! তোমার মাথা ! ঈগল পাখী দেখেছো কখনো ?

নবীন বলিল—ঠিক মা, ঈগল পাখীই বটে !

নবীনের বুদ্ধির প্রতি তাহার বিশ্বাস অনেক বাড়িয়া গেল, সে নবীনের গা-ঘেঁসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—কাকাবাবু, ঈগল পাখীটা বড় হ'লে এর পিঠে চ'ড়ে কাশীতে যাওয়া যাবে ?

রুক্মিণী মুক্তামালাকে বলিল—তোমার ভাসুর মাকে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছেন।

নবীন বলিল—বৌঠাকরুন, একবার কলকাতায় চলো।

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—আমার অসাধ ? যে নিয়ে যাবার তাকে রাজি করো ভাই।

নবীন বলিল—কে আর নিয়ে যাবে ? আমিই নিয়ে যাবো ! পুরানো রাখাল কি আর ভালো লাগে ? একবার রাখাল বদ্‌লে দেখো না।

মুক্তামালা বলিল—দিদি, একদিন তো বিনা-নিমন্ত্রণে তোমাদের বাড়িতে খেয়েছি। যদি ভরসা দাও, তোমাদের নিমন্ত্রণ করি—কাল এখানে তোমরা দু'জনে খাবে, সঙ্গে লক্ষ্মী মাকেও এনো।

লক্ষ্মী বলিল—আমার ঈগলছানাও আসবে কিন্তু—

নবীন বলিল—নিশ্চয়! তার জন্যে চার ডজন ইঁদুরছানার ব্যবস্থা ক'রে রাখবো।

নবীন মুক্তামালাকে বলিল—তাহ'লে তুমি ও-বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো।

মুক্তামালা তখনি রুক্মিণীর সঙ্গে দশানির বাড়ি গেল এবং কীর্তিনারায়ণ ও রুক্মিণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। অনেকদিনের চাপাপড়া আত্মীয়ত্ব নূতন করিয়া অনুভব করিয়া সকলেই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

বাবুগণ যখন আশার অঙ্কুর রোপণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের কর্মচারিগণ যে তখন বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আশার বৃক্ষ বাড়িয়া উঠিতে সময় নেয়, বিষবৃক্ষ রাতারাতি ফলদান করে।

বিকালবেলা দশানির প্রজারা কীর্তিনারায়ণের সম্মুখে আসিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিল—হুজুর, আর কেন? এবারে আমাদের বিদায় দাও, আমরা অন্য জমিদারের মাটিতে উঠে যাই।

কীর্তিবাবু তখন কাগজপত্র লইয়া আপোষের সর্ত স্থির করিতেছিল, বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিল—কি হয়েছে?

প্রজারা বলিল—হুজুর, কালরাত্রে ছ'আনির লেঠেল এসে আমাদের সর্বস্ব লুট ক'রে নিয়ে, সব বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত কীর্তি বলিল—ছ'আনির লেঠেল?

প্রজারা বলিল—হুজুর, সব চেনা লোক, মিথ্যা বলতে যাবো কেন?

কীর্তি কাগজপত্র রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এখন তোমরা যাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

প্রজারা চলিয়া গেলে কীর্তি নিজের মনে বলিতে লাগিল—তবে রে শয়তান! ছিঁচকে চোর! এদিকে ভালোমানুষের মতো এসে আপোষের প্রস্তাব করা হচ্ছে, তলে তলে এই মতলব! আমি ভাবলাম ছেলেটার মতিপরিবর্তন হয়েছে। দাঁড়াও শয়তান, এবারে দেখাচ্ছি।

তখনি কীর্তির আদেশে দশানির খিড়কি-দ্বার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

খিড়কি-দ্বার বন্ধ হইতেই রুক্মিণী বুঝিতে পারিল আবার লাঠি শড়কি বাহির হইবে। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল বাধিল লক্ষ্মীকে লইয়া। সে সারাদিন তাহার ঈগল পাখীর বাচ্চাটিকে আশ্বাস দিয়াছে যে, আর ভয় নাই, তাহার জন্য 'চার ডজন (ডজন শব্দটির অর্থ বোঝে না, তবে বুঝিতে পারিয়াছে যে অনেক) ইঁদুরের বাচ্চা প্রস্তুত। পরদিন সে বলিল—চলো মা, ও বাড়ি যাই, আমার ঈগলের ক্ষিদে পেয়েছে।

সে কেবলি বলিতে লাগিল, চলো মা—কখন যাবে?

রুক্মিণী তাহার হাতে সন্দেশ দিয়া বুঝাইয়া বলিল—এখন খাও, ঈগলের জন্য ইঁদুর আমিই ধ'রে দেবো।

লক্ষ্মী থামিল, তবে মাতার সান্ত্বনা ও সন্দেশের মধ্যে কোন্‌টা যে তাহার জন্য দায়ী, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বলা বাহুল্য, জ্ঞাতি-প্রণয়ের আসন্ন নিমন্ত্রণের সম্ভাবনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

যেদিন সন্ধ্যায় দশানির বাড়িতে প্রজার দল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, ছ'আনির প্রজারাও নবীনের পায়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—তাহাদের অভিযোগ দশানির প্রজাদের অনুরূপ।

নবীন ভাবিল—কোথাও একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। দশানির বাবু যে আপোষের কথা ভুলিয়া পুনরায় বিবাদে নামিবেন—সহসা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। প্রজার দল চলিয়া গেলে সে বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ইস্কুলের মাস্টারগণ আসিয়া যে ঘটনার বর্ণনা করিল, তাহাতে তাহার বিশ্বাস না করিয়া আর উপায় রহিল না যে, বড়বাবু আপোষ চান না, বিবাদ চান।

মাস্টারের দল যে ঘটনা বলিল, তাহা যেমন গ্লানিকর তেমনি হাস্যকর।

জোড়াদীঘির ইস্কুলের জমিটা দুই শরিকের মিলিত দান। এক সময়ে দুই শরিকে সমান অংশে খরচ দিয়া ইস্কুলঘর তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল। তারপরে একবার কীর্তিনারায়ণ ইস্কুলটা পোড়াইয়া দেয়।

তখন নবীন নিজ খরচে দালান তুলিয়া দিয়াছে। ইস্কুলের দালানে চারটি কোঠা।

সেদিন সকালবেলা ছাত্র ও মাস্টার ইস্কুলে গিয়া দেখে যে, দুইটি কোঠা দখল করিয়া একপাল গোরু বিরাজ করিতেছে। প্রথমে সকলে ভাবিল, রাত্রে কোনো কারণে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। একজন মাস্টার বলিল—কিন্তু দরজা খুলবে কেমন ক'রে?

সেকেণ্ড পণ্ডিত রসিক। সে বলিল—আমিও তাই ভাবি। ওরা যদি পরের বাড়ির দরজাই খুলতে পারবে, তবে আবার গোরু কেন?

তখন সাব্যস্ত হইল যে, গোরুগুলা যেমন করিয়াই ঢুকিয়া থাকুক না কেন, এখন তাড়াইয়া দিলেই হইল। কিন্তু তাড়াইতে গিয়া দেখা গেল, যত সহজে প্রবেশ করিয়াছে, তত সহজে বাহিরে যাইতে রাজি নয়। তাহারা শিং নাড়িয়া তাড়িয়া আসে। কে বলিতে পারে যে, ইহারা পূর্বজন্মে এই ইস্কুলেরই ছাত্র ছিল না। নতুবা কোন্ মাস্টারের কি স্বভাব কেমন করিয়া জানিবে? নতুবা আর সকলকে ছাড়িয়া বিশেষভাবে হেডমাস্টারের দিকেই তাহাদের এত লক্ষ্য কেন? নতুবা গ্রামে এত স্থান থাকিতে এই ইস্কুলঘরে আসিয়াই বা তাহারা আশ্রয় লইতে যাইবে কেন? ক্রমবিকাশের নিয়মে সামান্য ছাত্রজন্ম হইতে সাধনোচিত প্রয়াসে এখন তাহারা গো-জন্ম লাভ করিয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে আশা করা যায় যে, এ জন্মে যাহারা ছাত্র আছে পরজন্মে তাহারা গো-ত্ব লাভ করিবে।

এই তত্ত্ব আমাদের উদ্ভাবিত নয়, সেকেণ্ড পণ্ডিত সকলকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিল। বাস্তবিক, শিক্ষক নহিলে গোরুর মনস্তত্ত্ব এমন করিয়া আর কে বুঝিতে পারে? সেকেণ্ড পণ্ডিত নিজের সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ সকলকে বলিল, ওই কালো বাছুরটার মুখ অনেকটা নশুর মত নয়? নশু ইস্কুলের একজন বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্র। পরবর্তী কালে সে হাকিম হইয়াছিল। বৎসরখানেক হইল তাহার মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গোরুগুলা যখন কিছুতেই বাহির হইতে সম্মত হইল না, হেডপণ্ডিত বলিল—ওরা থাক্। বাকি দুই ঘরে আমরা কাজ চালিয়ে নিলেই হবে।

তারপরে সতীর্থদের একান্তে ডাকিয়া বলিল, এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে। দেখুন না কেন, চারটে ঘর থাকতে ওরা ঠিক দু'টো ঘর দখল করেছে কেন? আর ওই দিকের গোরুটা যেন দশানির গোরুর মতো।

তারপরে স্বর আরো নীচু করিয়া বলিল—এর মধ্যে বাবুদের বিবাদের ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে। ওদের ঘাটিয়ে বাবুদের রাগিয়ে কাজ নেই।

তখন স্থির হইল গোরুগুলা যেমন আছে তেমনি থাক্। অন্য দুই ঘরে কাজ চলিবে। গোরুদের জয় হইল, সংসারে সর্বত্রই গোরুর জয়।

সিদ্ধান্ত শুনিয়া সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—আহা ইস্কুলের কি সৌভাগ্য, গোপাল আজ প্রত্যক্ষ হয়ে ইস্কুলে এসেছে।

একজন শুধাইল—গোপাল আবার কে?

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—গোপাল হচ্ছে আদর্শ ছাত্র, সে যাহা পায় তাহাই খায়, কোনো কথা যে অমান্য করে না, দ্বিতীয় ভাগের সেই গোপাল।

চার কোঠার ছাত্র দুই কোঠায় উপবিষ্ট হইয়া পাঠ আরম্ভ হইল। ছাত্রদের আজ কি আনন্দ! এমন সতীর্থ লাভের কল্পনা অবধি তাহারা করিতে পারে নাই। দুই ঘরের ছাত্রগণ যখন উচ্চস্বরে কড়াকিয়া হাঁকিতে লাগিল, বাকি দুই ঘর হইতে গাভীদল তালে তালে ডাকিতে থাকিল। তাহারা হাম্বারবে ছাত্রদের ব্যাকরণ পাঠের সমর্থন জানাইল। কিন্তু বিপদ বাধিল ছাত্রদের ইংরেজি বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে পাঠের তারস্বরে। এতক্ষণ গোরুগুলা সম্বিৎ ধরিয়া ঘরের মধ্যেই ছিল—কিন্তু এবারে ইংরেজি ভাষা শুনিবামাত্র উচ্চপুচ্ছে আর্তনাদ করিয়া তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া দৌড় মারিল।

একজন বলিল—এমন হ'ল কেন?

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—হবে না? বাবা! গো-খাদকের ভাষা শুনলে ভয় পাবে না এমন সাহসী গোরু কোথায়?

গৃহত্যাগের পূর্বে গোরুর দল হেডমাস্টারকে ঢুঁ মারিল, সেকেণ্ড মাস্টারকে

তাড়িয়া গেল, বেচারী কোনক্রমে জানালা গলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাচাইল। হেডপণ্ডিত ও সেকেণ্ড পণ্ডিতকে স্পর্শও করিল না। এইরূপে ভূতপূর্ব ছাত্রবৃন্দ পূর্বজন্মের ঋণ এ জন্মে শোধ করিয়া পুচ্ছ তুলিয়া ছুটিয়া পালাইল। আর ছেলের দল তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিল। মাস্টারদের দুর্দশা দেখিয়া আজ তাহাদের আনন্দ ধরে না, তাহাদের নিষ্ফল সঙ্কল্প কেমন অনায়াসে এই গোপাল-কর্তৃক সাধিত হইল দেখিয়া ছেলের দল বুঝিতে পারিল মানব-জন্ম হইতে গো-জন্ম অনেক শ্রেয়। সে জন্মে মনের বাঞ্ছা মনে চাপিয়া রাখিতে হয় না।

গো-পাল ও ছাত্রগণ চলিয়া গেলে মাস্টারগণ উঠিয়া জামা-চাদর সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী সরকারী ডাক্তারখানা হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি গ্রহণ করিল। তারপরে তাহারা সদলে ছ'আনির বাড়ির দিকে রওনা হইল।

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—বুঝলে তো এবার, গোরুর দল হেডপণ্ডিত ও আমাকে স্পর্শ করলো না কেন? আমরা যে দেবভাষা পড়াই আর তোমরা পড়াও গো-খাদকের ভাষা।

মাস্টারেরা সকলেই বুঝিতে পারিল, ইহার মূলে আছেন দশানির বাবু। কাজেই এখন প্রতিকারের একমাত্র স্থান নবীননারায়ণ।

নবীননারায়ণ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠিল—শরিকানি বিবাদের মধ্যে এদের টেনে আনা কেন? আমিই কি যথেষ্ট নই? নাঃ, বড়বাবু কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবেন না দেখছি।

লোকে রাজা-জমিদারকে পরপীড়ক বলে। কিন্তু ইহাদের উপরেও একটা চক্রান্ত ও চাপ বর্তমান, তাহারই গুরুতর ভার পড়িতেছে নিম্নবর্তীদের উপরে। সংসারে সকলেই পীড়িত, প্রধানতমও পীড়িত দীনতমও পীড়িত। অনন্ত পীড়নচক্র সংসারে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে, মাঝখানের একটা গ্রন্থিকে অকারণ দোষ দিয়া কি লাভ?

বিকালবেলা ছাদের উপরে মুক্তামালা পায়রাগুলিকে চাল ছড়াইয়া দিতেছিল, আর একঝাঁক পায়রা গদ্‌গদ্‌ ধ্বনি করিতে করিতে এ ওকে ঠেলা দিয়া তণ্ডুল-কণা খুঁটিয়া খাইতেছিল। আগে তাহার সঙ্গী থাকিত বাদ্‌লি, সদর হইতে ফিরিবার পরে বাদ্‌লি তাহার স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

মুক্তামালা বলিয়াছিল—বাদ্‌লি, এখানেই থাক্‌।

বাদ্‌লি উত্তর দিয়াছিল—বৌঠান, দাঁড়াও, তোমার কাছেই থাকবো। কিন্তু একবার ক'দিনের জন্যে নিজের ঘরটায় থেকে আসি, নইলে আমাদের পাড়ায় যে মোতির মা আছে, বৌঠান, তাকে তো জানো না, সে আমার ঘরদোর দখল ক'রে বসবে, হয়তো চালের খড়গুলো নিয়ে খেতে দেবে গোরুকে, আর খুঁটিগুলো খুলে নিয়ে উনুন ধরাবে।

মুক্তামালা বলিল—তোর কেউ নেই, এত ঘরের মায়া কিসের?

বাদ্‌লি বলিল—কেউ নেই ব'লেই ঘরের উপরে আরো বেশি টান।

মুক্তা বলিল—আচ্ছা, যা ক'দিন থেকে আয়, কিন্তু রোজ একবার ক'রে আসিস্‌। তুই এসে আমাকে গাঁয়ের খবর শুনিয়ে যাবি। এখানে তো খবরের কাগজ নেই।

বাদ্‌লি প্রতিদিন বিকালবেলা একবার করিয়া আসে, যত রাজ্যের সত্য মিথ্যা খবর বলিয়া যায়। খবরগুলা দৈনিক সংবাদপত্রের ভাষাতে 'Scoop News' শ্রেণীর। কোনদিন বা সে বলে—বৌঠান, আজকে যে কাণ্ড হ'ল! এই বলিয়া সে আরম্ভ করে—কাল রাতে পরান সরকারের হলুদের ভুঁয়ে চুরি হয়ে গিয়েছে।

মুক্তামালা বলে—হলুদের ভুঁই আবার চুরি হবে কি ক'রে? পুকুর চুরির কথাই শুনেছি, ভুঁই চুরি—

বাদ্‌লি হাসিয়া উঠিয়া বলে—ভুঁই চুরি নয়, ভুঁইয়ে চুরি। তারপরে বলে—এবার হলুদের খুব দর। রাতের বেলায় কারা যেন এসে ভুঁই থেকে হলুদ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

মুক্তামালা শুধায়—চোর ধরা পড়েনি ?

বাদ্‌লি বলে—চোর ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু তাদের একজনের গায়ের কাপড়খানা ধরা পড়েছে।

মুক্তামালা কৌতূহলী হইয়া শুধায়—সে আবার কি রকম ?

—এ তো সহজ কথা। রাতের বেলা পরান সরকার একবার বাইরে বেরিয়েছিল, তখন দেখতে পেলো ভুঁইয়ের মধ্যে যেন লোক। তাড়া করতেই গায়ের চাদর ফেলে তারা পালালো।

মুক্তামালা বলে—চাদর দেখেই তো বুঝতে পারা উচিত চোর কে।

বাদ্‌লি বলে—বুঝতে পারা তো গিয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে বলে কে ?

—কেন ?

—কেন নয় বৌঠান ? তারা যে গাঁয়ের স্যাঁকরা, বড়লোক !

মুক্তামালা শুধায়—বড়লোক, তবে আবার চুরি করবে কেন ?

—কী যে বলো ! বলিয়া বাদ্‌লি হাসিয়া ওঠে, বলে—বড়লোক ব'লেই তো চুরি করে, ছোটলোক হ'লে তো ভিক্ষে করতো।

বাদ্‌লির এই মন্তব্যে দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া ওঠে।

সেদিন বাদ্‌লি আসিয়া উপস্থিত হইলে মুক্তামালা শুধাইল—হাঁরে বাদ্‌লি, তোদের পাড়ায় আজ গোলমাল হচ্ছিল কিসের রে ?

বাদ্‌লি বলিল—একটা ঘরে চোর ঢুকেছিল।

মুক্তামালা বলিল—তোদের গাঁয়ে কি চোর ছাড়া আর কিছু নেই ?

বাদ্‌লি বলিল—বৌঠান, তুমি বুঝতে পারোনি, এ চোর আর এক রকম। সাধারণ চোর ঢোকে জিনিসপত্র নিয়ে পালাতে, আর এ চোর ঢুকেছিল শাড়ি আর পানের বাটা রেখে আসবার জন্যে।

মুক্তামালা বলিল—তুই তখন কি করলি ?

বাদলি চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—আমি ! আমি আবার কেন ?

মুক্তামালা বলিল—তোর ঘর ছাড়া আর কোথাও যে এমন চোর ঢুকবে তা তো মনে হয় না। তা ছাড়া, চোরটা কে তাও বুঝেছি।

বাদ্‌লি বলিল—তুমি অন্তর্যামী নাকি ?

—অন্তর্যামীর দরকার হয় না বাদ্‌লি—সবাই জানে।

—তাই যদি হয় তবে শোনো। তখন আমি ছিলাম না। ওরা সবাই মিলে শশাঙ্ক ঠাকুরকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিল। আমি আসতেই সকলে বললো এবারে কি করবি? আমি বললাম, কি আবার করবো। এই ব'লে দরজা খুলে ঠাকুরকে বললাম, শীগ্‌গির পালাও। ঠাকুর লজ্জায় পানের বাটা নিয়েই পালাচ্ছিল, আমি বললাম, ওটা রেখে দাও, কষ্ট ক'রে এনেছ! তবে চোরাই মাল নয় তো? এদিকে ঠাকুর তো পালালো, সবাই আমার উপরে এসে পড়লো। বোধ করি, সুন্দর বাটাটা দেখে সবার হিংসে হয়েছিল। মোতির মা বললো—ওকে ছেড়ে দিলি কেন? আমি বললাম—ইচ্ছা। সবাই হাসলো। মোতির মা বললো—গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! আমি বললাম—তোমার। তবে রে ছুঁড়ি ব'লে সে তেড়ে আসতেই আমি পালিয়ে এসেছি।

মুক্তামালা গম্ভীর হইয়া বলিল—তুই ওকে ছেড়ে দিতে গেলি কেন?

—আটক রেখে কি লাভ হবে বৌঠান? ঠাকুরের ও-রোগ তো সারাবার নয়।

—ঠাকুর ভাববে, তোর বোধ হয় আপত্তি নেই।

বাদ্‌লি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—আপত্তি থাকুক আর নাই থাকুক—সে আমার পিছন ছাড়বে না, যতদিন আমি এ গাঁয়ে আছি।

মুক্তামালা বলিল—তবে আমাদের সঙ্গে কেন চল্ না? আমরা তো শীগ্‌গিরই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।

মুক্তামালা তখনো জানিত না যে তাহাদের শীঘ্র যাইবার সম্ভাবনা হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে নবীননারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুক্তামালা বলিল—এবারে কলকাতা যাবার সময় বাদ্‌লিকে নিয়ে চলো।

নবীন বলিল—চলো। কিন্তু কলকাতায় যাবার শীঘ্র যে আশা আছে, তা মনে হয় না।

উদ্বিগ্ন হইয়া মুক্তামালা বলিল—কেন ?

তখন নবীননারায়ণ বাদ্‌লিকে বলিল—বাদ্‌লি, তুই যা। বাদ্‌লি নামিয়া গেলে নবীন মুক্তামালাকে ঘটনার অতর্কিত মোড় ফিরিবার সংবাদ জানাইল। বলিল—এ রকম ক্ষেত্রে আর যাওয়া সম্ভব নয়। একেবারে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে তবে যাওয়ার কথা ভাববো।

মুক্তামালা আর কথা বলিল না, নবীনও চুপ করিয়া রহিল।

সেই ছাদের উপরে দাঁড়াইলে গ্রামের সমস্ত বৃক্ষরাজির মাথা দেখা যায়—তার উপরেই নীল আকাশ যেন শ্যামল তটরেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত সুনীল হ্রদ। পূর্বদিক হইতে সারিবদ্ধ বেলেহাঁস সেই নীল সরোবর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকের দিগন্তে দলে দলে চলিয়া যাইতেছে, কাক, শালিখ বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইয়া সম্মিলত কাকলি তুলিয়াছে, আকাশে একটার পরে একটা সূক্ষ্ম ছায়ার পর্দা খুলিয়া পড়িতেছে। প্রতিদিন যেমন এইসব পটপরিবর্তন মুক্তামালা দেখে, আজিও তেমনি দেখিতে লাগিল।

দুইজনে অভিভূতের মতো কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল জানি না, যখন তাহাদের সম্বিৎ ফিরিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তারা ফুটিয়াছে। গাছের চূড়ায় আলো, গাছের ছায়ায় অন্ধকার, আলো অন্ধকার দুই সতীনের ঘরকন্নার মতো নীচের মাটিতে বিচিত্র রেখা চিত্রিত করিয়া দিয়াছে, পুকুরের কিনারে রুপোর তুলি টানা, জলের কালো জমিনে তারার ফুল-কাটা, জোনাকির দল চোখ মিট্ মিট্ করিয়া কেবলি বলিয়া চলিয়াছে—চাঁদটা আবার উঠিতে গেল কেন ? অদূরে একজন প্রাণ খুলিয়া গানে তান লাগাইয়াছে—আর সব নিস্তব্ধ। ওই একটা শব্দ শিকল ফেলিয়া নিস্তব্ধতার পরিমাণ করিতে গিয়া যেন ব্যর্থতা জানাইতেছে।

প্রথমে মুক্তামালা কথা বলিল, সে বলিল—প্রকৃতি এমন সুন্দর, মানুষ এমন হিংস্র কেন ? কি সুন্দর এই আকাশ, আর তার তলাকার গ্রামখানিতে এত হিংসা !

নবীন বলিল—সুন্দরী পার্বতীর পায়ের তলায় যেমন সিংহটা হিংস্র।

তারপরে আবার সে বলিতে লাগিল—মুক্তি, এ গ্রাম থেকে আমার মুক্তি নেই, হয়তো এখানেই আমার বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আমার অত্যাচারিত প্রজাদের নিদারুণ হিংস্রতার মুখে ছেড়ে আমি পালাই কেমন ক'রে? সে যে ভীরুতা হবে। এই প্রজারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। আমার ভরসাতেই তারা এই গ্রামে আছে, আমার আদেশেই তারা আমাদের পারিবারিক বিবাদের আবর্তের মধ্যে এসে প'ড়ে অসহায়ভাবে আবর্তিত হচ্ছে। এই মূঢ় নিঃসহায় প্রভু-নির্ভর জনতাকে ত্যাগ করা! না. সে আমার দ্বারা হবে না।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে আবার নীরব হইল। তারপরে ছাদের উপরে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইয়া অবিন্যস্ত করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—দেখো মুক্তি, এখানে এসে আমি এক অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছি, যা পূর্বে আমার চিন্তার অতীত ছিল। আমি পৌরাণিক জরাসন্ধের মতো দুইটি বিভিন্ন মানুষের সমাবেশ। আমার মধ্যেকার একজন মানুষ নিতান্ত আধুনিক, সে শহরাশ্রয়ী, পাঁচ শো মাইল বেগে সে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত, কলকারখানার ধোঁয়া তার প্রাণের নিশ্বাস, সে আত্মমুখী, নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে তার দিন যায়, এই হচ্ছে কলকাতার আমি! আমার মধ্যেকার আর-একটা মানুষ প্রাচীনকালের, সে গ্রামাশ্রয়ী, কর্ষণজাত সভ্যতা তার আশ্রয়, সে নদীর ধারে, ধানের ক্ষেতে আমকাঁঠালের বাগানে নিশ্চেষ্ট সরলতার মধ্যে মধ্যযুগের আসন পেতে ব'সে আছে, সে হচ্ছে জোড়াদীঘির আমি! আধুনিক কালের আমির সঙ্গে মানুষে মানুষে ব্যবসায়ের সমানে সমানে সম্বন্ধ, প্রাচীন আমির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজা-প্রজার, স্নেহ প্রতিস্নেহের; আমার আধুনিক আমি বহুবিভক্ত সমাজের অন্যতম একটি চৌকা মাত্র, আর প্রাচীন আমি অবিভক্ত সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বন্ধনে যুক্ত। এখানে এসে অবধি সেই যোগ প্রবলভাবে, অচ্ছেদ্যভাবে অনুভব করছি, উদ্ধার নেই। পরিত্রাণ নেই, মুক্তি!

তারপরে সে আবার বলিতে লাগিল—আমার পূর্বপুরুষের বহুকুসংস্কারাপন্ন

রক্তধারা যা এতদিন ধমনীতে সুপ্ত ছিল, সুযোগ বুঝে আজ তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে; তারা আমাকে নাগপাশে বেষ্টন করেছে—তারা আমাকে ছাড়বে কেন?

কিন্তু বিপদ কি জানো? এই দুই আমিতে নিরন্তর আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে, সেই সঙ্কটের তুলনায় দশানি-ছ'আনি বিবাদ তুচ্ছ! সে হিসাবে সুখী কীর্তিনারায়ণ। তার মধ্যে দুই আমির দ্বন্দ্ব নেই, সে হচ্ছে এক আমির নিঃসপত্ন রাজত্ব।

এখানে এসে অবধি, এই জোড়াদীঘিতে, এই বহু পূর্বপুরুষের সুখদুঃখ-চিন্তা-কর্মের লীলাস্থলীতে এসে অবধি আমার পূর্বতন আমি প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সে আমাকে হৃৎপিণ্ডের শিরায় শিরায় দশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে, সাধ্য কি আমি পালাই, জোড়াদীঘির আমিই এখন আমার কর্ণধার। সে আমাকে তার অভীপ্সিত পথে চালনা করবে, শরিকের সঙ্গে বিবাদ করতে বাধ্য করবে, মামলা থেকে অন্য মামলায় নিয়ে সবেগে আছাড় মেরে ফেলবে। এখানে সবাই যে তার সমর্থক, এই গ্রামের দীনতম প্রজাটি থেকে গ্রামের শীর্ণতম বৃক্ষটি অবধি সবাই। এখানকার আকাশ-বাতাস মধ্যযুগের বাষ্পে পূর্ণ হয়ে আছে। এমনি করতে করতে তবে একদিন মুক্তি—যখন জোড়াদীঘির জমিদারির এক বিঘা জমিও আর থাকবে না। যে পথে এই জমিদারি অর্জিত সেই পথ ধ'রেই তার বিসর্জন হবে। আমি যখন একাকী নিস্তব্ধ হয়ে থাকি তখন সেই আসন্ন বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাই। লোকে ভাবে জমিদারের জমিদারি আর পাঁচটা ব্যবসায়ের মতো একটা ব্যবসায় মাত্র, জীবিকার উপায় মাত্র, আর কিছু নয়। ভুল, ভুল, নিতান্ত ভুল। জমিদারি বিষবাষ্পপ্রশ্বাসী কলকারখানা নয়—এ একটা সজীব, সক্রিয়, সচল বস্তু, প্রায় রক্তমাংসের পদার্থ। প্রত্যেক খণ্ড জমি, প্রত্যেকটি প্রজার সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে একটা রক্তের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অনেকদিন—কিন্তু আর অনেক দিন নয়। দেশময় এই প্রথার বিসর্জনের বাজনা ধ্বনিত হচ্ছে। শীঘ্রই একদিন বাঙলার জমিদারী প্রথা অতলে তলিয়ে দিয়ে ভূতপূর্ব জমিদারগণ

বিসর্জিতপ্রতিমা শূন্যমণ্ডপে এসে বসবে। বাঙলা দেশের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হ'তে চলেছে। সেই বিসর্জনের নিয়তিই আমার চুলে এসে ধরেছে। নিজের যাবার পথ সে নিজে ক'রে নেবে। যে দ্বন্দ্ব আর রক্তপাতের প্রবেশপিচ্ছিল পথ দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল, সেই পুরাতন পথকেই আবার সে প্রস্তুত করছে—তারই ভূমিকা আমাদের শরিকানি বিবাদ। নতুবা, কোথায় ছিলাম আমি, কে আমাকে এখানে টেনে আনলো, কেন আমাকে এখানে টেনে আনলো ? তুচ্ছ একটা অশথ গাছের উপলক্ষ্য নিয়ে কে আমাকে গ্রাম্য রাজনীতির আবর্তে ফেলে দিল ? এখন আমি অসহায়, কীর্তিনারায়ণ অসহায়, সকলেই অসহায়—কেবল একমাত্র প্রবল হচ্ছে বিসর্জনের সেই নিয়তি। সাধ্য কি আমি মধ্যপথে আপোষ ক'রে তার বহির্গমনের পথ প্রস্তুত না ক'রে দিয়ে পালাই! সেই দারুণ নিয়তিই আমাদের দু'জনকে পরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছে, নির্বাপিত অনলে নিষ্ঠুর কৌতুকে নূতন ইন্ধন নিক্ষেপ করছে, চরম চিতানলের সুবর্ণচাবিতে স্বহস্তে আমরা তার মুক্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেবো—তাই এত আড়ম্বর, তাই এত সমারোহ।

নবীনকে এত বিচলিত হইতে মুক্তামালা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে হইল, নবীনের অন্তর্লীন ভাবাবেগে নৈশ আকাশ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহার মনে হইল, অস্তমিতচন্দ্রমা সেই অন্ধকার প্রকৃতি যেন তাহার মনের ইচ্ছা কান পাতিয়া শুনিতেছে; মৌন যদি অনুমোদনের লক্ষণ হয়, তবে মৌন জোড়াদীঘি নবীনের প্রত্যেকটি কথাকে যেন অনুমোদন করিতেছে! এমন সময়ে একটা উল্কা আকাশের পটে সুদীর্ঘ নীলাভ আঁচড় টানিয়া স্খলিত হইতে থাকিল। নবীন ও মুক্তামালা দুজনেই তাহার সপ্রতিভ গতি লক্ষ্য করিল, কিয়দ্দূর নামিয়া পড়িয়া উল্কাটা মিলাইল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নবীন বলিয়া উঠিল—ওই পড়ন্ত উল্কার মতো জোড়াদীঘির জমিদার আপন ধ্বংসের আগুনে আপনার ইতিহাস রচনা করতে করতে চলেছে—আর কিছু-দিনের মধ্যেই কোনো দিগন্তেই তার চিহ্নটুকু অবধি থাকবে না।

সে আরো বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুক্তামালা বুঝিল এখন তাহাকে নিরস্ত করা আবশ্যক। সে স্বামীকে একপ্রকার জোর করিয়াই নীচে নামাইয়া লইয়া গেল।

৫

ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ! সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি, এমন আজ তিন দিন ধরিয়া চলিতেছে। জলে মাঠ ঘাট খাল বিল ভরিয়া গিয়াছে। নদীতে পদ্মার ঘোলা জল প্রবেশ করিয়াছে। প্রবল স্রোতে কচুরিপানার রাশ ভাসিয়া চলিয়াছে, ছোট ছোট আবর্ত চোখ পাকাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে ছোট বড় মাঝারি নৌকা মাস্তলের শিং তুলিয়া ঘাটে দণ্ডায়মান, পালতোলা নৌকাগুলি পালের জোরে স্রোতের টানে দ্রুত ছুটিয়াছে, ইলিশ মাছ ধরা ছোট ছোট ডিঙিগুলি মস্ত জালের বেড় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই দুর্যোগে ঘাটে স্নানার্থী নাই বলিলেও চলে। এই দুর্যোগে মাঠে কৃষাণ নাই, গোচরে গোরু নাই, পথে পথিক বিরল, দু-একটা গোরু গোয়াল ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, এখন মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, তাহাদের গা বাহিয়া জল ঝরিতেছে, সমস্ত গ্রাম যেন ঘরের দাওয়ায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে কিন্তু বৃষ্টির দাপট হইতে আত্মরক্ষা না করিতে পারিয়া একান্ত অসহায় অনুভব করিতেছে। আকাশ মেঘে লেপা, ইতস্তত ধূসর মেঘপুঞ্জ রাশীকৃত মলিন বস্ত্রের মতো পড়িয়া আছে। জোর বাতাস থাকিলেও বৃষ্টির ধারা কখনো কখনো শিথিল হয়—কিন্তু বায়ুমণ্ডল যেন রিক্ত, বৃষ্টির একটানা একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল দিগন্তজোড়া ভেকের ঐক্যতান আছে কিন্তু নিতান্ত মনোযোগ না করিয়া শুনিলে তাহাও শোনা যায় না। বিশ্বজগতের একমাত্র শব্দ—ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ!

বনতলীর হাট হইতে খান দুই মহিষের গাড়ী জোড়াদীঘিতে ফিরিতেছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। গাড়ি দুইখানা জোড়াদীঘির বাজারের ব্যবসায়ীদের। গ্রামের হাটের দিন বাদে তাহারা আশেপাশে গাঁয়ের হাটে কেনাবেচা করিতে

যায়, বৃষ্টিতেও যায়, শীতেও যায়, রোদেও যায়, হাটুরে লোকের ঋতু বিচার করিলে চলে না।

গাড়ি দুইখানি অতিশয় কষ্টে চলিতেছে। পথটাকে পথ না বলিয়া কর্দমাক্ত খাল সমন্বিত উঁচুনীচু একটা নিরিখ বলিলেই চলে। মহিষের কোমর অবধি ডুবিয়া যায়, আবার কোনরকমে টানিয়া তোলে; কখনো গাড়ি ডান কাত হয়, কখনো বাঁ দিকে। গাড়োয়ান হাঁকে—হুঁশিয়ার, বাঁ দিক চেপে, আরোহীরা বাম দিকে দেহের ভার অর্পণ করে, কখনো বা গাড়োয়ানের নির্দেশমতো ডান দিকে। গাড়ির একটা ছই আছে বটে কিন্তু না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না, এমন প্রবল বৃষ্টি রুখিবার ক্ষমতা তাহার নাই। জলে আরোহীদের সর্বাঙ্গ সিক্ত।

আরোহী দুইজন জোড়াদীঘির বাজারের ভজহরি দাস এবং উক্ত গ্রামের মাণিক খুড়ো। ভজহরি ব্যবসায়ী, এমন বাদলেও তাহার বাহির না হইয়া উপায় নাই, কিন্তু মাণিক খুড়ো কেন বাহির হইতে গেল? এই প্রশ্ন তোমার আমার মনে স্বভাবতই উঠিবে, কিন্তু জোড়াদীঘির কাহারো মনে হইবে না, কারণ তাহারা সকলেই মাণিক খুড়োর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। মাণিকের চরিত্রের একটিমাত্র দুর্বলতা মৎস্যপ্রিয়তা। অবশ্য তাহার প্রসিদ্ধ বালাপোষ-খানা ধরিলে দুর্বলতা দুইটা। এমন মৎস্যপ্রিয় ব্যক্তি সে অঞ্চলে আর নাই। বাজারের সেরা মাছটি সে কিনিবেই, বাবুরাও পারিয়া ওঠেন না। সে হাট লাগিবার অনেক আগে বাজারে গিয়া ভজহরির দোকানে বসিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করে, গল্পগুজব করে, হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে আসর জমানো ছাড়া অন্য কাজ তাহার নাই। কিন্তু যেমনি মেছুনীরা মাছের ডালা নামাইয়াছে, যেমনি সবল সুদৃশ্য মাছটি দর্শনগোচর হইয়াছে, অমনি অর্ধ সমাপ্ত বাক্যটি শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়া খুড়ো টপ করিয়া মাছটি তুলিয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া আবার বিলীয়মান বাক্যাংশকে ধরিয়া ফেলিল। এই কাজে অর্থাৎ মাছটি সংগ্রহ করিতে তাহার আধ মিনিটও লাগিল না। ঝড়বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প যাহাই হোক না কেন, খুড়োর প্রতিদিন মৎস্যান্ন চাই। জোড়াদীঘির হাট সপ্তাহে দুই দিন, বাকি পাঁচ দিন সে আশেপাশের গাঁয়ের হাট হইতে

মৎস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। সামান্য বৃষ্টিবাদল দুর্যোগের কর্ম নয় খুড়োর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। অনেকে বলিত, খুড়ো, অবস্থা বিবেচনা ক'রে মাছ কিনতে হয়, তোমার কি মাছের জন্য এত খরচ করা উচিত? মাণিক বলিত, অবস্থা বিবেচনা ক'রে খেতে গেলে সারাজীবন কচুঘেচু খেয়েই কাটাতে হয়, এক-মুঠো চালও ভাগ্যে জোটে না। হিসাবকিতাবের আমার বাকি নেই। ইহার পরে আর প্রশ্ন চলে না। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে, এমন দুর্যোগে, শ্মশান-যাত্রীরাও যখন যাই কিনা যাই ভাবে, মাণিক খুড়ো কেন হাটে গিয়াছিল।

গাড়ির মধ্যে ভজহরি ও মাণিক জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে, সদ্য ক্রীত গোটা দুই ইলিশ শেষোক্তর পাশে ন্যস্ত। মাতা যেমনভাবে পুত্রের দিকে তাকায়, প্রণয়ী যেমনভাবে প্রণয়িনীর দিকে তাকায়, তেমনিভাবে সতৃষ্ণ নেত্রে সে রহিয়া রহিয়া মাছ দুটির দিকে তাকাইতেছে, এই ঘোরান্ধকারেও তাহার সজল দৃষ্টি মাছের গায়ে গিয়া যেন হাত বুলাইতেছে। মাছ দুটি মৃত, নতুবা এই লুব্ধ দৃষ্টির আলোতেই মরিত।

ভজহরি বলিল—আবার তো নতুন ক'রে লাগলো।

এমন সময় বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

খুড়ো বলিল—লাগলোই তো বটে! নাঃ কিছু আর বাকি থাকবে না।

ভজহরি বিস্ময়ে বলিল—বাকি? সব যাবে।

মাণিক বলিল—জোড়াদীঘি ভেসে যাবে।

ভজহরি বলিল—তালুক-মালুক সম্পত্তি জমিদারি কিছুই থাকবে না।

মাণিক শুধাইল—বৃষ্টিতে?

ভজহরি বলিল—কি মুস্কিল! মামলায়।

মাণিক বলিল—তাই বলো, আমি ভাবছিলাম তুমি বৃষ্টির কথা বলছ।

ভজহরি বলিল—কি গেরো! বৃষ্টির কথা কেন? আমি বলছিলাম বাবুদের মামলা আবার নতুন ক'রে শুরু হল। মাঝে একবার শুনলাম যে, আপোষ হবে, মনটা খুশি হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি—কি আর বলবো! কারো কিছু থাকবে না।

মাণিক বলিল—আমি তো ও-সমস্তর খোঁজখবর রাখি না—কি রকম শুনছ ?

ভজহরি বলিল—আমিও রাখি না, তবে থাকি বাজারের মধ্যে, অনেক কথাই কানে আসে। শুনছি নাকি দুই শরিকেই নানা জায়গা থেকে লেঠেল সংগ্রহ করছে। ছোটবাবু নাকি বলেছেন—এবারে একবার শেষ পরীক্ষা ক'রে নেবেন !

মাণিক বলিল—ওই বুদ্ধি মাথায় চাপলেই বুঝতে পারা যায়—সত্যিই শেষ না হয়ে যাবে না।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—এ তো সবই জানা কথা ! যেদিন ঋষিবাক্য অবহেলা ক'রে বুড়ো অশথের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে, সেই দিনই জমিদারির পরমায়ু ফুরিয়েছে। আর শুধু জমিদারি কেন—গাঁয়ের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। দেখো না কেন, নদীতে জল এলো শ্রাবণ মাসের শেষে ! আগের আমলের কথা মনে আছে তো ? আষাঢ়ের প্রথমেই জল আসতো !

ভজহরি বলিল—তাও যে আর বেশি দিন আসবে মনে হয় না। ধুপোনের মোহানা পর্বত-প্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে। মহকুমার হাকিম নাকি বলেছেন, তিন চার বছরের মধ্যেই জল আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

—যাবেই তো, যাবেই তো, এ সমস্তই জানা কথা ! মাণিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে গাড়োয়ান হাঁকিল—ডান দিকে চেপে !

দুইজনে ডান দিকে ঝুঁকিয়া বসিল, গাড়ি হড়াৎ করিয়া কাদায় পড়িয়া গেল। আর উঠিতেই চায় না,—তখন গাড়িতে গাড়োয়ানে মহিষে এবং আরোহিদ্বয়ে অনুনয়, বিনয়, প্রণয়, অভিনয়, মান-অভিমান, তর্জন-গর্জন কত রকম যে চলিল, কতক্ষণ ধরিয়া যে চলিল—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কর্ণের রথচক্রের মতো গাড়ির চাকা দুটিকে ধরিত্রী কিছুতেই ছাড়িল না। মহিষ দুটা কাদায় অর্ধ-প্রোথিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

ভজহরি বলিল—রাতটা বুঝি এখানেই কাটাতে হয়।

মাণিক বলিয়া উঠিল—না, না, তাও কি হ'তে পারে! এখানে পড়িয়া থাকিলে মৎস্য দুটির সদ্গতি করা যাইবে না, ইহাই তাহার আপত্তির তাৎপর্য।

গাড়োয়ান বলিল—দাস মশাই, আপনারা না হয় এগোন, আমি দেখি গাড়ি তুলতে পারি কি না। তখন অগত্যা ভজহরি ও মাণিক কাপড় গুটাইয়া মাথায় ছাতা দিয়া হাঁটিয়া রওনা হইল। সেই অতি ঘোর অন্ধকার, সর্বপ্রকার দীপ্তিহীন,—কেবল মাণিকের হাতে দোদুল্যমান মাছ দুটির চকিত শুভ্রতা আতস কাচের মতো অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত আলোককণাকে সংহত করিয়া এক একবার ঝলকিয়া উঠিতে লাগিল।

দু'দশ পা অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহারা পথের নিরিখ হারাইয়া ফেলিল। মাঠ ও পথ সমান কর্দমাক্ত, কাজেই পথ চেনা সম্ভব নহে; চতুর্দিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ, সমান অন্ধকার, কাজেই দিগ্‌ভ্রম স্বাভাবিক, নিতান্ত না চলিলে নয় বলিয়াই তাহারা চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চলিবার পরে মাণিক বলিল—এ কেমন হ'ল দাস, গ্রাম দশ মিনিটের পথ, এখনো পৌঁছতে পারলাম না, পথ ভুল হ'ল নাকি?

ভজহরি বলিল—অসম্ভব কি!

মাণিক বলিল—কিন্তু কই গাঁয়ের একটা আলোও তো দেখা যায় না! বুড়ো অশথ ছিল গাঁয়ের নিশানা, সেটাও তো গিয়েছে।

—আর থাকলেই কি এই অন্ধকারে দেখতে পেতে? নাও, পা চালিয়ে চলো।

মাণিক বলিল—কিন্তু পা যে আর চলতে চায় না।

মাণিকের কথা সত্য। পদে পদে পা হাঁটু অবধি পুঁতিয়া যায়। কষ্টে টানিয়া তুলিলে সেই গর্তে চারিদিকের জল গড়াইয়া আসিয়া ঝির ঝির শব্দে পড়ে, আর শব্দ বিরামহীন বৃষ্টির ঝুপ ঝুপ ঝুপ। জগতে আর কোনো শব্দ নাই, না একটা পাখীর পাখার ঝটপটি, না একটা শিয়ালের ডাক।

মাণিক বলিল—দাস, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে জোড়াদীঘি নেই, তাই আমরা পৌঁছতে পারছি না,—যেন আমরা পনেরো, কুড়ি বৎসর সময় এগিয়ে গিয়েছি, সেদিনের শূন্যতাকে আজ প্রত্যক্ষ দেখছি।

ভজহরি বলিল—এই যে সামনে একটু ফরসা জায়গা, বোধ করি পথের নিশানা আবার পাওয়া গেল। কিন্তু একি!—বলিয়া সে চমকাইয়া উঠিল, দুজনেই থামিল, অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং একটি অস্ফুট রব দুইজনে করিল। পথ ভুলিয়া দুইজনে জোড়াদীঘির শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মাণিক বলিল—লক্ষণটা ভালো নয়, ভাই! গ্রাম লক্ষ্য ক'রে চললাম, এসে পৌঁছলাম শ্মশানে।

ভজহরি বলিল—আমাদের দোষ নেই, নদীর জল ফেঁপে উঠে শ্মশানটাই গ্রামের কাছে এগিয়ে এসেছে!

মাণিক বলিল—রাম রাম করো ভাই, রাম নাম করো। এই বলিয়া তাহারা দুইজনে শ্মশানটাকে পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।

তখন সেই বর্ষণমুখরিত অন্ধকারে, নভোব্যাপী নিস্তব্ধতায় মনে হইতে লাগিল মহেশ্বরের নন্দী-ভৃঙ্গী যেন সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়া বিশ্বপট হইতে জোড়াদীঘির কালো বিন্দুটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে! সজল পদধ্বনি তুলিয়া পথিকদ্বয় কোন্ শূন্যতার মুখে চলিতেই লাগিল।

১

বৈশাখের অপরাহ্নে ঈশান কোণের আকাশে ছোট্ট একখানা মেঘ ভাসিয়া ওঠে, কাহারো নজরে পড়ে না। সকলের অজ্ঞাতসারে দিগন্তের ধার ঘেঁসিয়া মেঘ জমিতে থাকে, নিঃশব্দে। ক্রমে স্তরে স্তরে মেঘের স্তূপ ভিড় বাঁধে, তারপরে আকাশের সে দিকটা দৈত্যের মাংসপেশীবহুল দেহের কৃষ্ণ-সমারোহ বিকাশ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেঘ যত বেশি জমে, বাতাস তত পড়িয়া আসে, বায়ুমণ্ডলে ভাটার টান লাগে—ক্রমে বায়ুমণ্ডলে বাতাসের একটি তরঙ্গও আর থাকে না। ধীরে ধীরে দু'একটি বিদ্যুতের ল-ফলা আকাশে চমক দেয়।

প্রথমে মেঘের এই অতর্কিত সমারোহ চোখে পড়ে মাঠের রাখালগণের। তাহারা এ ওকে ডাকিয়া নীরব তর্জনীতে আকাশটা দেখায়। তারপরে চোখে পড়ে নদীর মাঝিদের। তাহারা একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া নৌকার পাল নামাইয়া ফেলে, যে নৌকাখানা ঘাটে বাঁধা আছে, আরো একটা অতিরিক্ত কাছি দিয়া তাহাকে বাঁধে।

দিগন্তের রেখাটা ক্রমে স্থূলতর হইয়া ওঠে, দিগন্তের ধারে কালো ছায়া পড়ে, নদীর দুই কূলে কালো তুলি বুলাইয়া যায়, চঞ্চল পুঁটির দল অজ্ঞাত আশঙ্কায় গভীরতর জলে গিয়া প্রবেশ করে—মাছরাঙাটি শিকার সন্ধানে নিরাশ হইয়া আকাশের অবস্থা দেখিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়, বিদ্যুৎ-কপিল-প্রান্ত মেঘের পটে বেলেহাঁসের পাখার সঞ্চরণ চমক মারিতে থাকে, কাকের দল বৃক্ষচূড়ে বসিয়া কর্কশ শব্দ করে,—তারপরে তাহাও থামিয়া যায়, পৃথিবী যেন জীবশূন্য।

হঠাৎ বিদ্যুতের আকাশব্যাপী একটা সুদীর্ঘ ল-ফলা খেলিয়া যায়—আর একটা তীব্র কর্কশ গর্জন, আকাশের ধূসর পর্দাখানাকে কে যেন এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবধি সশব্দে ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন, আকাশে বাতাসে গাছের মাথায়, ইতস্তত-নিক্ষিপ্ত মৃতপ্রায় কাকের দেহে—সে এক লুটোপুটি কাণ্ড। জটায়ু যেন রাবণের ঝুঁটি ধরিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি মারিতেছে। তখন চারিদিকে 'রাখ রাখ, থাম থাম, রক্ষা করো' ধ্বনি উঠিতে থাকে। কালবৈশাখীর ঝড়! মড় মড় করিয়া ডাল ভাঙে, পট পট করিয়া চালের বাঁধন ছেঁড়ে, চাল উড়িয়া যায়—খুঁটি হেলিয়া পড়ে। হঠাৎ আকাশ যেন নির্জীব। কিন্তু নিশ্বাস ফেলিবার সময়টুকু যাইতে না যাইতেই আবার দমকা, আবার গর্জন। অবশেষে বাতাসের পক্ষিরাজে সোয়ার হইয়া ছোটবড় শিলাখণ্ডের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে করিতে বৃষ্টি দেখা দেয়। নারিকেল সুপারি গাছগুলি মাথা নাড়িয়া ক্রমাগত বলিতে থাকে—না না! আম জাম কাঁঠাল বাতাসের প্রচণ্ড তালে তালে সবুজ পল্লবের আবরণ ঘুচাইয়া ডালপালার বঙ্কিম রেখা উদ্ঘাটিত করিয়া মেঘ ও বিদ্যুতের লীলা প্রকাশ করে। এমনিভাবে কিছুক্ষণ চলে। তারপরে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল, তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া যায় কালবৈশাখীর ধ্বংসকাণ্ড। তখন চারিদিকে ভগ্ন বৃক্ষ, ছিন্ন পল্লব, ভাসিয়া আসা খড়কুটা, ধ্বস্ত গ্রাম আর উৎপাটিত বৃক্ষের ব্যাদিত গহ্বর পড়িয়া থাকে। ইতস্তত মুমূর্ষু পাখীর দেহ তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে অতীত অভিজ্ঞতার আশঙ্কায়—আর মানুষ নানা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে বাহির হইয়া চারিদিক দেখিয়া ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের শান্ত মহিমায় জলেস্থলে তখন শ্মশানের শূন্য শুচিতা। তখন সেই বৃষ্টিধৌত সন্ধ্যার ক্লান্তিময় প্রহরগুলি প্রতিধ্বনিত করিয়া ঝিল্লীর বাউলদল যুদ্ধের নিষ্ফলতার অবসানে বৈরাগ্যের শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। মেঘান্তহিত আকাশের প্রান্তে তৃতীয়বার চন্দ্রকলা করুণ হাসি হাসে।

২

কালবৈশাখীর অতর্কিত সমারোহে জোড়াদীঘির দশানি ও ছ'আনি চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহার পূর্বে যে-সব মারামারি হইয়াছে, সমস্তই গ্রামের মাঝে; বাহির হইতে লাঠিয়াল আনিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবারে উভয় পক্ষই দূর দূরান্তর হইতে লোক আনিতে লাগিল। এই সব লাঠিয়ালরা বংশানুক্রমে জোড়াদীঘির বাবুদের পোষ্য। সেকালে ইহাদের পূর্বপুরুষ লাঠির জোরে বাবুদের সম্পত্তি অর্জন করিয়া দিয়াছে এবং তাহার পুরস্কারস্বরূপ জোত-জমি পাইয়াছে। এখানকার কালে লাঠির প্রয়োজন বড় হয় না, লাঠি এখন হাকিমের তর্জনীতে ও উকিলের মুখে জন্মান্তর লাভ করিয়াছে। সেকালের লাঠিয়ালদের উত্তরপুরুষদের অনেকেই পৈতৃক বিদ্যা ভুলিয়া চাষ-বাস করে, চিনির কারখানায় কাজ করে, আর যে দু'চার কলম লেখাপড়া শিখিয়াছে সে মফস্বল আদালতের স্ট্যাম্পের ভেণ্ডারি করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম অতিবাহিত করে। বাবুদের কাজে আর তাহাদের বড় ডাক পড়ে না।

দশানি ও ছ'আনি দুই পক্ষ হইতেই এইসব পুরাতন সেবকদের সন্ধানে লোক বাহির হইল। লাঠিয়াল বংশের যাহারা গ্রামেই থাকে, ব্যবসায়ান্তর এখনো গ্রহণ করে নাই, তাহারা অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে নাচিয়া খাড়া হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—বাবুরা দেখছি আবার জমিদারিতে মন দিয়েছে, আমাদের বুঝি আবার সুদিন ফিরলো! এই বলিয়া কেহ আল্লাকে ধন্যবাদ দিল, কেহ বা কালীকে; এবং সকলেই একে একে দিনে দিনে, কেহ বা একাকী কেহ বা সানুচর, কালবৈশাখীর মেঘের মতো জোড়া-দীঘির ভাগ্যাকাশে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল।

একদিন ভোরবেলা মালঞ্চির বুড়া সেখ আসিয়া কীর্তিনারায়ণকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—কি সেখ, কেমন আছো? একেবারে বুড়ো হয়ে গেলে যে।

সেখ বলিল—কর্তা, আমরা কি আজকের মানুষ! বুড়ো কর্তার আমলের লোক! হুজুরকে দেখেছি এতটুকু। তা ছাড়া আজকাল কাজকর্ম নেই, চুপচাপ ব'সে ব'সে হাতে পায়ে মরচে ধ'রে গেল। হুজুরের দত্তা জমি-জমা আছে তাই খেতে পাচ্ছি, তা না হ'লে এতদিন না খেয়েই মরতে হ'ত।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—বেশ তো, এবারে মনের মতো কাজ পাবে। পারবে তো? সে লাঠির জোর আছে তো?

সেখ বলিল—কাজের সময়ে দেখে নেবেন, সেখ বুড়ো হয়ে পড়েছে কি না।

কীর্তি বলিল—আচ্ছা যাও, এখন বিশ্রাম করগে। আর শোনো, এখন তুমিই হ'লে সর্দার, সকলকে বেশ তালিম দিয়ে নিয়ো।

সেখ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

লোকটার নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল, সকলেই তাহাকে মালঞ্চির সেখ বলিয়া ডাকিত, কেহ কেহ তাহাকে বুড়ো সেখও বলিত। মালঞ্চি গ্রামে তাহার বাড়ি। তাহার মতো লাঠিয়াল এ অঞ্চলে নাই। তাহাদের বংশই লাঠিয়ালের, কত লোক যে তাহারা মারিয়াছে আর তাহাদের বংশেরও কত লোক যে লাঠির ঘায়ে মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

তারপরে আসিল যদু মল্ল। সে দশানির বহুকালের প্রজা। লোকটা যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি কৃশ, দূর হইতে একটা চলমান ঠ্যাঙা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একবার লাঠি ধরিলে—ভয়েই বিপক্ষের লাঠি খসিয়া পড়ে। যদু মল্লর ডান বাম দুই হাত সমান চলে। লাঠি খেলিবার সময়ে তাহাকে দেখিলে বোধহয় দুইখানা লাঠি যেন চরকির মতো ঘুরিতেছে, বোধহয় একখানা লাঠি আর-একখানা লাঠিকে ঘুরাইতেছে। লোকে তাহাকে যদু মল্ল বা ঢ্যাঙা যদু বলিত।

যদু মল্লর সঙ্গেই আসিল পঞ্চু সেখ, একই গ্রামে দু'জনের বাড়ি। লোকটা ঢালী, গণ্ডারের চামড়ার প্রকাণ্ড একখানা ঢাল হাতে করিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটার একটা হাত কোনো এক দাঙ্গায় কাটা গিয়াছে। পঞ্চুকে হাতের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে আদ্যোপান্ত বলিয়া মন্তব্য করে যে—

হাতটা গিয়াছে বালাই গিয়াছে। আরে ভাই, যে দিনকাল, লোকে একটা হাতের মূল্যই দিতে চায় না, দুটো হাত থাকা নেহাৎ বাজে খরচ। তারপরে বলিত, আমার চাচাকে ছোটবেলাতে দেখিয়াছি, বেশ মনে আছে তার দুটা হাতেই কাটা গিয়াছিল, মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া দুষমন কাৎ করিয়া ফেলাই তাহার অভ্যাস ছিল। চাচা বলিত, হাত দুটা না যাওয়া অবধি মাথার মূল্য বুঝিতে পারি নাই।

শ্রোতারা অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিত। পঙ্গু বলিত, যখন দুই হাত ছিল তখন এক হাতে ধরতাম ঢাল এক হাতে শড়কি। এক হাত গেলে—শড়কি ছাড়লাম। যদি খোদা কখনো দয়া ক'রে এ হাতটাও নেন তবে চাচার মতো মাথা চালানো আরম্ভ করবো, দেখি সম্মুখে দাঁড়ায় কে! তারপরে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিত, বাবা, কৈবর্তগাঁতির সেখদের মাথা বড় শক্ত! একেবারে পাথর কেটে গড়া।

পরের দিন সোনারাজুর কলিমুদ্দি পরামাণিক আসিল। লোকটা খোঁড়া। ওইখানেই তাহার জিৎ। প্রতিপক্ষ তাহাকে দুর্বল মনে করিয়া অসাবধান হইবামাত্র কলিমুদ্দি লাঠির ঘায়ে তাহাকে কাৎ করিয়া ফেলে। কলিমুদ্দি বলে, প্রথম যখন পা খোঁড়া হ'ল কতই না কেঁদেছি—কিন্তু তারপরে বুঝলাম আল্লা হাকিম বড়ই সুবিচার করেছেন। দু'পাওয়ালা লোকের যে পথ চলতে দু'ঘণ্টা লাগে, আমি দেড় পায়ে দেড় ঘণ্টায় মেরে দিই। লগি দিয়ে যেমন নৌকা ঠেলে তেমনি আমার খোঁড়া পাখানা আস্ত পাখানাকে ঠেলতে থাকে—আর আস্ত বেটা হন হন ক'রে এগিয়ে চলে! দু'খানা পা আস্ত থাকলে কি চলতে পারতাম! এই বলিয়া সে খোঁড়া পা-খানার উপরে একবার চাপড়ে মারিয়া বলে—সাবাস্!

ইহারা সকলেই দশানির বাড়িতে উঠিল। সকলেই দশানির প্রজা, বহুকালের চাকরান-ভোগী লাঠিয়াল।

ছ'আনির আড়ম্বরও কিছু কম নয়। দূর দূরান্তর হইতে একে একে ক্রমে ক্রমে ছ'আনির চাকরান-ভোগীর দল জুটিতে লাগিল।

প্রথমেই আসিল বুড়া নইমুদ্দি মিঞা। মাথায় টাক, বলিষ্ঠ শরীর, বেঁটে-খাটো লোকটা। নাকটা তাহার এমন বাঁকা যেন একটা আস্ত টিয়াপাখী সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। নইমুদ্দির মতো এমন বিপর্যয় টেরা চোখ কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার দুই চোখের দুই দৃষ্টি সপত্নীদ্বয়ের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত-পথগামী। ওই টেরা চোখই তাহার প্রধান সম্পদ। লাঠালাঠির সময়ে তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া প্রতিপক্ষ বুঝিতে পারে না সে কোন্ দিকে তাক্ করিতেছে। হঠাৎ বিভ্রান্ত বিপক্ষের ঘাড়ে লাঠি আসিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। নইমুদ্দির সঙ্গে আসিল তাহার লায়েক পুত্র। নইমুদ্দি ছ'আনির সর্দার-লাঠিয়াল।

আর আসিল নাড়ুসগোপাল। তাহার আসল নাম অজ্ঞাত। নামটা বোধ হয় তাহার দেহাত্মক। লোকটা শান্তশিষ্ট গোলগাল, রঙ ফর্সা, যেন একতাল খোয়া ক্ষীর। কথাগুলিও তাহার মিষ্ট। সবসুদ্ধ মিলাইলে নাড়ুসগোপাল নামটা তাহার উত্তম বর্ণনা বলিতে হয়। সে বলে—আরে রাম, লাঠিসোটা নিয়ে লড়াই করা কি ভদ্রলোকের কাম! ভদ্রলোকের অস্ত্র হচ্ছে এই—বলিয়া সে ছোট ছোট উড়ো-শড়কিগুলি দেখায়। লড়াইয়ের সময়ে সে শান্তভাবে উড়ো-শড়কির স্তূপের পাশে দাঁড়াইয়া ডান পায়ের দুই আঙুলে শড়কি টিপিয়া ধরে, ধরিয়া সজোরে সম্মুখের দিকে নিক্ষেপ করে। সে শড়কি প্রতিরোধ করাও যেমন কঠিন, গায়ে বিঁধিলে প্রাণরক্ষা করাও তেমনি দুরূহ। বিনা ধনুকের তীরের মতন অব্যর্থ, তীরের চেয়েও মারাত্মক। এক পঞ্চুসেখ ঢালী ছাড়া কেহ তাহার তীর রুখিতে পারে না।

ইহা ছাড়া আসিল বৃদ্ধ কেদার সর্দার। আর আসিল নালু কালু যমজ ভাই, এ অঞ্চলের বিখ্যাত ঘোড়সোয়ার। ইহারা সকলেই ছ'আনির তরফের লোক। এইসব নাম-করা সর্দারগণ ছাড়া আরো কত যে অজ্ঞাত লোক লুটের আশায় ও পুরস্কারের লোভে আসিয়া দুই পক্ষে যোগ দিল তাহার লেখাজোখা নাই। এই সব ছোটবড় কটা কালো মেঘের ভারে জোড়াদীঘির আকাশ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

৩

দুই পক্ষের লাঠিয়ালের নিঃশব্দ আবির্ভাবে গ্রামে যে অবস্থার উদ্ভব হইল ইউরোপীয় ইতিহাসের ভাষায় তাহা 'armed neutrality' বা সশস্ত্র শান্তি। সৈন্য প্রস্তুত, অস্ত্র প্রস্তুত, অথচ সে-সমস্ত ব্যবহৃত হইতেছে না, এমন অবস্থা ইউরোপের ইতিহাসে বারংবার ঘটিয়াছে—এবং তাহার পরিণাম ভয়াবহভাবে বারংবার আত্মপ্রকাশ করিলেও রাষ্ট্রধুরন্ধরগণের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। তলোয়ারের দ্বারা সীমান্ত রচনা করিয়া শান্তিতে বাস করিবার চেষ্টা আর বালির বাঁধ রচনা করিয়া বন্যা প্রতিরোধ একই জাতির পণ্ডশ্রম। তলোয়ার বর্শা, বল্লম, সঙ্গিন দ্বারা শান্তির সীমান্ত রচনা করা আর বিদ্রোহীর হাতে দেশের কর্তৃত্ব অর্পণ—একই কথা! যাহাদের উপরে ভার দিতেছ—প্রথম সুযোগেই তাহারা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিবে! মানুষ নিতান্ত নির্বোধ বলিয়াই ভাবে যে অস্ত্র তাহার পোষমানা নির্জীব পদার্থ। মানুষ যখন অস্ত্রে শাণ দিতে থাকে, তখন ভাবে ওই নিষ্প্রাণ ইস্পাতখানার সে-ই কর্তা! কিন্তু সে ভাবিতেই পারে না যে যখন সে একখানা তলোয়ার গড়িতেছে, তখন বস্তুত দুইখানা তলোয়ার নির্মিত হইতেছে। মানুষে শাণ দিতেছে ইস্পাতে, আবার ইস্পাত শাণ দিতেছে অস্ত্র-নির্মাতা মানুষকে। কঠিন ইস্পাত তলোয়ারে পরিণত হইতেছে, আর মানুষটা হইতেছে হিংস্র পশুতে পরিণত। তলোয়ার শাণ পাইয়া হিস্ হিস্ করিতেছে, আবার তলোয়ারের সংঘর্ষে মানুষটার মনে হিংসার শিখা দপ দপ করিয়া ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতেছে। যোদ্ধা যখন তলোয়ারখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাহির হয়—তলোয়ারখানাও যে তখন তাহাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ তখন নিতান্ত অসহায়ভাবে তলোয়ারের করায়ত্ত, মানুষটাকে সে অভীপ্সিত পথে চালিত করে। যোদ্ধা তলোয়ারের আঘাতে একটা শত্রু নিপাত করিল—কিংবা তলোয়ারখানা যোদ্ধাকে দিয়া একটা মানুষ মারিয়া ফেলিল -

দুই রকম ভাবেই এই ভাবটিকে প্রকাশ করা চলে। তলোয়ার নির্জীব নহে, তাহার তীক্ষ্ণ শুভ্রতা শয়তানের বিজয়ের স্মিত, কামানের কণ্ঠে শয়তানের হুঙ্কার, বোমার বিস্ফোরণ শয়তানের জয়ের উল্লাস। অস্ত্রের ষড়যন্ত্রের সম্মুখে মানুষ একান্ত অসহায়। সে অস্ত্রের ক্রীড়নক মাত্র।

জোড়াদীঘিতে এখন সশস্ত্র শান্তির পর্ব চলিতেছে। কেহই প্রকাশ্যে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে না, দেখা হইলে রুষ্ট বাক্যের পরিবর্তে মার্জিত হাসির দ্বারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করে—ইস্পাতসুলভ মার্জিত হাসি। কিন্তু প্রত্যেকেই ঘরে অপরের বিরুদ্ধে মানসাস্ত্রে শাণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর শুধু মানসাস্ত্রই নয়। ছ'আনি ও দশানির পুরানো কালের অস্ত্রশস্ত্র বাহির হইয়াছে। পুরাতন কিরীচে যেমন ধার দেওয়া হইতেছে, তেমনি নূতন বন্দুক, গুলী-বারুদও সংগৃহীত হইতেছে, পাকা বাঁশের লাঠির কথা না হয় না-ই ধরিলাম। গ্রামে নিত্য নূতন লোক আসিয়া জুটিতেছে, গ্রামের জনসংখ্যায় জোয়ার-জলের স্ফীতি দেখা দিয়াছে। জোয়ারের জল উর্ধ্ব সীমায় পৌঁছিলে যেমন থমথমে ভাব দেখা দেয়,—গ্রামে এখনি তেমনি একটা থমথমে ভাব।

গ্রামে অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধি—তবু যেন গ্রামখানি নির্জন! এত লোক, তবু যেন কোলাহল নাই। সমস্ত জনপদে কেমন একটা ছায়াবাজির অপদার্থতা। ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ইতিমধ্যেই পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। মাঠের রাখালের তারস্বর যেন ধ্বনির ত্রিশূলে আকাশকে বিদ্ধ করে, রাত্রির অন্ধকার জগদ্দল শিলার ভার বহন করিয়া দেখা দেয়, দিনের আলো অতল গহ্বরের শূন্যতাকে প্রকাশ করে, হাসির শুভ্রতা দিকে দিকে মৃত্যুর শ্বেতবস্ত্র প্রসারিত করিয়া দেয়, আর দিবসান্তের গোধূলি যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তময় পরিণাম আকাশে অঙ্কিত করিতে থাকে।

গ্রামের কাহারো মনে শান্তি নাই—অথচ অশান্তির কারণও কেহ নির্দেশ করিতে পারে না। বৃদ্ধেরা রাত্রি জাগিয়া ইষ্ট-নাম জপ করে, সুপ্ত-শিশু স্বপ্নে কাঁদিয়া ওঠে! মনে হয় গ্রামের পথে নিশীথরাত্রে কাহারা যেন শ্বেতবস্ত্র পরিয়া যাতায়াত করিতেছে, শেষরাত্রে কাহারা যেন অজ্ঞাত ভাষায় গৃহস্থের

নাম ধরিয়া ডাক দিয়া যায়। বিজন শ্মশানে হঠাৎ ক্রন্দনের রোল ওঠে! গৃহস্থ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়াও শঙ্কা ভুলিতে পারে না।

নানা রকম ভয়াবহ জনশ্রুতি গ্রামে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল—রাত্রে বিলের ধারে শত শত আলো জ্বলিতে নিভিতে দেখিয়াছে, কেহ বলিল—কাল গভীর রাত্রে দক্ষিণপাড়ার বিলে কাহারা যেন পলো দিয়া মাছ ধরিতেছিল। একদিন হরি-বাড়িতে ছিন্ন ছাগমুণ্ড আবিষ্কৃত হইল, পরদিনে কালীর বেদীতে শ্বেতচন্দনের দাগ দেখা গেল!

একদিন মাণিক খুড়ো আসিয়া বাজারের মধ্যে গল্প করিল যে, সে নাকি পরশু সন্ধ্যায় দশানির ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়া আসিবার সময়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াছে। সকলে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে খুড়ো বলিল—হঠাৎ কার কান্না শুনে এদিকে ওদিকে চাইলাম, কই কাউকে দেখতে পাইনে—অথচ কান্নার শব্দ স্পষ্ট, কানের ভ্রম নয়। এমন সময়ে ভাঙা দালানের উপরে নজর পড়তেই—সর্বনাশ! এই বলিয়া সে থামিল।

সকলে কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া শুধাইল—কি দেখলেন?

খুড়ো বলিল—বললে কি বিশ্বাস করবে? প্রথমে দেখে আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। দেখি যে দশানির কর্ত্রী একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রে ব'সে গালে হাত দিয়ে কাঁদছেন।

একজন শুধাইল—তোমাকে দেখে কি করলেন?

মাণিক বলিল—আমি কি আর অপেক্ষা করলাম! অমনি ছুটে চ'লে এলাম।

তারপরে ছোট্ট একটি মন্তব্য করিল—পরিণাম শুভ নয়।

তখন ভজহরির দিকে তাকাইয়া বলিল—সেদিন রাত্রে যে বিপদে পড়েছিলাম, মনে আছে তো?

ভজহরি মৌন সম্মতির দ্বারা জানাইল—সে বিপদ ভুলিবার নয়।

গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস হইয়া গেল যে, দশানির কর্ত্রী ইতিমধ্যে কাশী পাইয়াছেন, যদিচ বড়বাবু খবরটা প্রকাশ করেন নাই। আর গ্রামের শোচনীয়

পরিণাম স্মরণ করিয়া কর্ত্রী ঠাকুরানী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রামে আসিয়া রোদন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন হাটবার। হাটের মধ্যে আসর জমাইয়া শশাঙ্ক গল্প করিতেছে। সে শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—ভাই, জীবনে এমন বিপদে পড়িনি। কাল রাত্রে, তা একটু অধিক রাত্রি হয়েছিল বই কি, টোলে ফিরছি, এমন সময়ে যেমনি সেই বটগাছের তলে উপস্থিত হয়েছি হঠাৎ পায়ে যেন কি একটা বাধ্‌লো, আছাড় খেয়ে পড়লাম! ভাবলাম—উঁহু, এমন তো হবার কথা নয়, আমি একজন মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি, হঠাৎ পদস্খলন! এ কি রকম হ'ল। মনে হ'ল কোনো লতায় পা বেধে গিয়েছে। হাত দিয়ে লতাটা তুলে দেখি—সর্বনাশ, এখনো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

সবাই সমস্বরে বলিল—কি দেখলে ঠাকুর?

শশাঙ্ক বলিল—যা দেখবার তাই দেখলাম। লতা নয়, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। জটা!

—কার জটা?

শশাঙ্ক বলিল—কার জটা তাও কি নাম ক'রে ব'লে দিতে হবে? যে মহাপুরুষ ওই বটগাছে থাকেন—তাঁরই জটা! তখন তিনি গঙ্গাস্নান সেরে এসে জটা শুকোচ্ছিলেন—সেই জটায় গিয়েছে পা বেধে! এমন ক্ষেত্রে পদস্খলন তো অনিবার্য!

সকলে শুধাইল—সন্ন্যাসীকে দেখলে?

শশাঙ্ক বলিল—অবশ্য দেখলাম! উপরে মুখ তুলে দেখি তাঁর চোখ দুটো আগুনের হল্কার মতো জলছে। আমি জোড়হাত ক'রে প্রণাম করলাম। তিনি একটু হাসলেন। বুঝলাম যে নিতান্ত আমি ব'লেই মাপ ক'রে দিলেন, অন্য কেউ হলে তক্ষুনি—

সবাই শুধাইল—কি করতেন?

শশাঙ্ক বলিল—কি করতেন তাও কি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে হবে? তুমিই বলো না হরিচরণ, তুমি তো প্রাচীন লোক।

হরিচরণ খুশি হইয়া বলিল—ওই জটায় পাক দিয়ে মেরে ফেলতেন—এ তো সহজ কথা। এই তো সেবার ছিরু হাড়িকে সকালবেলায় ওখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

শ্রোতারা শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। কেবল আবগারি দোকানদার মনে মনে হাসিল। ছিরু তাহার একজন প্রধান খরিদ্দার ছিল। আর শশাঙ্ক ঠাকুর যে গতকল্য দুইমাত্রা মৌতাত খরিদ করিয়াছে সে কথা আর কেহ না জানুক—সে তো জানে!

সবাই শুধাইল—কি হবে ঠাকুর?

শশাঙ্ক বলিল—সে আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়। কাল সকালে পাঁচটা পান, পাঁচটা সুপুরি আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা সঙ্গে ক'রে আমার গৃহে যেয়ো, ব'লে দেবো, সব আমার নখাগ্রে!

৪

সন্ন্যাসীর জটা, দশানির ক্রন্দন প্রভৃতি অনৈসর্গিক বস্তুতে শশাঙ্ক পূরাপূরি বিশ্বাস করে কিনা বলা শক্ত, কারণ তাহার কাণ্ডজ্ঞান অতিমাত্রায় সক্রিয়। হয় তো বিশ্বাস করে, হয়তো করে না, হয়তো সংস্কারের দ্বারা বিশ্বাস করে, হয়তো বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাস করে না—এমনি মিশ্র ধাতুতে তাহার চরিত্র গঠিত। সে কিছু কিছু কাক-চরিত্র ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা করে। গ্রামের লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকাটা-সিকেটা কলা-মূলা প্রভৃতি আদায় করে—কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে বিল্ব-বৃক্ষে উপবিষ্ট কস্মচিৎ বায়সের ডাকের উপরে বা আকাশের গ্রহনক্ষত্রের উপরে ছাড়িয়া দিয়া সে কখনো নিশ্চিন্ত হয় নাই। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে—পুরোহিত মন্ত্রতন্ত্রে অবিশ্বাস করিলেও কিছু আসে যায় না—যজমানের বিশ্বাস ও অর্থের উপরেই পূজাপার্বণের সফলতা নির্ভরশীল।

গ্রামের যে একটা অমঙ্গল আসন্ন তাহা সে বুঝিত, কিন্তু তাহার জন্য কোন-প্রকার অনৈসর্গিকের সাহায্য লইতে তাহাকে হয় নাই—কাণ্ডজ্ঞানের বলেই

এই সত্যে সে উপনীত হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, একটা বড় রকমের মারামারি আসন্ন, এবং তাহার ফলে কতক লোকের প্রাণহানিরও সম্ভাবনা তাহাও সে জানিত। ইহাতে সে বিচলিত হইয়াছিল। গ্রামের সাধারণ লোকের অনেকেই তাহার খাতক এবং মরিবার বেলায় তাহারাই মরিবে। আসন্ন দাঙ্গাতে ছ'আনির জয় হোক কি দশানির জয় হোক শশাঙ্ক ঠাকুরের পক্ষে দুই-ই সমান, যেহেতু ছ'আনি দশানি নির্বিশেষে তাহার খাতকের দল। তাহার অভিজ্ঞতা বলে যে, জীবিত খাতকের নিকট হইতেই পাওনা টাকা আদায় করা কঠিন, কিন্তু সে একবার মরিলে কাজটা সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া টাকা আদায়ের জন্য খাতকদের উপরে চাপ দিতে আরম্ভ করিল। সকলে শুধাইল—ঠাকুর, এত তাগাদা কেন?

শশাঙ্ক বলিল—ভাই, একবার গঙ্গাস্নানে যাবো, তাই কিছু টাকা।

কেহ কেহ বলিল—ঠাকুর, গঙ্গাস্নানে এত টাকা নিয়ে গেলে যে চোর-জুয়োচোরের হাতে পড়বে, তার চেয়ে আমাদের হাতে থাকলে মন্দ কি?

শশাঙ্ক মনে মনে ভাবিল—চোর-জুয়াচোরের হাতেই তো পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল—ভাই, বিদেশে টাকাই বন্ধু। একজন বলিল—কিন্তু বিদেশে অধিক টাকাই শত্রু। অমন কাজের মধ্যে যেয়ো না, ঠাকুর।

ফলে ঠাকুর বুঝিতে পারিল টাকা সহজে কেহ দিবে না। তাই সে নালিশের ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল।

তখন তাহার দেনাদারগণ একত্রে শলা-পরামর্শ শুরু করিল। সেই দলে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, কোনপ্রকার জাতিবৈষম্য ছিল না। যাহারা বলে যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য সম্ভব নয়—তাহারা ইতিহাস জানে না। পলাশী-প্রসঙ্গে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন কেমন জোট বাঁধিয়াছিল। আবার বর্তমান প্রসঙ্গে কেমন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তবে তেমন তেমন উপলক্ষ্য চাই। ভারত-উদ্ধার অতি অবান্তর উপলক্ষ্য! এই সামান্য ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আশা করিলে অন্যায় হইবে।

শশাঙ্ক ঠাকুরের খাতকের দলে কানু ঘোষ ছিল, বিজয় বৈরাগী ছিল, শ্রীচরণ রজক, রহিম খোঁড়া প্রভৃতি অনেকেই ছিল।

রহিম বলিল—ভাই, আর তো সহ্য হয় না। ঠাকুর বেঁচে থাকতে টাকা না দিয়ে উপায় নেই।

শ্রীচরণ বলিল—তবে কি ঠাকুরকে—

রহিম বলিল—হাঁ, হাঁ, সেই ভালো। কে আর আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সবাই যে ওর খাতক।

তখন স্থির হইল যে, কালীবাড়ির মাঠ এই সব কাজের অতি প্রশস্ত স্থান। একবার সন্ধ্যার সময়ে ওখানে ঠাকুরকে লইয়া ফেলিতে পারিলে তাহাকে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করা কঠিন হইবে না।

রহিম খোঁড়া বলিল—মা কালী এমন বলি অনেকদিন পাননি, খুব খুশি হবেন।

শ্রীচরণ বলিল—কিন্তু ঠাকুরকে ওখানে নেবার উপায় কি? সে যেতে চাইবে কেন?

সে একটা সমস্যা বটে! কিন্তু তাহার সমাধানেও বিশেষ সময় লাগিল না। সকলেই শশাঙ্কর সহিত বাদলির প্রণয়ের ব্যাপারটা জানিত। কানু ঘোষ বলিল—বাদলির নাম ক'রে ঠাকুরকে খবর দিলেই চলবে যে, কাল সন্ধ্যায় ওখানে দেখা ক'রো।

সকলে কানুর বুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া গেল।

শ্রীচরণ বলিল—বাবা, কানু না হ'লে এমন বৃন্দাবনী লীলা আর কারো মাথায় আসে!

রহিম বলিল—পালাও ভাই পালাও, এখুনি কানুর হাসি শুরু হবে।

কিন্তু এমন হাসির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কানুর আজ হাসি পাইল না। তখন সকলে পরামর্শকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কথাটা শশাঙ্কর কানে পৌঁছিবার আগেই বাদলির কানে পৌঁছিল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার জন্য একটা নরহত্যা ঘটিবে! সে স্থির করিল

যেমন করিয়া হোক—ইহা বন্ধ করিতে হইবে। শশাঙ্ক ঠাকুরের প্রতি সে কিছুমাত্র অনুকূল নয়—বরঞ্চ তাহাকে প্রতিকূল বলাই চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শশাঙ্ক যে নিহত হইবে তাহা সে কখনোই ইচ্ছা করে না। সে এই নৃশংস ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দিবে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সে শশাঙ্ক ঠাকুরের সহিত দেখা করিল। বাদলি বলিল—ঠাকুর, আমাকে একখানা শাড়ি কিনে দাও!

শশাঙ্ক এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে কান-এঁটো-করা হাসি হাসিয়া বলিল—বাদলি, আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

বাদলি বলিল—সে কথা পরে হবে। এখন দেবে কিনা শুনি।

শশাঙ্ক বলিল—এ আর বলতে! আমি এখনই মৌখিরার হাটে রওনা হচ্ছি। কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে। কাল সকালের আগে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারবো না।

বাদলি বলিল—তা হ'লেই হবে। এই বলিয়া সে বিদায় লইতেছিল। এমন সময়ে শশাঙ্ক তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল—কিন্তু কাল সন্ধ্যায় তো তুমি আমাকে ব'লে পাঠিয়েছিলে আজ সন্ধ্যায় কালীবাড়ির মাঠে তোমার সঙ্গে দেখা করতে, জরুরি কথা বল্‌বে?

বাদলি বলিল—সে খুব জরুরি কথাই বটে, কিন্তু—এই বলিয়া একটু মুচকি হাসিল, বলিল—কিন্তু শাড়ি না পেলে বলছি না।

শশাঙ্ক ঠাকুরের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আর বাদলিকে ধরিয়া রাখিল না, বলিল—আমি এখনই হাটে রওনা হচ্ছি, কাল ভোরেই শাড়ি পাবে।

শশাঙ্ক মৌখিরার হাটে রওনা হইয়া গেল—তাহার সম্ভাবিত আততায়ীর দল তাহা জানিতে পারিল না।

সন্ধ্যা হইবামাত্র বাদলি একাকী কালীবাড়ির মাঠে গিয়া পৌঁছিল। বুদ্ধি সে আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মাঠে অনেকগুলি কলাগাছ ছিল। একটি কলাগাছের উপরে একখানি সাদা কাপড় জড়াইয়া দিল, অন্ধকারের মধ্যে তখন সেটাকে শ্বেতবস্ত্রপরিহিত একটা মানুষের মতই দেখিতে হইল।

তারপরে সে অদূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে সে দেখিতে পাইল জনকয়েক মানুষ সেদিকে আসিতেছে। বাদলি দেখিল—তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। সে যেমন কল্পনা করিয়াছিল, ঘটনা তেমনি গড়াইতে থাকিল। সে দেখিতে লাগিল যে, গোটা-দুই মনুষ্যমূর্তি পা টিপিয়া টিপিয়া সেই কলাগাছটার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরমুহূর্তেই তাহাদের হাতের লাঠির আঘাতে কলাগাছটি মচ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। লোক দুটা বিভ্রান্ত হইল, এমন সময়ে তাহাদের কানে একটা খিল খিল হাসির শব্দ প্রবেশ করিল। এই হাসির শব্দে তাহারা আরো বিভ্রান্ত হইল, এবং মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরমুহূর্তেই হাতের লাঠি ফেলিয়া দৌড় মারিল। বাদলি দেখিল, সেই ধাবমান লোক দুটিকে অনুসরণ করিয়া বাকি লোকগুলিও ছুটিল। তখন বাদাল গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছিল—এইবারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল। আষাঢ়ের মালতীলতা যেমন ফুলের ভারে নুইয়া পড়ে, হাসির ভারে তেমনি সে বসিয়া পড়িল। কিন্তু হাসির বেগ থামিতে না থামিতে—এ কি? আষাঢ়ের মালতীলতা বাতাসে দুলিয়া উঠিতেই ফুলে পল্লবে সঞ্চিত বৃষ্টির জল যেমন ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে থাকিল। হাসির ভারে সে বসিয়া পড়িয়াছিল, এবারে চোখের জলের ভারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সে কাঁদিল, কিন্তু কান্নার কারণ বুঝিতে পারিল না। কেন সে কাঁদিল? নারীর মনের কথা কে বুঝিবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বুঝিতে অক্ষম। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিবাহ করেন নাই, মহাদেব বিবাহ করিয়াও সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আর কৌতূহলী বিষ্ণুকে নারীর মনের কথা বুঝিবার আশায় মোহিনী মূর্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল! বুঝি বাদলির মাতৃহীন শৈশবের কথা মনে পড়িল, বুঝি প্রণয়হীন কৈশোরের কথা মনে পড়িল, বুঝি ভর্তৃহীন আসন্ন যৌবনের কথা মনে পড়িল, বুঝি শশাঙ্ক ঠাকুরের কথা মনে

পড়িয়া তাহার বিষম রাগ হইল। কান্না শেষ করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথার উপরে রজনী তখন ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে নিষুপ্তির নিস্তব্ধতা। তাহার বড় ভয় করিল, সে দ্রুত গ্রামাভিমুখে রওনা হইল।

পরদিন শশাঙ্ক ঠাকুর শাড়ি হস্তে তাহার কুটিরে পৌঁছিলে বাদলি তাহাকে বকিয়া তাড়াইয়া দিল, বলিল, কেন সে শাড়ি আনিয়াছে? কে তাহাকে আনিতে বলিয়াছিল?

শশাঙ্ক ঠাকুর বিস্মিত হইয়া পূর্বদিনের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে বাদলি বলিল—ঠাকুর, তুমি গাঁজা খাও জানতাম, গুলী খাওয়াও ধরেছ নাকি? এক্ষুনি পালাও এখান থেকে!

বিস্মিত শশাঙ্ক সরিয়া পড়িল। সে ভাবিল শাড়িখানা কিছু চড়া দামে অপর কাহাকেও বেচিয়া দিবে। লাভের আশায় তাহার প্রণয়-নিষ্ফলতা একটা নূতন সান্ত্বনা পাইল। শশাঙ্ক ঠাকুর প্রণয়ী বটে, কিন্তু ব্যবসায়ী ততোধিক।

শশাঙ্ক চলিয়া গেলে মোতির মা আসিয়া বাদলিকে বলিল—শাড়িখানা নিলেই পারতিস, ভালো জিনিস। সে অন্তরাল হইতে সবই দেখিয়াছে, সবই শুনিয়াছে।

বাদলি রাগিয়া বলিল—তুমি নাওগে যাও।

মোতির মা বলিল—ওসব আমরাও জানি রে বাদলি, দিনের বেলা যাকে ফিরিয়ে দিলি, রাতে তাকেই দরজা খুলে দিবি।

বাদলি তাহার কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মোতির মা নিজের মনেই বলিতে লাগিল—সব বুঝি রে, সব বুঝি। ওই বয়স আমাদেরো ছিল।

মোতির মা-দের নিশ্চিত বিশ্বাস, সংসারের সমস্ত রহস্যই তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

সশস্ত্র শান্তির উদ্যোগপর্ব যখন চলিতেছে তখন হঠাৎ একদিন দাঙ্গার কারণ ঘটিয়া গেল। বারুদের স্তূপের উপরে গৃহ নির্মাণ করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। একদিন সকালবেলা হঠাৎ রটিয়া গেল, কে রটাইল কেহ নিশ্চয় করিয়া জানে না, জানিবার চেষ্টাও কেহ করিল না, রটিয়া গেল যে, দশানির পেয়াদারা শ্রীচরণ রজককে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া দেউড়িতে তুলিয়াছে এবং নাকি জুতাপেটা করিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সন্দেহবাচক 'নাকি' শব্দটা ঝড়ের মুখে চালাঘরের মতো উড়িয়া গেল। দশানির পেয়াদার হাতে শ্রীচরণের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দর্শকের বর্ণনার অভাব হইল না। শ্রীচরণকে জুতাপেটা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন সব সাক্ষী জুটিয়া গেল। তাহারা একবাক্যে বলিল যে, তাহারা এখনি দেখিয়া আসিয়াছে যে, পাঁচজন পেয়াদা মিলিয়া নাগরা জুতা মারিতে মারিতে শ্রীচরণকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। একজন বলিল—শ্রীচরণ এখনো জীবিত আছে। অপর জন বলিল—কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকিবে না, কারণ তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। তৃতীয় আর একজন বলিল যে, শ্রীচরণ বাবাগো, মাগো বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে। চতুর্থ প্রত্যক্ষদর্শী বলিল যে, শ্রীচরণ কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—ওগো, তোমরা কেউ গিয়ে ছ'আনির বাবুকে খবর দাও, আমি তাঁর নুন খেয়ে মানুষ। খবর পেলে এখনি তিনি পেয়াদা পাঠিয়ে এই মেড়ো ভূতগুলোকে শিক্ষা দেবেন। পঞ্চম সাক্ষী বলিল—আমি সেই কথা শুনেই ভাই খবর দেবার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

তাহার এই অসমীচীন বাক্যে পূর্বোক্ত সাক্ষীদের একজন বলিল—তুই আবার কোত্থেকে এলি, তুই তো বাজারে গিয়েছিলি দুধ বেচতে। আমিই তো সকলের আগে এসে খবর দিলাম।

সে ব্যক্তি বলিল—ওই একই কথা হ'ল। শ্রীচরণের কথাটা শুনে বাজারে গিয়েছিলাম হাতের দুধটা বেচতে। হাত খালি হ'লে তবে তো লাঠি ধরতে পারবো।

তাহার কথায় দু'তিন জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—তা'হলেই হয়েছে! তুমি লাঠি ধরবে, আর সেই লাঠি দিয়ে শ্রীচরণকে উদ্ধার ক'রে আনা হবে। তা হ'লেই হয়েছে!

একজন বলিল—তুই গোরু চরাগে! তোর লাঠিতে তার বেশি আর কি হবে?

তখন প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়া উঠিল এবং কলহের রন্ধ্র দিয়া প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার অসামঞ্জস্য বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনতার একজন বলিল—ওসব বাজে কথা এখন থাক্। চলো সবাই মিলে শ্রীচরণকে উদ্ধার ক'রে আনি।

উপস্থিত সকলে উৎসাহের সহিত স্বীকার করিল বর্তমানে তাহাই একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু সরাসরি দশানির বাড়িতে না গিয়া ছ'আনির বাড়িতে যাওয়াই উচিত বলিয়া স্থির হইল। সকলে ছ'আনির বাড়িতে ছুটিল।

নবীননারায়ণ জনতার কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া জনতা কখনো রোষে, কখনো ক্ষোভে, কখনো কাঁদিয়া, কখনো হাসিয়া মানে অভিমানে মিশাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। নবীননারায়ণ সমস্ত শুনিয়া বলিল—তাহ'লে এখনি গিয়া শ্রীচরণকে উদ্ধার ক'রে আনতে হয়।

জনতা উল্লাস প্রকাশ করিয়া তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিল।

নবীন নইমুদ্দিকে ডাকিয়া হুকুম করিল—এখনি তুমি যাও, শ্রীচরণকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসো।

নইমুদ্দি বলিল—হুজুর, ওদের লাঠিয়াল আছে। খুন-জখম হ'তে পারে। তারপরে সে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—খুন-জখমকে আমি যে ভয় করি তা নয়, তবে হুকুমটা চাই।

নবীন বলিল—খুন-জখমের দায়িত্ব আমার।

নইমুদ্দি নবীনের হুকুম পাইয়া শুধু একবার সেলাম করিল। তখন নবীন নইমুদ্দিকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—কিন্তু খবরদার. কীর্তিবাবুর গায়ে যেন হাত দিয়ে না। তার কিছু হ'লে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

তারপরে অনেকটা যেন নিজ মনেই অথচ নইমুদ্দির কর্ণগোচর স্বরে বলিল—খবরদার! কীর্তিবাবু খুড়িমার একমাত্র সন্তান। আমি তাঁর চোখে জল দেখেছি—পাল্কির প্রচ্ছন্ন আলোর মধ্যে। তার গায়ে যেন হাত দিয়ো না।

নইমুদ্দি আর একবার সেলাম করিয়া সরিয়া আসিল।

তখন নইমুদ্দি সর্দার মালকোঁচা মারিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া লাঠি হাতে করিয়া কাছারির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁক ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে ছ'আনির লাঠিয়ালগণ আসিয়া সমবেত হইল।

প্রথমেই সোনা সর্দার আসিল, স্বরূপের মৃত্যুতে তাহার বুকে এখনো শেল বিঁধিয়া আছে, তাহার হাতে স্বরূপের লাঠি। নাদুস-গোপাল আসিল, এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে শড়কি, তাহার প্রোজ্জ্বল ভুঁড়ি দাঙ্গার উল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গিত হইতেছে। নালু কালু দুইভাই ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির হইল—যমজ ভাই, হঠাৎ একজন হইতে অপরজনকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায় না। বৃদ্ধ কেদার সর্দার আসিল।

আর আসিল ছ'আনির অনুরক্ত প্রজার দল। উজির আসিল, কালু আসিল, রহিম খোঁড়া আসিল, একটা মুগুর হাতে করিয়া কানু গোয়ালা আসিল। একজন বলিল—কানু, তোর হাতে ওটা কি? গিরি-গোবর্ধন নাকি? কানু তখনি হাতের মুগুর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে ছুটিল। সে পালাইল।

আর একজন বলিল—কানু এবার শিশুপাল বধ করবে।

আর একজন কে বলিল—শিশুপাল নয় রে, পূতনা রাক্ষসী।

কানু কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবে? সে তখন সকলকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়া হাসিতে লাগিল এবং নিজের বুকে ক্রমাগত চড়-চাপড় খাইতে লাগিল!

বিজয় বৈরাগী তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, কানুর অবস্থা দেখিয়া বলিল—বাবা কানু, অমন ক'রে বৃথা ম'রে লাভ কি! তারচেয়ে দশানির লেঠেল চেপে মরিস! ঘটোৎকচ-বধের বৃত্তান্ত জানিস তো!

কানু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—তবে রে বেটা বৈরাগী ! দাঁড়া আজ বকাসুর বধ করবো।

বিজয় ছুটিল, পিছে পিছে কানুও ছুটিল।

এদিকে নইমুদ্দি সর্দার সমবেত লাঠিয়ালগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই সব, আল্লা বলো, কালী বলো, হরি বলো। আজ বড় সুদিন ! আজ মনিবের নুনের শোধ দিতে হবে।

নইমুদ্দি বলিতে লাগিল—কারো একবিন্দু নুন যদি খেয়ে থাকো—তবু তা শোধ করতে হয়। আর মনিবের নুন কত পুরুষ ধ'রে সবংশে খাচ্ছি—সাতপুরুষ ধ'রে—মরলেও যে তার ঋণ শোধ হয় না ! আজ আল্লার কৃপায়, কালীর কৃপায় নুন শোধের বড় সুযোগ এসেছে ! আমরা মুখ্খু মানুষ। তবু এই মোটা কথাই বুঝি।

এই বলিয়া সে হুঙ্কার ছাড়িয়া লাঠি লইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্তেই বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে পাক খাইতে শুরু করিল। তাহার পিছনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিচিত্র অস্ত্রধারী সেই জনতাও পাক খাইতে লাগিল। সকলে নীরব, সমস্ত নিস্তব্ধ। জনতার নীরবতা অতিশয় ভয়ঙ্কর—যেন অজগরের শিকারকালীন নিস্তব্ধতা। কুণ্ডলিত অজগরের মতো সেই নীরব জনতা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ এক সময়ে সরল রেখায় পরিণত হইয়া যেমন শিকারের উদ্দেশে ঝম্প প্রদান করে—কুণ্ডলিত সেই জনতাও তেমনি হঠাৎ সোজা হইয়া সর্দারকে অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত হইল। নইমুদ্দিকে অনুসরণ করিয়া জনতা মুহুর্মুহু ডাক ভাঙিতে লাগিল। সেই শব্দে গ্রামে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল, সেই শব্দে কৌতূহলী গৃহস্থও দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

সকলে চলিয়া গেলে শ্রীচরণ রজক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দশানির একজন লাঠিয়ালের সঙ্গে সকালবেলায় মাঠের দিকে গিয়াছিল। ঘটনার কিছুই জানিত না। এখন আসিয়া শুনিল যে ছ'আনির একজন প্রজাকে দশানির দেউড়িতে তুলিয়া মারিতেছে। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য

ছ'আনির লাঠিয়াল গিয়াছে। নিজের বিলম্বের জন্য ধিক্কার অনুভব করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্পে সেও ছুটিল।

শ্রীচরণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচরণ চলিল!

এইভাবেই ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসের কুটিল গতি যাহারা জানে তাহারা বিস্মিত হইবে না। কল্পনা, গুজব, কিংবদন্তী, রূপকথা, মৌতাত, জাতীয় দম্ভ, বেদ, বারুদ, রক্ত, অদৃষ্টের ফাঁস, নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি, অহমিকা—একত্র মিশ্রিত হইয়া মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই হইলে স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখিত হইয়া স্থূলাকার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া নগদ চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইলে—তাহাকেই ইতিহাস বলে। সেই ইতিহাসই নাকি জাতির ভাগ্যের নিয়ামক!

যে-জাতির ইতিহাস নাই, সেই জাতিই সুখী।

৬

এদিকে দশানির বাড়িতে সংবাদ পৌঁছিল যে, ছ'আনির লোকে বাড়ি লুটিতে আসিতেছে, অমনি দশানির লোকজন আসিয়া সশব্দে দেউড়ি বন্ধ করিয়া দিল। অতিরিক্ত দুটা অর্গল তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছিল, সে দুটাও লাগানো হইল। হরু সেখ দশানির একজন প্রধান প্রজা। সে লাঠিয়াল নয়, কিন্তু সামরিক বিভাগভুক্ত না হইলেও সকলের উপরে একপ্রকার সর্দারি সে করিত। সবাই জানিত, বাবুর হুকুম সেইরূপ।

হরু সেখ মালঞ্চির বুড়ো সেখকে বলিল, সেখের বেটা, এ দেউড়ি ভাঙা ছ'আনির ব্যাঙাচিদের কর্ম নয়, কাজেই এখানে আর থাকবার দরকার দেখিনে, তার চেয়ে চলো সকলে গিয়ে তোষাখানা রক্ষা করিগে, যদি বেটারা দেউড়ি খুলতে না পেরে অন্য কোনো দিকের প্রাচীর ডিঙিয়ে ঢোকে। ওদের লক্ষ্য নিশ্চয় তোষাখানার উপরই হবে।

তারপরে গলার স্বর খাটো করিয়া বলিল—সম্প্রতি পরগনা থেকে অনেক টাকা এসেছে—তাছাড়া বাবুদের যা কিছু সোনারুপোর জিনিস সব তো ওখানেই।

মালঞ্চির সেখ বলিল—পরামাণিক, তোমার কথাই ঠিক। এখানে আর থাকবার দরকার দেখিনে। চলো ওদিকেই যাই।

তখন তাহার হুকুমে সকলে তোষাখানার আঙিনার দিকে চলিল।

এখানে দশানির বাড়ির ভূগোল একটু জানা আবশ্যক।

দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিলেই বড় একটি আঙিনায় পৌছানো যায়। সম্মুখেই উত্তর দিকে কাছারির দালান। পূর্বদিকে বড় একটি পুষ্করিণী। দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দেউড়ির পাশে আর একটা লম্বা একতলা দালান, আমলা, গোমস্তা ও পাইক পেয়াদার থাকিবার স্থান, আর পশ্চিম দিকে দোতালা বৈঠকখানা-বাড়ি। বৈঠকখানার পাশ দিয়া আর একটি আঙিনায় ঢুকিতে পারা যায়। এ আঙিনাটাও প্রশস্ত। এই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে সুবৃহৎ মণ্ডপের দালান, পশ্চিম দিকে তেতালা আর একটি দালান। নীচের তালাতে কাছারির কাগজপত্র থাকে—এটি দপ্তরখানা নামে পরিচিত। দোতালাকেই তোষাখানা বলা হয়। এখানে টাকাকড়ি ও সোনারুপার জিনিসপত্র সঞ্চিত। পুবদিকে বৈঠকখানা-বাড়ি—দুই আঙিনায় তাহার দুই মুখ। আর আঙিনার উত্তর দিকে একটি পাকা দালান, উৎসবাদি উপলক্ষ্যে সেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারাদি করিয়া থাকেন। তোষাখানা ও মণ্ডপের মাঝখান দিয়া সরু একটি পথ আছে—সেই পথে অন্তঃপুরের আঙিনায় ঢুকিতে পারা যায়। আপাতত আমাদের বহির্বাটীর ভূগোলে মাত্র প্রয়োজন।

হরু সেখ ও মালঞ্চির সেখ লাঠিয়াল এবং বিশ্বস্ত প্রজাদের লইয়া আসিয়া তোষাখানার নীচের তলায় সমবেত হইল।

হরু বলিল—সেখের বেটা, লাঠিই বলো আর বন্দুকই বলো, আসল জোর হাতে নয়, আসল জোর বুকের পাটায়!

পঞ্চু সেখের একটিমাত্র হাত। সে বলিল—আমি তো সেই কথাটাই এতদিনেও বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। আমার দেখো একখানা মাত্র হাত, কিন্তু আমি কোন্ শালা দুইহাতওয়ালার চেয়ে কম!

হক্ক হাসিয়া বলিল—আমার কথা তোমরা বুঝতে পারোনি। আসল কথা কি জানো - আসল কথা হচ্ছে এই—

এই বলিয়া ট্যাঁক হইতে ছোট্ট একটি গাঁজার কল্কে বাহির করিল।

এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল—হাঁ, পরামাণিকের কথাই ঠিক!

হক্ক সেখ ত্বরিতে কল্কে সাজিয়া 'যায়-প্রাণ-থাকে-মান' করিয়া টান মারিল। আচ্ছা করিয়া টান মারিয়া কল্কেটা মালঞ্চির সেখের হাতে দিল। সে টান দিয়া পরবর্তীর হাতে দিল—এমনিভাবে কল্কে হস্তান্তর হইতে হইতে বহুদূরবর্তী হাতে গিয়া পৌঁছিল। কল্কে প্রভাবে সকলের ভাব ও ভাষার পরিবর্তন ঘটিল।

হক বলিল—দেখি ব্যাঙাচি ক'টা দেউড়ি খোলে কিভাবে। বাবা! ও দেউড়ি কি আজকালকার চেলা কাঠে তৈরি? যে শালকাঠ দিয়ে তৈরী, বন্যায় ভেসে এসে লেগেছিল এই ঘাটে। পঞ্চাশজন লোক লাগিয়ে বাবুরা তুলেছিল টেনে! তাই দিয়ে ও দেউড়ি তৈরি। এসব শুনেছি আমার বড় বাপের কাছে। ওই দেউড়ি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে আজ দু'শ বছর! কত ঝড়-ঝাপটা, কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা—একটা দাগও পড়েনি। ও হচ্ছে গিয়ে বুড়ো রোস্তমের বুকের পাটা!

পঞ্চু সেখ বলিল—আরে দেউড়ি না খুললে, আমি নইমুদ্দিন বুড়োর তরমুজি মাথাটা ফাটাবো কেমন ক'রে? সেদিন সকালবেলাতেই আমার সঙ্গে দেখা। দেখেই বেটা মুখ ফেরালো। বলে কিনা, ঠুঁঠোর মুখ দেখে উঠলাম—আজ দিনটা কেমন যাবে কে জানে। বেটা টেরা-চোখো দুশমন! সেইদিন তাই প্রতিজ্ঞা করেছি—ওর টেরা চোখ দুটো উপড়ে ফেলবো, ওর দাড়ি ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবো—আর আমার এই একহাতি লাঠির গায়ে ওর মুণ্ডুটাকে তরমুজের মতো ফাটাবো—ফটাস্—

তাহার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

তেওয়ারি বলিল—ওরা কতজন?

যদুমল্ল বলিল—তবেই হয়েছে তেওয়ারি! আগেই তুমি ভয় পেলে?

তেওয়ারি বলিল—ভয় পাবো কেন? তবু কত লোক জানলে বন্দোবস্ত করা যেতো।

রামভুজ তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল—সে কথা তো ঠিক। কতজন না জানলে কয়েদখানায় ধরবে কিনা কেমন ক'রে জানবো?

মার্লঙ্কর সেখ বলিল—কয়েদ আবার কি? একি কোম্পানির বিচার নাকি? সবক'টার মাথা নিতে হবে। কেউ যেন ফিরে গিয়ে ছোটবাবুকে না জানাতে পারে যে হুজুর, ও বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

দুর্গাদাস সদর নায়েব। কলমের ঘায়ে সে বেচারী সত্যকে চোখের জলে নাকের জলে করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু লাঠিসোটাকে তাহার বড় ভয়। সে ভাবিয়াছিল, দুই পক্ষে উদ্যোগপর্ব পর্যন্তই চলিবে—ততোধিক অগ্রসর হইবে না। কিন্তু এখন সত্যসত্যই লাঠালাঠির সূচনা দেখিয়া নিতান্ত ভীত চিত্তে কাছারির মধ্যে বসিয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিত, কাছারিতে কেহ আসিবে না, কারণ শুষ্ক কাগজপত্রের উপরে এক অগ্নি ছাড়া আর কাহারো লোভ নাই। তাহা ছাড়া, কাছারিতে অনেকগুলো কাঠের বড় বড় বাক্স ছিল, তাহাদের একটাকে সে খালি করিয়া রাখিয়াছিল, বেগতিক দেখিলে সেটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিবে এই ছিল মতলব। অন্যান্য কর্মচারীরা আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল—তাহার সে উপায় ছিল না, একে সদর নায়েব, তার উপরে সে বিদেশী লোক, গাঁয়ের মধ্যে এখন বাহির হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়—কি জানি, যদি দৈবাৎ ছ'আনির লোকজনের সম্মুখেই পড়িয়া যায়।

তোষাখানার আঙিনায় আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কীর্তিনারায়ণ ভিতর-বাড়ি হইতে বাহিরে আসিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

কীর্তি শুধাইল, ব্যাপার কি? হরু সেখ বলিল—হুজুর, ব্যাঙাচিগুলো নাকি বাড়ি লুঠতে আসছে?

কীর্তি এ সমস্তর কিছুই জানিত না। সে শুধাইল—হঠাৎ?

যদুমল্ল বলিল—হঠাৎ আবার কি হুজুর! 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরণের তরে'—তাই আর কি!

কীর্তি বলিল—সর্দার, তোমরা প্রস্তুত তো?

সর্দারের উত্তর দিবার অবসর হইল না, এমন সময়ে রব উঠিল, দেউড়ি ভাঙিয়াছে, কেহ বলিল—দেউড়ি খুলিয়াছে! কেহ বলিল—তাও কি সম্ভব?

কাছারির আঙিনায় বিষম কলরব শোনা গেল। ফল কথা, দেউড়ি ভাঙিয়াই থাকুক, আর খুলিয়াই থাকুক, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ছ'আনির লোক বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে।

তখন দশানি পক্ষে 'সাজ সাজ, ধর ধর, লাঠি কই, বন্দুক কই, আমার বল্লমখানা কোথায় গেল' প্রভৃতি রব পড়িয়া গেল! হরু সেখ দূরবর্তী মৌতাতীর হাত হইতে চট্ করিয়া কল্কেটা লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। কাছারিতে দুর্গাদাস শূন্য বাক্সটার নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। তোষাখানার আঙিনায় তখন লাঠিতে ঠকাঠক আওয়াজ উঠিয়াছে।

৭

ছ'আনির লোকজন দশানির দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ। একসঙ্গে অনেকগুলি মুগুর. হাতুড়ি, বাঁশ, কাঠ যে যাহা পারিল দেউড়ির কপাটে ঠুকিতে লাগিল। দেউড়ি অটল। হরু সেখ যাহা বলিয়াছিল, নিতান্ত মিথ্যা নয়। যেমন শক্ত কাঠ, তেমনি কারিগরি। নীল রং করা শাল কাঠ বহুকালের স্পর্শে একপ্রকার কঠিন আভিজাত্য লাভ করিয়াছে, এত আঘাতেও কিছুমাত্র টলিল না। অনেকক্ষণ আঘাত করিবার পরে সকলে ক্লান্ত হইয়া থামিল।

দেউড়ির দুই-মানুষ-উঁচু কঠিন কাঠের পাল্লার উপরে নিপুণ কারিগরিতে একজোড়া ময়ূর খোদিত, তাহারা স্ফীত বক্ষে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। দু'দিকের দেয়ালে কিম্ভূত দুইটা কিন্নর পাথরে পাখা ঝাপটিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার নীচে একটি গন্ধর্ব তন্ময় হইয়া

বাঁশরী বাজাইতেছে। বেচারীর নিম্নাঙ্গ অনেকদিন হইল খসিয়া পড়িয়াছে—তবু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; নিজের তানে সে নিজেই মুগ্ধ। দু'দিকের দেয়ালে কতকালের কত বর্ষা নীলাভ শেওলায় শ্যামল ইতিহাস রচনা করিয়াছে। দেয়ালের স্থানে স্থানে ফাটলের সূক্ষ্ম চিহ্ন, তাহাতে সবুজ শাদ্বলের আভা, দু'চারটা গুল্ম অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতির স্পর্শ না পাইলে মানুষের শিল্প কৌলীন্য লাভ করে না। কে একজন কাঁচা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে 'হরি', র-এর শূন্যটা নিরিখ করিয়া দেখিলে তবে চোখে পড়ে। দেয়ালে ফাটল ধরিয়া কালের চিহ্ন পড়িয়াছে কিন্তু কাঠের দরজায় কাল দংষ্ট্রা বসাইতে সক্ষম হয় নাই। এতগুলা আঘাত—তবু কি একটাও চিহ্ন পড়িল?

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ছ'আনির যোদ্ধার দল আবার আঘাত শুরু করিল। এক একবার সমস্ত দরজাটা কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু খুলিবার নাম করে না। দুর্যোধনের বুকের ছাতির মতো দম্ভী দ্বার অচল, অটল। এবারে ছ'আনির লোকেরা বাহুবলের সঙ্গে বাক্যবল যোগ করিল। 'খোল্ খোল্, ভাঙ ভাঙ' রব উঠিল। কেহ মালঞ্চির সেখকে স্পর্ধা করিয়া ডাকিল, কেহ যদুমল্লকে, কেহ পঞ্চু সেখকে; কেবল নইমুদ্দি সর্দার কোনো কথা বলিল না, কিংবা দরজাতে আঘাত করিল না।

তখন কে একজন বলিল—ভাই সহজ উপায়টাই মনে পড়েনি। এক কাজ করো, কোনো রকমে একবার কানুকে হাসিয়ে দাও, ওর হাসির দাপটে দরজা খুলে যাবে।

ইহা শুনিয়া আর একজন বলিল—সাচ্চা কথা! অনেক দরজা আছে যা আঘাতে খোলে না, হাসিতে খোলে।

কিন্তু কানুকে আর চেষ্টা করিয়া হাসাইতে হইল না। তাহাকে হাসাইয়া দিয়া দরজা খুলিবার অদ্ভুত প্রস্তাবে সে হোঃ হোঃ হীঃ হীঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্যান্য সকলকে হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে হাসির তোড় সামলাইতে না পারিয়া দেউড়ির দরজার উপরে গিয়া পড়িয়া কিল চড় লাথি ঘুষি যাহা হাতে ও পায়ে আসিল তাহাই মারিতে লাগিল এবং

অনতিকালের মধ্যে, বেশ বুঝিতে পারিতেছি বলিলে কথাটা কেহ বিশ্বাস করিবে না, দরজার কাটা পাল্লা খুলিয়া গেল। প্রাচীনকালের দেউড়ির দরজার একটা অংশ কাটিয়া ছোট একটা দরজার মতো করা হইত। রাত্রিবেলা সমস্ত দরজা খুলিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। অসময়ে কেহ আসিয়া পড়িলে তাহাকে এই ক্ষুদ্র দ্বারটি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করানো হইত। হঠাৎ কাটা পাল্লা খুলিয়া গেলে সবাই অবাক্ হইল—বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি অবাক্ হইল কানু নিজে। সে কখনো ভাবিতে পারে নাই তাহার হাসির এমন অর্গল-মোচন-ক্ষমতা।

কিন্তু ভিতরে এ কে?

শ্রীচরণ রজক না? তাহাকে ভিতরে দেখিয়া কাহারো আর অবিশ্বাস রহিল না যে, সত্য সত্যই তাহাকে দেউড়িতে তুলিয়া প্রহার করা হইয়াছে। কেহ শুধাইল, কি চরণ, খুব লেগেছে নাকি? কেহ বলিল—আহা বেঁচে যে গিয়েছিস্ এই যথেষ্ট; কেহ বলিল—চল্ এবার বেটাদের শিক্ষা দিয়ে আসি। এই বলিয়া সকলে শূন্য কাছারির আঙিনা পরিত্যাগ করিয়া বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো তোষাখানার আঙিনার দিকে ছুটিল এবং অনতিকাল মধ্যে দুইপক্ষের লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠিল। সে শব্দ আমরা আগেই শুনিয়াছি।

এবারে শ্রীচরণ রজকের দশানির বাড়িতে প্রবেশের ও দেউড়ি খুলিবার রহস্য পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি যে, শ্রীচরণ কিছু পরে রওনা হইয়াছিল। পথের মধ্যে একজনের সাক্ষাৎ পাইয়া শুধাইল, দলবল কতদূর? সে লোকটা বলিল যে, সবাই গিয়া দেউড়ি ভাঙিতে চেষ্টা করিতেছে। শ্রীচরণ জানিত দেউড়ি ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব নহে। তাই সে দরজা খুলিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সে জানিত কাছারির পিছন দিকের প্রাচীরের পাশে একটা বেলগাছ আছে। সে দেউড়ির দিকে না গিয়া খানিকটা ঘুরিয়া সেই বেলগাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। বেলগাছে উঠিল। বেলগাছ হইতে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া দেখিল আঙিনায় একটিও জনপ্রাণী নাই। তখন সে প্রাচীর হইতে নামিয়া এক দৌড়ে দেউড়ির কাছে গেল। কিন্তু সে ভৈম

দেউড়ি একজনের পক্ষে খোলা অসম্ভব। দেউড়ি খুলিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া সে ছোট্ট কাটা পাল্লাটি খুলিয়া দিল। জনতা সেই পথে অনায়াসে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। সবাই যখন তাহাকে শুধাইল লাগিয়াছে কিনা, প্রশ্নটাকে সে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে নাই, যেহেতু বেলগাছে উঠিতে এবং দেয়াল হইতে লাফাইয়া নামিতে অল্পস্বল্প আঘাত পাইয়াছিল বটে।

৮

তোষাখানার আঙিনায় দুই দলে বিষম লাঠালাঠি বাধিয়া গেল। মুহূর্তকাল মধ্যে শত্রুমিত্র মিশিয়া গেল, এক হইতে অপরকে চিনিবার উপায় থাকিল না। কেবল লাঠির শব্দ আর হুঙ্কার। যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের গর্জনের সহিত মিশিয়া কাঁচের শার্সিতে শিলাপাতের শব্দ উঠিতেছে। কেহ বল্লমের খোঁচা খাইল, কাহারো মাথায় লাঠি পড়িয়া আহত হইল, তাহার দুই চোখে রক্তের কুয়াশা, এক হাতে রক্ত মুছিতে না মুছিতে আর একটা প্রবলতর আঘাত আসিয়া পড়ে। অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে দুইপক্ষের শতাধিক লোক—ভিড় এমন নিবিড় যে, বিবেচনা করিয়া লাঠি চালানো সম্ভব নহে। ফলে নিজপক্ষের লাঠির ঘায়ে অনেকে বসিয়া পড়িল, অনেকে পালাইল। যদুমল্ল সকলের চেয়ে লম্বা, সব লাঠিই তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, নাদুসগোপাল সবচেয়ে বেঁটে—তাহার মাথা সহজেই বাঁচিয়া যায়। শ্রীচরণ রজক তাহার জাত-ব্যবসায়ের টেকনিকে একটা রোগা লোককে কাপড় কাচিবার ভঙ্গীতে পা ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। আর কানু ঘোষ দুইখানি মুগুর ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া গাবুর সে কি হাসি। সে বলিল—ও ভাই কানু, এ তো লাঠালাঠি নয়—এযে যাত্রার পালা। তুই বেড়ে ভীম সেজেছিস! শ্রীমন্ত অধিকারীর দলে গিয়ে ভর্তি হ'। মিছেমিছি দেড়সের দুধে তিনসের জল মিশিয়ে ধর্ম নষ্ট করিসনে।

গাবুর কথা কানুর কানে প্রবেশ করা মাত্র তাহার হাসির তড়কা উপস্থিত হইল। সে মুগুর ফেলিয়া দিয়া নাদুসগোপালের নধর ভুঁড়িতে বাপান্ত প্রাণান্ত

বলে এক ঘুষি মারিল। নাদুসগোপাল ওজনে ভারী, সে ধরাশায়ী হইল না বটে, কিন্তু কাবু হইল, বলিল—একি ভাই, আমি যে ছ'আনির লোক। গাবু বলিল, তাতে কি হয়েছে, ঘটোৎকচ মারবার সময়ে কুরু পাণ্ডব বিচার ক'রে চাপা দিয়েছিল ?

তোষাখানার সিঁড়ির গোড়ায় মালঙ্কির সেখ ও নইমুদ্দি সর্দারে বিষম লাঠালাঠি বাধিয়া গিয়াছে। দুইজনে দুইপক্ষের সর্দার। তাহাতে আবার সমান শিক্ষিত। কেহ কাহাকেও কাবু করিতে পারিতেছে না, কেবল লাঠি দুটো ঠকাঠক শব্দে বাহবা দিতেছে। সোনা সর্দার তাহার ভ্রাতৃহত্যার জ্বালা ভুলিতে পারে নাই। লড়াইয়ে তাহার মন নাই—সে নিঃশব্দে ভ্রাতৃহন্তাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

ইতিমধ্যে নাদুসগোপাল কানুর ঘুশির চোট সামলাইয়া লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া পায়ের আঙুলের সাহায্যে শড়কি নিক্ষেপ করিতেছে—আর অদূরে দাঁড়াইয়া পঞ্চু শেখ ঢাল দিয়া সেগুলিকে নিরস্ত করিতেছে। যেমন শড়কি-ওয়ালা তেমনি ঢালী। একটা ফস্কাইলেই পঞ্চু সেখ এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া যাইবে—কিছুতেই রক্ষা নাই।

এমন সময়ে কীর্তিনারায়ণ বন্দুক হাতে করিয়া বৈঠকখানার বারান্দায় বাহির হইল। গোলমালে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না, কেবল সোনা সর্দারের চোখ এড়াইল না। সে সবলে ভিড় ঠেলিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—আজ সে ভ্রাতৃহন্তার শিরঃপাত করিয়া প্রতিশোধ লইবে। তাহার হাতে মিলন সর্দারের বহুদাঙ্গাজয়ী লাঠি। কীর্তিনারায়ণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, কিংবা পাইলেও তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না। অতর্কিত কীর্তির মাথা লক্ষ্য করিয়া সোনা যেমনি প্রচণ্ড লাঠি তুলিয়াছে, নইমুদ্দি সর্দার তাহা দেখিয়া ফেলিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, রাখ্‌ রাখ্‌, থাম থাম এবং মুহূর্ত মধ্যে সে ছুটিয়া গিয়া সেই আসন্ন মৃত্যু-ভীম আঘাতের তলে নিজ শির পাতিয়া দিল। কীর্তি বাঁচিল, কিন্তু সেই মারাত্মক আঘাতে নইমুদ্দি অচৈতন্য হইয়া বৈঠকখানার সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। মিলন সর্দারের বহুকালের তৃষ্ণার্ত লাঠি আজ

রক্তের অঞ্জলি পান করিল বটে, কিন্তু কাহার রক্ত বলিতে কাহার রক্ত পান করিল!

সেই আঘাতে সর্দারের বিপর্যয় টেরা চোখ দুটি কোটর হইতে ঠিকরিয়া ছুটিয়া একত্রে পড়িল। তাহাদের এতকালের হেরফের এতকালের পরস্পরকে অনুসন্ধান আজ বুঝি মৃত্যুর পরে মিটিল!

নইমুদ্দির মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া কীর্তিনারায়ণ ভাবিল, বেটার যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে! কীর্তি ভাবিতে লাগিল, বেটা ভাবিয়াছিল নিজে আমার মাথা ফাটাইয়া বাবুর নিকটে বকশিস পাইবে। বেটার উচিত শিক্ষা হইয়াছে—অতিলোভে সব নষ্ট হইল! মানুষে যখন অপরের মনস্তত্ত্ববিশারদ সাজিয়া বসে, তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই করে বটে। যদি কীর্তিনারায়ণ জানিত যে, ওই অশিক্ষিত লাঠিয়ালটা তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইতে গিয়াই নিজে মরিল, যদি কীর্তি জানিত যে নইমুদ্দির কানে নবীনের সেই সতর্কবাণী তখনো ধ্বনিত হইতেছিল—'কীর্তিদাদা খুড়িমার একমাত্র সন্তান! খবরদার, তার গায়ে যেন হাত দিসনে! তা'হলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। খুড়িমার চোখে পাল্কির প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে আমি জল দেখেছি। সাবধান! ভুলিস না।'—এসব কথা জানিতে পারিলে কীর্তি কি ভাবিত? এসব কথা জানিতে পারিলে কীর্তি বিশ্বাস করিত না। কীর্তি ভাবিল, বেটা শিরোপার লোভে প্রাণ হারাইল।

এই ঘটনার পরে শত্রু-মিত্র অস্ত্র সংবরণ করিয়া দাঁড়াইল; কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল তাহাই অনুধাবন করিবার উদ্দেশ্যে। হরু সেখ কীর্তিনারায়ণের কাছে আসিয়া বলিল, হুজুর, একবার ভিতরে যান। আমরা দেখে নিই দুশমনের সাহস কত! হুজুরের উপরে লাঠি তোলে এত বড় আস্পর্ধা।

কীর্তি কি ভাবিল, বলিতে পারি না। সে ভিতরে রওনা হইল। ভিতরে যাইবার আগে সে একবার নইমুদ্দির মৃতদেহের দিকে তাকাইল। যেখানে কিছুক্ষণ আগেও তাহার দুটি চোখ ছিল, এখন সেখানে রক্তিম তরল দুটি জবাফুল ভাসিতেছে—আর ঘৃণা, ব্যঙ্গ, করুণা ও ধিক্কার মিশ্রিত দৃষ্টিতে ঠিকরিয়া-পড়া চক্ষু

দুটি নিষ্পলকভাবে কীর্তিনারায়ণের দিকে চাহিয়া আছে। কীর্তি শিহরিয়া উঠিল। জীবিত মানুষকে সে ভয় করে নাই—কিন্তু মৃতের দৃষ্টিকে সহ্য করিতে পারিল না। জীবিত মানুষ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সে মরিবামাত্র পঞ্চভূতের সামিল হয়—তখন বিশ্বব্যাপী রহস্য অজ্ঞেয় তর্জনী তুলিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে ভয় না করিবে কে? ভীত কীর্তিনারায়ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

তখন আবার দ্বিগুণ বেগে মারামারি শুরু হইল।

দশানির বাড়ির আঙিনায় যখন দুইপক্ষে যায়-প্রাণ-থাকে-মান করিয়া লড়াই চলিতেছিল, জোড়াদীঘির অধিবাসীদের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া বিচিত্রভাবে দেখা দিতেছিল। দাঙ্গা শুরু হইয়াছিল বেলা দশটা এগারোটায়—গ্রামে তখনো মধ্যাহ্নভোজনের সময় নয়, জোড়াদীঘিতে কাহারো আহার হয় নাই। আর এই অতর্কিতভাবে হাঙ্গামা শুরু হইয়া যাওয়াতে সে-বেলা অনেক বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজন অসমাপ্ত রহিয়া গেল। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যুযুধান নয়—নিজ নিজ স্বার্থ ও মনোভাব অনুসারে তাহারা উৎসুক ও চঞ্চল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

লাঠিয়ালগণ চলিয়া গেলে নবীননারায়ণ বৈঠকখানার মধ্যে একাকী পায়চারি করিতে লাগিল—আর বারংবার চুলের মধ্যে আঙুল চালনা করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব অবিন্যস্ত করিতে থাকিল। ওই তাহার দুশ্চিন্তার মুদ্রাদোষ। চিন্তা করিবার সময়ে, উদ্বেগের সময়ে সে স্থির হইয়া বসিতে পারে না। যদি বা ক্লান্তি বোধ করিয়া এক-আধবার বসে, তখনি আবার উঠিয়া দ্বিগুণ বেগে দ্রুততর গতিতে পায়চারি আরম্ভ করে। তাহার দেহটা যখন নিয়মিততালে নিয়মিতভাবে সন্তরণ করিতেছে, মনটারও তখন বিশ্রাম নাই, বেচারা চিন্তার খাঁজ-কাটা নিরিখ ধরিয়া আপন নিয়মে চলিয়াছে।

নবীননারায়ণ পায়চারি করিতে করিতে এক একবার থামে—জনতার

একটা আওয়াজের হল্কা তাহার কানে প্রবেশ করে, তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় নবীনের কপাল কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, আওয়াজ কমিয়া আসে, সে সন্দেহবাচক আঙুলের ভঙ্গী করিয়া আবার পায়চারি শুরু করে। সেদিন সে যে বিসর্জনের বাজনার কথা বলিয়াছিল—তাহার মনে হইল এই দাঙ্গা সেই বিসর্জনের বিষাদময় উৎসবেরই একটা অঙ্গ—বুঝি বা প্রধানতম অঙ্গ। নবীন একবার করিয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া শোনে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে।

মুক্তামালা তখন সবে স্নান সারিয়া বাহির হইয়াছে। তখনো তাহার প্রলম্বিত কেশরাশি হইতে জল পড়িবার বিরাম হয় নাই, তখনো তাহার চোখের পাতা জলের ভারে ভারী, চোখের কোণ ঈষৎ রাঙা, তখনো স্নানের আয়াসে বক্ষ ঘন ঘন দুলিতেছে, এমন সময়ে দাঙ্গার শব্দ ও দাসীদের মুখে তাহার সংবাদ যুগপৎ তাহার কানে আসিল। সে জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—ভাবিল, পরিণাম দেখিয়া প্রসাধনে যাইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বুঝিল ব্যাপার শীঘ্র মিটিবার নয়। সে চুল আঁচড়াইবার জন্য প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু একি! আয়নায় প্রতিবিম্ব কই? দু'তিনবার ভালো করিয়া চাহিতে অবশেষে প্রতিবিম্ব যখন তাহার চোখে পড়িল—সে নিজের ছায়াকে নিজে চিনিতে পারিল না। একি তাহার ছায়া? এমন মলিন কেন? অনেকক্ষণ সূর্যালোকের দিকে তাকাইয়া থাকিবার ফলে যে এমন ঘটিতে পারে সে কথা তাহার মনে আসিল না। তাহার চোখে সমস্ত জগৎ আজ মলিন হইয়া গিয়াছে। কোনো রকমে প্রসাধন সারিয়া সীমন্তে সিঁদুর টানিয়া সে জানলার কাছে ফিরিয়া আসিল—এবং দুই হাতে জানলার লোহার গরাদ ধরিয়া দশানির বাড়ির অভিমুখে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুশ্চিন্তার সময়ে নবীনের পায়চারির অভ্যাস আর মুক্তামালার অভ্যাস

নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা। স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সময়জ্ঞান নাই, সম্বিৎ নাই—সে যেন পাষাণী হইয়া যায়। তাহার বুকের চাপে লোহার গরাদ তপ্ত হইয়া উঠিল, তবু তাহার সম্বিৎ ফিরিল

না। এক একবার জগার মা আসিয়া ডাকিয়া যায়—বৌমা, এসো একটু জল খাও। কখনো বা সে আসিয়া বলে—বৌমা, চিন্তা ক'রো না, জমিদারদের ঘরে অমন হয়েই থাকে। আমরা কত দেখলাম।—কিন্তু আজ তাহার কথার কেহ উত্তর দেয় না!

জগার মার কথা আংশিক মাত্র সত্য। মুক্তামালার দুশ্চিন্তা কি কেবল তাহার পরিবারের আর্থিক পরিণামের জন্য? স্বপক্ষের কয়েকটি লোকের প্রাণ-নাশের আশঙ্কায়? ততোধিক কিছু নহে কি? তাহার সুপ্তমীন সরোবরের মতো নিষ্পলক দুটি নেত্র হইতে যে অপরিমেয় করুণা ক্ষরিত হইতেছে তাহা কি মাত্র দশানি-ছ'আনি দাঙ্গা প্রশমনের জন্য? সে ঘনীভূত ধারায় যে বিশ্বের সমুদায় আধি নিবারিত হইতে পারে। পুরুষে গৌরব করিয়া থাকে যে, ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে বুকের রক্ত সমর্পণ করে। কিন্তু আরো একটা হিসাব আছে। সে হিসাব কেহ করুক আর না করুক মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারী কখনো তাহা বিস্মৃত হন না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পুরুষে যত রক্ত ঢালিয়াছে, নারীর উৎসৃষ্ট চোখের জল কি তাহার চেয়ে অল্প? যে জলে মরু হাসিতে পারিত, পুরুষ তাহার প্রকৃত ব্যবহার জানে না, অকারণে সেই জলধারা সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, তাহার অধিকাংশই সংসারের কাজে লাগিতেছে না। যেটুকু কাজে লাগিতেছে তাহাতেই না মরুভূমির ওষ্ঠাধরপ্রান্তে স্মিত লেখা? তাহাতেই না পুরুষ দেবত্বের সীমান্ত স্পর্শ করিবার আস্পর্ধা করে?

মুক্তামালা কাহারো প্রশ্নে কোনো সাড়া দিল না, মাথার উপর দিয়া বেলা গড়াইয়া গেল—সে পাষাণবৎ নিশ্চল দাঁড়াইয়াই রহিল। পাষাণে এত করুণা! নহে কেন? হিমালয়ের কথা চিন্তা করিয়া দেখো।

নীলাম্বর ঘোষ কল্পনা করিতে পারে নাই যে এত শীঘ্র সেই পরমবাঞ্ছিত দাঙ্গা বাধিয়া উঠিবে। সকালবেলায় সে সুপারির বাগান তদারক করিতে গিয়াছিল, এমন সময়ে সংবাদ পাইল যে দশানির বাড়িতে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। অমনি সে দ্রুত বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়াই একখানি

শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইয়া নবনির্মিত পাকা বাড়িটির বারান্দায় একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিল। এই বাড়িটি এখনো অসম্পূর্ণ। বারান্দাটা মাত্র শেষ হইয়াছে—কিন্তু এখনো অন্য অংশের ছাদ দেওয়া হয় নাই। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি দেব-দ্বিজে তাহার ভক্তি সত্য হয়, যদি গীতা অভ্রান্ত হয়, তবে ছাদের ব্যবস্থা হইবার আগে জমিদারদের দাঙ্গা কখনো মিটিতে পারে না।

নীলাম্বর ঘোষ আসনের উপরে বসিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়া দিল।

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।"

সম্মুখে এবং পশ্চাতে শরীর কিঞ্চিৎ দুলাইতে দুলাইতে করজোড়ে তাহার গীতাপাঠ দেখিলে নিতান্ত নাস্তিকেরও প্রত্যয় না জন্মিয়া পারে না যে পাঠক একজন সাধুপুরুষ। যাহারা ধর্মকে সাংসারিক প্রয়োজনের অতীত মনে করে নীলাম্বর তাহাদের দলের নয়। সে বলিয়া থাকে যে, ধর্ম যদি আমার সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটাইতে না পারিল তবে তাহার মাহাত্ম্য কোথায়? তবে সেরূপ ধর্মের জন্য মানুষ কেন দুঃখ সহ্য করিবে? তাহার বাড়ির ছাদ পাকা হইবার আগেই যদি জমিদারের লড়াই মিটিয়া যায়, তবে শাস্ত্র মিথ্যা। জোড়াদীঘির ভ্রাতৃযুদ্ধের সকল পরিণতিতে মহাভারতের ভ্রাতৃযুদ্ধের বিবরণ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে ভাবিয়া সে গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছিল—সে আবৃত্তি করিতেছিল—

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।"

বাস্তবিক গীতার এমন ফলিত ব্যবহার কয়জনের দ্বারা সম্ভব হয়।

দুর্যোধন পাণ্ডব পক্ষের বীরগণের নাম দ্রোণাচার্যকে বলিতেছেন—

"অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।"

নীলাম্বর মুখে এই শ্লোকটি পড়িল—আর মনে চিন্তা করিতে লাগিল—হাঁ, বর্তমান ধর্মক্ষেত্রেও নইমুদ্দি, পঞ্চু, যদুমল্ল, মালঞ্চির সেখ প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়াছে। হঠাৎ তাহার কানে একবার সমবেত যোদ্ধাদের তুমুল হুঙ্কার প্রবেশ করিল, অমনি মনে পড়িয়া গেল—

"ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥"

না! গীতা সত্য না হইয়া যায় না। নতুবা সেকালের পৌরাণিক ঘটনা ও একালের বাস্তব ঘটনায় এমন মিল কি করিয়া হয়। নীলাম্বরের গীতার প্রতি ভক্তি বাড়িয়া যায়—সে দুলিয়া দুলিয়া পাঠ করিতে থাকে—এবং এক একবার খোলা ছাদের দিকে তাকাইয়া সেটা গাঁথিয়া তুলিতে কত খরচ পড়িবে মানসাঙ্কে কষিয়া লয়। নীলাম্বরের তৎকালীন মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ভারত-যুদ্ধের প্রাক্কালে মাতুল শকুনির মনোভাব খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

জগু সরকারের দোকানে জগু নিজে, ঘাড়টান পঞ্চানন, যোগেশ নায়েব ও বদ্যিনাথ বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের অভীষ্টসিদ্ধি নিকটবর্তী—এখন আর তাহাদের করিবার কিছু নাই—কেবল বিধাতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া। কিন্তু বিধাতার কাছে প্রার্থনা কি-ভাবে কি-ভাষায় করিতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান তাহাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট—কাজেই তাহারা সে দুরূহ চেষ্টা না করিয়া এই দাঙ্গার পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল!

একজন শুধাইল—শশাঙ্ক ঠাকুর কোথায়?

বদ্যিনাথ বলিল—যেখানে রাই, সেখানে কেষ্ট।

সকলে হাসিল।

জগু বলিল—ঠাকুরকে অত সহজ ভেবো না! ক'দিন থেকে দেখছি ঠাকুরের বৃন্দাবনের চেয়ে মথুরার চিন্তা বেশি হয়েছে।

সকলে আবার হাসিল।

ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—মথুরাও নয়, বৃন্দাবনও নয়, ঠাকুর এবার বাঁশি ছেড়ে ভারত-যুদ্ধের সারথি হয়েছেন।

সকলে আর একবার হাসিল। নির্বোধেরা তিনবার হাসে।

কিন্তু কেহই শশাঙ্ক ঠাকুরের সন্ধান বলিতে পারিল না।

ভজহরি দাসের দোকানে ভজহরি ও মাণিক খুড়ো বসিয়া কথা বলিতেছিল। মাণিক মাছ কিনিতে আসিয়াছিল, এমন সময়ে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। জেলের দল মাছ বিক্রয়ের চেয়ে দাঙ্গায় যোগদান অধিকতর লাভজনক মনে করিয়া বাজারে না আসিয়া দশানির বাড়ির দিকে ছুটিল। মাণিকের ভাগ্যে আর মাছ জুটিল না। সেই ক্ষোভ তাহার কিছুতেই মিটিতেছিল না। সে বলিতেছিল—

দেখো দাস, আমি বললাম এ গাঁয়ে কারো ভাত ভিক্ষে মিলবে না।

নিজের ভবিষ্যদ্বাণীতে নিজে উৎসাহিত হইয়া সে বলিতে লাগিল—আরে মিলবে কি ক'রে! যে গাঁয়ের জেলেরা মাছের চুপড়ি ফেলে লাঠি ধরে তাদের সর্বনাশ ঠেকায় কে! কি বলো?

দাস কোনো উত্তর করিল না।

—আরে বাপু, চুপড়ি ক'টা বাজারে ফেলেই না হয় যা! না! ততটুকু সইলো না। দেখো এ গাঁয়ের ভিটেয় একখানা ঘর থাকবে না।

তবু দাস উত্তর করিল না। ভজহরি তখন বিষণ্ণ মনে বাবুদের অবিবেচনা ও গ্রামের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল।

গ্রামের অধিকাংশ সমর্থ পুরুষ কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল। কেবল স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, শিশু এবং অকর্মণ্য ও ষড়যন্ত্রকারীর দল এই আবর্তের বাহিরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্থানে স্থানে দল পাকাইয়া মৃদুস্বরে দাঙ্গার বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। সমস্ত গ্রামখানি নীরব। দাঙ্গার তুমুল ধ্বনির পটে সেই নীরবতা অতি অপার্থিব আকার ধারণ করিয়া ঘুঘুর মৃদু করুণ রবকে শ্রুতিগম্য করিয়া তুলিয়াছিল।

তখন শরৎকাল। আকাশের নীলাভ্র ক্ষুদ্রতম মেঘবিন্দুহীন। রৌদ্রের বিগলিত স্বর্ণে জল স্থল অন্তরীক্ষ একপ্রকার অলৌকিক লঘুতা লাভ করিয়াছে। আর এই শুভ্র সুন্দর নিসর্গের এক প্রান্তে একদল মানুষ পরস্পরের রক্ত-পিপাসায় অধীর হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছিল।

দশানির আঙিনাতে তখন বিষম দাঙ্গা চলিতেছে। কীর্তিবাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলে দশানির লাঠিয়ালেরা প্রভুর অপমানে ভীমতর বেগে ছ'আনির লোকের উপরে গিয়া পড়িল। ছ'আনির দল আত্মরক্ষার আবেদনে সচেতন হইয়া উঠিল। দুই পক্ষই পরিণাম বিস্মৃত হইয়া লাঠি, শড়কি, বল্লম চালনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু-মিত্র সমানভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল। তখন সকলের সম্মুখে একমাত্র লক্ষ্য থাকিল অপরের মস্তক। মাথার কালো চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সকলে লাঠি চালাইতে থাকিল। তাহাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেল, গায়ে কালশিরার পাশে পাশে রক্তের ধারা দেখা দিল, বল্লমের আঘাতে ছিন্নভিন্ন ক্ষতস্থান রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মানুষের এই পাশবিক উল্লাস দেখিতে লাগিল। তখন মনে হইল, ইহারা আর মানুষ নহে, কোন্ গুহাবাসী আদিম শ্বাপদসমূহ। মুখে তাহাদের শ্বাপদের শুষ্ক হাসি, চক্ষুতে শ্বাপদের হিংস্র জ্বালা, মুখে শ্বাপদের চাপা গর্জন। ইহারা একপ্রকার মানব-পশু। দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে তাহাদের উপরে মনুষ্যত্বের যে সূক্ষ্ম এনামেল পড়িয়াছিল—অনেকক্ষণ তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরকার জান্তব স্বরূপটা বাহির হইয়া পড়িয়া নখে দন্তে, অকারণ হিংস্র উল্লাসে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। লাঠির আঘাতে কেহ পড়িয়া গেলেও অপরে তাহার দিকে তাকায় না, মিত্র মিত্রকে পদদলিত করিয়া অপরের প্রতি ধাবমান। কে কাহার মিত্র? শ্বাপদের আবার মিত্রতা কি? ইহারা কি জন্য এমন প্রাণপণ করিয়া লড়িতেছে? প্রভুর জন্য? আত্মসম্মানের জন্য? অপমানের প্রতিশোধের জন্য? না। এমন কি, অর্থের জন্যও নহে। বহুবাঞ্ছিত সুদুর্লভ দ্বন্দ্বের অবকাশ পাইয়াছে বলিয়াই তাহারা লড়িতেছে। আদর্শের জন্য কে লড়িয়া থাকে? সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ দেয়—সে কি আদর্শের অনুরোধে? নূতন উজ্জ্বল তকমা চাপরাশ প্রভৃতি ইউনিফর্মের অনুরোধেই মাত্র সৈন্যদল মারামারি করিয়া মরে। ওই ইউনিফর্ম ঘুচাইয়া

দাও, দেখিবে মরা দূরে থাকুক কেহ নড়িয়াও বসিবে না। মানুষের গাত্রে পশু-চর্মের বৈচিত্র্য নাই, ইউনিফর্ম সেই বৈচিত্র্য দান করে। ইউনিফর্ম পরিধান করিবামাত্র মানুষ আপাদমস্তক পশুতে পরিণত হয়। ইউনিফর্ম-পরিহিত যে সৈনিককে একটা জাঁদরেল হানিবল বা সীজার মনে হয়, ইউনিফর্ম টানিয়া খুলিয়া লইলে সে একটা পালক-ছাড়ানো মুরগীর মতো অর্থহীন এবং অসহায়। মানুষের মনুষ্যত্ব ইউনিফর্মের ক্রীতদাস।

লড়াই অনেকক্ষণ চলিতেছে—হতাহত হইয়া সকলে নিঃশেষ না হওয়া অবধি নিশ্চয় চলিত, কিন্তু এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। শ্রীচরণ রজক চীৎকার করিয়া উঠিল—ঢিল ছোঁড়ে কে? কানু ঘোষ বলিল—ওরে ভাই, শালারা ছাতের উপর থেকে ঢিল ছুঁড়ছে। এ যে নতুন কৌশল!

সত্যই কয়েকখানা ঢিল তাহাদের গায়ে পড়িল। কিন্তু একি দশানির ঢিল? তবে তাহাদের গায়েই বা পড়িবে কেন? একখানা বড় থান ইটের আঘাতে যদুমল্ল ধরাশায়ী হইল। একরাশ পলস্তারা ছুটিয়া আসিয়া মালঞ্চির সেখের মাথায় পড়িল। এ যে নিরপেক্ষ ঢিল! নতুবা শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে আঘাত করিবে কেন? তখন দুই পক্ষই বলিয়া উঠিল—দেখো, দেখো, ছাদের উপর হইতে কে ঢিল ছুঁড়িতেছে! ক্ষণকালের জন্য তাহারা অস্ত্র সংবরণ করিয়া উপরের দিকে চাহিল! একি! একি! সকলে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—দালান কাঁপে কেন? লড়াই থামাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই তাহাদের মাথা ঘুরিয়া উঠিল—পায়ের তলার মাটি কাঁপিতেছে। কেহ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অসহায়ের মতো বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটি চাপিয়া ধরিল। এ সময়ে যে পালানো আবশ্যক—সেই অবশ্যকর্তব্যটাও তাহাদের মনে পড়িল না। তখন আর সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বিষম ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। ঝুপ ঝুপ করিয়া ইঁট খসিতে লাগিল, ঝুর ঝুর করিয়া চূণ-বালি খসিতে লাগিল, ঝপাৎ ঝপাৎ করিয়া বড় বড় পলস্তারার চাপ খসিতে লাগিল—আর উভয় পক্ষে এতক্ষণ যাহারা নিজেদের ভীষ্ম-দ্রোণ শোরাব-রোস্তম মনে করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন

করিতেছিল, তাহারা অসহায় শিশুর মতো ঊর্ধ্বস্বরে আল্লা, কালী, খোদা, হরি বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। সকলে হাঁকিতে লাগিল—ভগবান্, রক্ষা করো! ভগবান্, রক্ষা করো!—হায় ভগবান্, তুমি বিপদের ত্রাণকর্তা মাত্র, সম্পদের কেহ নহো!

এমন সময়ে একটা দালান খসিয়া পড়িবার শব্দে সকলের সংজ্ঞা হইল—কে একজন বলিয়া উঠিল—ভাই সব, পালাও! পালাও! এখনি চাপা পড়বে। সকলে উঠিয়া পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু একি! আঙিনার চত্বর হইতে বাহিরে আসিবার একটিমাত্র সরু গলিপথ ছিল—বৈঠকখানার তেতলা খসিয়া পড়িয়া সেই পথ কখন্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—আর পালাইবার পথ নাই! চারিদিকে পর্বতপ্রমাণ দোতলা, তেতলা অট্টালিকা। সে-সব অট্টালিকাও কাঁপিতেছে। সকলে বুঝিল আজ এইখানেই চাপা পড়িয়া সকলকে সমাহিত হইতে হইবে—শত্রু-মিত্রের সকলের জন্য এক সমাধি—কেহ রক্ষা পাইবে না।

সময় আসন্ন বুঝিয়া হারু সেখ কাঁদিয়া উঠিল—আল্লা—মৃত্যুকালে ছেলেটাকে দেখতে পেলাম না!

শ্রীচরণ বলিল—মা কালী, তোমার মনে শেষে এই ছিল—মুখে আগুন হ'ল না, কবরে গেলাম!

নাড়ুসগোপাল বার বার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গিয়াছে—সে এবারে উঠিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সোজা শুইয়া পড়িল। কানু ঘোষ বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সোনা বলিল—আমার লাঠিতে সর্দার মরেছে, সেই পাপেই এই ভুঁইদোল! সে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

আঙিনাতে বীরপুঙ্গবদের যখন এই দশা, তখন চারিদিকের দালান কাঁপিতেছে। কাছারিতে ঝাড়গুলা দুলিতেছে, কোথাকার একটা টিনের ঘরের চাল ঝনঝন শব্দে কাঁপিতেছে, পুকুরের জল দুলিতেছে, নারিকেল-গাছগুলি মাথা নীচু করিয়া ধূলা ঝাঁট দিবার চেষ্টায় নিরত, ঝাঁকবাঁধা কাকের দল উড়িতে উড়িতে কাঁপিতেছে, পায়রার দল কার্নিশ ছাড়িয়া

মাটিতে বসিয়া চোখ বুঁজিয়া ঢুলিতেছে। ঝন ঝন ঝনাৎ। একটা ঝাড়-লণ্ঠন শুষ্ক ক্রূর অট্টহাসির প্রতিধ্বনি করিয়া ভাঙিয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাঁসরঘণ্টা শঙ্খধ্বনি উঠিল—হরিধ্বনিতে আকাশ মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল!

যে-অট্টালিকা মানুষের বাসস্থান, বিপদে মানুষ যাহার কুক্ষিতে গিয়া আশ্রয় লইয়া নিরাপদ বোধ করে—কোন্ দৈবের বিড়ম্বনায় তাহার সেই চিরদিনের আশ্রয় আজ বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বস্ততম আজ কৃতঘ্নতম। যে-অট্টালিকা এতকাল মানুষকে সস্নেহে আশ্রয় দিয়াছিল—সে আজ এক-একখানা করিয়া ইট খসাইয়া তাহার মাথায় নিক্ষেপ করিতেছে। আর যাহারা এতক্ষণ পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া বধ করিবার জন্য উদ্যত ছিল, তাহারা পরমতম মিত্রের মতো পরস্পরের ক্ষতস্থান মুছাইয়া দিতেছে। এই তো মানুষের জীবন! মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, মানুষ অদ্ভুত! তাহাদের বিপরীত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কে যেন খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল—নাঃ, আর একটা ঝাড়-লণ্ঠন চূর্ণ হইবার শব্দ। সকলে ভীত বিস্ময়ে শুনিল—কোন্ সুগভীর হইতে একটা গুরু গুরু ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আল্লা, হরি, কালী, খোদা—তাহাদের এই আর্ত আবেদনের প্রত্যুত্তরে হুড়মুড় হুড় করিয়া তোষাখানার একটা অংশ খসিয়া পড়িল। সকলে দেখিতে পাইল, শিবের মন্দিরের ঊর্ধ্বোত্থিত ত্রিশূলটা ঘন ঘন

কাঁপিতেছে। পরক্ষণেই বজ্রের গর্জন তুলিয়া সমস্ত মন্দিরটা ক্ষুব্ধ জানকীর মতো ভূগর্ভে ঢুকিয়া পড়িল। আল্লা, খোদা, হরি, কালী, রক্ষা করো! বাঁচাও!—না, আজ আর রক্ষা নাই। আকাশে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে, জলে-স্থলে, এমন কি, স্বনির্মিত অট্টালিকাশ্রেণীতে কোথাও আজ দয়ার আভাস মাত্র নাই। হুড়-মুড় হুড়। বুঝি অন্দরমহলের দালান খসিতেছে। সকলে ভাবিল এবারে মণ্ডপটা খসিয়া পড়িলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। সকলে আশামিশ্রিত আশঙ্কায় মণ্ডপের দিকে চাহিল। মণ্ডপের গাত্রে খোদিত মূর্তিগুলা কম্পমান। হ্যাঁ, পূতনা রাক্ষসীটার আজ উপযুক্ত সুযোগ বটে—তাহার ব্যাদিত বদন ক্রমশ বিস্তৃততর হইতেছে। গোপীদের দুঃখ আর ঘুচিবার নয়—

বস্ত্রসমন্বিত কদম্ব তরুটা ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল। বৃক্ষের নিম্নাঙ্গ পলস্তারা খসিয়া অন্তর্হিত হইল। কার্নিস, আলিসা টলিতেছে, নেশাধরা কাকগুলা ঝিমাইতেছে, আকাশে আর উড়িবার তাহাদের শক্তি নাই, কাকে পায়রায় মিলিয়া নিস্তব্ধ—কে বলিবে তাহারা মিত্র নয়। গ্রামের উচ্চ শঙ্খধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া শৃগাল, কুকুর ও গো-মহিষ আর্তনাদ করিতেছে, হাতীশালে হাতী ডাকিতেছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া ডাকিতেছে, ঘরে ঘরে মানুষ ডাকিতেছে—রক্ষা করো ভগবান্, রক্ষা করো! উর্ধ্বে মুখ তুলিয়া উর্ধ্বস্বরে ডাকিতেছে—রক্ষা করো, রক্ষা করো, ভগবান্!

কিন্তু সেই তিনি কোথায়? ওই যে চিরজীবনের বিশ্বস্ত হর্ম্য ঢিল ছুঁড়িতেছে—তিনিই কি? কে বলিবে নয়? ভগ্ন স্ফটিকস্তম্ভ হইতে যদি তিনি অপ্রত্যাশিত মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে পারেন—তবে এই ভগ্ন অট্টালিকার ফাটল হইতে তাঁহার অভাবিত আবির্ভাব কি এতই অসম্ভব? সকলে হাঁকিতেছে—রক্ষা করো! রক্ষা করো!

এমন সময় সকলে শুনিতে পাইল, উচ্চ হইতে, কোন্ অট্টালিকার শীর্ষ হইতে কাহার আর্তকণ্ঠ যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল—রক্ষা করো! রক্ষা করো! বাঁচাও! বাঁচাও!

সকলে চমকিয়া উঠিল। উপরে তাকাইল, পাশে তাকাইল। কে? কাহার ওই বিকৃত স্বর প্রার্থনা যাচ্ঞা করিতেছে? তবে কি ছাদের উপরে কেহ ছিল?

আবার রব উঠিল—রক্ষা করো!

নীচে হইতে একজন বলিল—মানুষের দ্বারা রক্ষা সম্ভব নয়। একমাত্র ভগবানই রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে ডাকো।

উপরের সেই স্বর বলিল—বাপ সকল, ও সকল ফাঁকি আমিও জানি। ভগবানের দোহাই দিয়ে রোজগার করাই আমার ব্যাবসা। ভগবানের নাম দিয়ে মানুষ চাল-কলা খায়, দক্ষিণা আদায় করে। আমি ও-ফাঁকিতে ভুলছি না। তাই বলি বাপ সকল, একমাত্র তোমরাই আমাকে রক্ষা করতে পারো।

এখান থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া ভগবানের বাপেরও অসাধ্য। তোমরা কেউ উঠে এসো।

একজন বলিল—সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো।

উপরকার বিপন্ন কণ্ঠ বলিল—সিঁড়ি কোথায়? সিঁড়ি ভেঙ্গে প'ড়ে গিয়েছে। সিঁড়ি থাকলে কি আর তোমাদের ডাকি? ভগবানকেই ডাকতাম। শীগগির উঠে এসো।

নীচে সকলে পরস্পরকে শুধাইল—উপরে লোকটা কে?

১১

ছাদের উপরে আর কেহই নয়—শশাঙ্ক ঠাকুর। সে হঠাৎ এমন অসময়ে অপরের বাড়ির ছাদের উপরে উঠিতে গেল কেন? শশাঙ্ক ঠাকুরের সহিত পাঠকের পরিচয় দীর্ঘকালের—তৎসত্ত্বেও যদি তাহাকে না বুঝিয়া থাকেন—তবে আর কেমন করিয়া বুঝাইব। বাদলির জন্য যে শাড়িখানি সে কিনিয়াছিল এবং বাদলি যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই শাড়িখানা আজ কয়েকদিন ধরিয়া সে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছিল। গাঁয়ের লোকে কিনিতে চাহে না, কেহ বলে দাম বেশি, কেহ বলে প্রয়োজন নাই, কেহ বলে—ঠাকুর, কাহার শাড়ি বেচিতেছে তাহার ঠিক কি! অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরি করিবার পরে সে পাশের গাঁয়ের একজনকে কিঞ্চিৎ মোটা লাভে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকালবেলাতে মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল, আপন মনে গান করিতে করিতে সে জোড়াদীঘিতে ফিরিতেছিল। তাহার কেমন যেন ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ একবৃন্তে বিধৃত, নতুবা বাদলির প্রত্যাখ্যানের দুঃখ কিঞ্চিৎ অর্থাগমে দূরীভূত হইতে যাইবে কেন? বাদলির রূঢ় কথাগুলি এক একবার মনে পড়ে, মনটা মুষড়িয়া আসে, অমনি হাতের অঙ্গুলিতে ট্যাঁকের পয়সাগুলি স্পৃষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে, অমনি গানের সুর উচ্চতর হয়। এইভাবে চলিতে চলিতে যখন সে

গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, শুনিতে পাইল যে, দশানির বাড়িতে বিষম মারামারি বাধিয়া গিয়াছে। সে চমকিয়া উঠিল। ইহাও কি সম্ভব? দুই পক্ষে লাঠালাঠি চলিতেছে আর সে অনুপস্থিত! মারামারি দেখিতে, অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া, তাহার বড় ভালো লাগে। লাঠির আঘাত মাথায় পড়িলে এক প্রকার শুষ্ক শব্দ উত্থিত হয়—সেই শব্দটি শশাঙ্কর বড়ই প্রিয়। আর উভয় পক্ষের আহতদের আর্তনাদ, আহা, তাহার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মনে পড়িয়া যায়। গ্রামের মধ্যেই এমন একটা দুর্লভ-দর্শন কাণ্ড ঘটিতেছে, আর সে উপস্থিত নাই। সে ছুটিতে ছুটিতে চলিল। মারামারিতে এই অহেতুক আনন্দলাভ ছাড়াও আরো একটা প্রয়োজন তাহার ছিল। উভয় পক্ষেই তাহার অনেকগুলি খাতক আছে। তাহাদের কে মরিল, কে আহত হইল, এ তথ্য যত শীঘ্র সে জানিতে পারে, ততই মঙ্গল। সেই অনুসারে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শশাঙ্ক ঠাকুর দশানির বাড়ির অন্দরের প্রাচীর ডিঙাইয়া মণ্ডপের সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপরে উঠিল এবং তথায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়া সানন্দে, নির্ভয়ে নিম্নবর্তীদের জীবনমরণ-পণ দ্বন্দ্ব উপভোগ করিতে লাগিল। লাঠালাঠির খটাখট, মাথা ফাটার পটাপট, আহতের গোঙানি, মুমূর্ষুর দেহ-আক্ষেপ, মৃতের রহস্যময় নীরবতা তাহার বড়ই ভালো লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—কিমাশ্চর্যম্, আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না—অথচ আমার কাছে সমস্তই দৃশ্যমান, অহো, বিধাতার একি বিধান! কিন্তু বিধাতার বিধানের সমস্ত রহস্য সে অবগত ছিল না—নতুবা হঠাৎ অতর্কিতে এমন রসভঙ্গকর ভূমিকম্প আরম্ভ হইতে যাইবে কেন?

ভূমিকম্পের প্রথম কাঁপুনিতে সে ভাবিল, আর কিছু নয়, তাহার মাথাটা ঘুরিতেছে। কিন্তু তারপরেই ভাবিল, শশাঙ্ক ঠাকুর নেশার আলেকজাণ্ডার, এমন কোন্ নেশা আছে, যাহাতে তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে? কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিল সিঁড়ি ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তখন সে নিম্নবর্তীদের লক্ষ্য করিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

সে চীৎকার নিম্নবর্তীরা শুনিতে পাইল। ভয়ে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, আর লাঠিয়ালদেরও মনের প্রকৃতিস্থ অবস্থা ছিল না, তাই প্রথমটা সকলে তাহার স্বর চিনিতে পারে নাই—কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝিয়া ফেলিল—ছাদের উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর। তাহা ছাড়া, কার্নিশের উপর দিয়া তাহার মাথাটাও দেখা যাইতেছিল, ঠাকুরের মাথাটা ভূমিকম্পের তালে তালে তরঙ্গ-তাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো দুলিতেছে।

সকলে নীচে হইতে শুধাইল, ঠাকুর, ওখানে গেলে কি ক'রে?

শশাঙ্ক কোনো উত্তর দেয় না, হাত জোড় করে আর কাঁপে!

গাবু বলিল—কি আশ্চর্য! ভূমিকম্পে সকলেরি পতন হয়, কেবল ঠাকুরের উন্নতি, একি রকম?

শ্রীচরণ বলিল—তপস্যার জোরে।

গাবু বলিল—ঠিক তাই। বিষ্ণুদূতে ঠাকুরকে টিকি ধ'রে স্বর্গে নিয়ে চলেছিল—হঠাৎ টিকি ছিঁড়ে ঠাকুর ছাদের উপরে পড়ে গিয়েছে। তাছাড়া তো আর কারণ দেখি না।

তখন নিম্নবর্তীদের মধ্যে ঠাকুরের দুর্দশা লইয়া এক প্রকার আমোদ পড়িয়া গেল। তখনো ভূমিকম্প চলিতেছে, জীবনের আশঙ্কায় তখনো সকলে বিব্রত, তবু অপরের দুর্দশা তাহাদের এক প্রকার অস্বাভাবিক আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা নিজেদের বিপদ ভুলিয়া অপরের বিপদে উল্লাস বোধ করিতে লাগিল। মানুষ বড়ই অদ্ভুত জীব! তার উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর সকলেরই মহাজন। মহাজনের দুর্দশায় সুখী না হয়, এমন দেনদার সত্যকালে থাকিলেও এই দগ্ধ কলিকালে একেবারেই বিরল!

গাবু বলিয়া উঠিল—এতদিন ওর ভয়ে আমরা কেঁপেছি—আর আজ সবাই, দেখো দেখো, ঠাকুরের কাঁপুনি দেখো! নয়ন সার্থক হোক।

এমন সময়ে হুড়মুড় করিয়া একটি ভীষণ আওয়াজ হইল। মণ্ডপের ছাদ খসিয়া পড়িল। শত্রু-মিত্র অভেদে সকলের মন একসুরে বাঁধা, সকলেরই মনে হইল—ঠাকুর মরিয়াছে তো? তখনো মণ্ডপের কাঁপুনি থামে নাই, কিন্তু কেহ

বিপদের আশঙ্কা মাত্র গণিল না, সকলে দৌড়িয়া সেই সদ্য পতিত ছাদের নিকটে গিয়া সন্ধান করিতে লাগিল—শশাঙ্কর দেহটা। সকলেরই মনে এক চিন্তা, ঠাকুর এবারে বাঁচিয়া গেলে কাহাকেও ছাড়িবে না, নালিশ করিয়া ভিটামাটি দখল করিয়া লইবে।

হঠাৎ কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখো দেখো!

সকলে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—ঠাকুরের দেহ!

একজন সন্দেহসূচক স্বরে বলিল—কিন্তু যদি না—তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন শশাঙ্কর নাকের কাছে হাত লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিল—মরেছে, মরেছে!

তখন সকলে অর্ধোন্মত্তবৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—মরেছে, ঠাকুর মরেছে। আর ভয় নেই, মরেছে!

গাবু বলিল—কিন্তু মরণেও এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? ওই দেখো না গোপিনীদের জড়িয়ে ধ'রে ঠাকুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সকলে দেখিল, দুইটি ইষ্টকনির্মিত গোপিনী-মূর্তি জড়াইয়া ধরিয়া ঠাকুর পড়িয়া আছে!

তখন আর একজন বলিল—ভাই, আল্লাকে দোষ দিয়েছিলাম ভূমিকম্পের জন্যে। কিন্তু খোদা কি অবিচার করতে পারেন। এই ঠাকুরকে মারবার জন্যেই ভূমিকম্প এনেছিলেন! দেখো না কেন, যেই ঠাকুর মরেছে ভূমিকম্পও গিয়েছে।

তখন সকলে সম্বিৎ পাইয়া বুঝিল—ভূমিকম্প সত্যই থামিয়াছে বটে। অমনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে সমস্বরে হাঁকিয়া উঠিল—আল্লা হাকিম! জয় মা কালী!

তারপরে তাহারা ঠাকুরের মৃতদেহটা তদ্‌বৎ রাখিয়া মণ্ডপের বাহিরে আসিল এবং কোনমতে ভগ্ন প্রাচীর ও ধ্বস্ত দালানের স্তূপ ডিঙাইয়া দশানির বাড়ির বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবামাত্র গ্রামের দিকে তাহারা তাকাইল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এ কি কয়েক ঘণ্টা আগেকার সেই জোড়াদীঘি? তাহারা ভালো করিয়া চিনিতেই পারিল না। কেবল রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নইমুদ্দি সর্দারের স্খলিত চক্ষু দুইটা নিরর্থক প্রশ্নের মতো শূন্যের দিকে তাকাইয়া পড়িয়া রহিল।

১২

তখনো আকাশ ধূলিতে আচ্ছন্ন। ভগ্ন অট্টালিকাসমূহের ধূলিরাশি ইষ্টকের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া আকাশে যুগান্তের গোধূলি সৃষ্টি করিয়া নিখিল প্রকৃতির দেহে অন্তিম বৈরাগ্যের গৈরিক বসন অর্পণ করিল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ চীবর ধারণ করিয়াছে, রাজকন্যা রাজ্যশ্রী কাষায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতি আজ বৈরাগী—জোড়াদীঘির একি অকাল বৈরাগ্য। লাঠিয়ালের দল পূর্ববৈর বিস্মৃত হইয়া যে যাহার বাড়ির দিকে ছুটিল—পথের দুই দিকে যে-দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল—মানুষের দৃষ্টি কদাচিৎ তাহা দেখিয়াছে।

বড় বড় অট্টালিকা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, জানলা দরজা খুলিয়া ঝুলিতেছে, ভিতরকার আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ। কোনো অট্টালিকার ছাদ খসিয়াছে, কোনোটার বা দেয়াল ছাদ দুই-ই গত, আবার কোনো কোনোটার ছাদের কিয়দংশ মন্ত্রবলে যেন অক্ষত! কত কালের সব বনস্পতি উন্মূলিত, কতক-বা কোমর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পুকুরের জল ভূমিকম্পের ঠেলায় জমিতে উঠিয়াছিল এখন নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু খালে-খন্দে জল আটক পড়িয়াছে, শুষ্ক জমিতে মাছ খাবি খাইতেছে। গোরুগুলা এক সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছিল, গলায় দড়ি ঝুলাইয়া তাহারা মূঢ়ের মতো ইতস্তত দণ্ডায়মান। দশানির হাতীটা পিলখানার খোঁটা উপড়াইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার গলায় শিকলের সঙ্গে খোঁটাটি ঝুলিতেছে।

টিনের ঘর ও খড়ের ঘর বাদে গাঁয়ের অধিকাংশ দালানই হয় পড়িয়াছে, নয় ক্ষতিগ্রস্ত। দশানির বাড়ির প্রায় সবগুলি দালানই পড়িয়া গিয়াছে, দু'একটা

মাত্র অর্ধক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। ছ'আনির বাড়ির নূতন চত্বর পড়ে নাই বটে, কিন্তু পুরাতন অংশ একটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের সময় গৃহবাসীরা গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিল—এখনো তাহারা ঘরে ঢুকিতে সাহস করিতেছে না, তৎপরিবর্তে মাঠের মাঝখানে নদীর ধারে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। বিজয়া দশমীর পরদিন সকলে যেমন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, কুশলসম্ভাষণ করে, তাহারা তেমনি করিতেছে। এতদিন যে শত্রুতা তাহারা সযত্নে লালন করিয়া তুলিযাছিল, তাহা এখন বিস্মৃত। মানুষের বৈরিতা পৃথিবীর বৈরিতার তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে—আজ ক্ষণকালের জন্য শত্রু-মিত্র বৈরাগ্যের শুভ্র শ্মশানে আত্মপরভেদ ভুলিয়া মানুষমাত্র পরিচয়ে দণ্ডায়মান।

অনুসন্ধানের পরে জানা গেল যে, এক শশাঙ্ক ঠাকুর ছাড়া আর কেহ মারা পড়ে নাই। এইমাত্র যাহারা শশাঙ্কর মৃত্যুতে উল্লসিত হইয়াছিল, সামাজিক বোধ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল, কিংবা সুখের অনুভূতি চাপিয়া দুঃখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিল। মানুষ, ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, সামাজিক জীব, কেবল প্রলয়ের মুহূর্তে তাহার মনের সমাজ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সে ভগ্ন অট্টালিকার উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো বন্ধন মোচনের আনন্দে মরীয়া হইয়া ওঠে।

জোড়াদীঘির উচ্চ-নীচ ভেদে সমবেত জনতা মূঢ়ের মতো সেই মাঠের মধ্যে বসিয়া রহিল। একজন বলিল—আজ আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই, এখনো……

অশুভ লক্ষণ সে আর প্রকাশ করিল না, প্রয়োজনও ছিল না, তখনো ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

আর একজন বলিল—সেই ভালো। রাতটা সকলে মিলে এখানেই কাটানো যাক।

তাহাই স্থির হইল।

সে রাত্রে জোড়াদীঘির অধিবাসীরা—জমিদার, প্রজা, উচ্চ-নীচ, পূর্বতন

শত্রু-মিত্র—মরুভূমির মেষপালকের ন্যায় মাঠের মধ্যে পড়িয়া রহিল। আকাশের নক্ষত্রের দল, মানব-প্রহসনের চিরন্তন সাক্ষীর দল, নীরব নেত্রে সমস্ত দেখিল। এক সময়ে দশমীর চাঁদ আপন আলোর ভারে ডুবিয়া গেল। চরাচর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। শিবাধ্বনিবিরহিত সেই নৈশপ্রহর জোয়ার-ভাঁটার আন্দোলনহীন সমুদ্রের মত নিশ্চল। চারিদিকে ক্লান্তির সুষুপ্তি। এ যেন মানুষের সংসার নহে, বিস্মৃতির কোন্ এক সুমেরু প্রদেশ! কেবল এই অসীম নির্জনতার প্রান্তে কোথা হইতে চাপা ক্রন্দনের করুণ স্বর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বাদাল কাঁদিতেছে। একাকী, জাগ্রত, রহস্যময়ী।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

জোড়াদীঘির গ্রামে ব্রজ রায় ও কৃষ্ট রায় নামে দুই ভাই ছিল। দুইজনেই অকৃতদার। কৃষ্ট রায় গ্রামেই থাকিত, ব্রজ রায় অনেক দিন হইল কাশীবাসী হইয়াছে। কৃষ্ট রায় নির্ঝঞ্ঝাট লোক, সাতেও নাই পাঁচেও নাই, গ্রাম্য রাজনীতির মধ্যে সে কখনো পদার্পণ করিত না, নিজের বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার লইয়া থাকিত, কদাচিৎ অপরের সঙ্গে মিশিত। দশানি ছ'আনি বিবাদের কোনো অংশ পরোক্ষেও সে গ্রহণ করে নাই। এই সব কারণে আর সকলে তাহাকে দাম্ভিক মনে করিত, বলিত, এত গরম কিসের? ওর যা বিদ্যাবুদ্ধি, টাকা-কড়ি কিছুই তো আমাদের অজানা নাই। কিন্তু লোকটা এতই নির্বিবাদী যে, তাহার প্রত্যক্ষ দোষ ধরা কঠিন। তাই সকলে তাহার নাসিকাটি লইয়া হাসাহাসি করিত। কৃষ্ট রায়ের নাকটা খাঁদা, তাহার উপরের খানিকটা অংশ অনেকদিন হইল লোপ পাইয়াছে। গ্রামের সকলে বলিত, কৃষ্ট রায়ের নাকের ইতিহাস তো আমাদের অজ্ঞাত নয়, আর যার কাছে হোক সে সাধু সাজুক। কেহ বলিত, যৌবনকালে পাশের গাঁয়ের একজনের বাড়িতে অবৈধ প্রবেশের সহিত তাহার নাসিকার আংশিক লোপের ইতিহাস জড়িত। অপরে বলিত, বাল্যকালে ইস্কুলে একদিন মাস্টারের কাছে বেত খাইয়া মাস্টারকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় সে বেতবনে বেত কাটিতে ঢুকিয়াছিল। একখানা তির্যক্ বেতের সবেগ আন্দোলনে তাহার নাকের ওই অংশটা উড়িয়া গিয়াছে। জনসাধারণের নিকট দুটি

কারণই সমান আনন্দদায়ক হওয়াতে একই ঘটনার দুইটি কারণেকই তাহারা সমানভাবে বিশ্বাস করিত।

ব্রজ রায় বহুকাল হইল কাশীবাস করিতেছে। মাঝে মাঝে দু'দশ দিনের জন্য জন্মগ্রামে আসিত। এবারে সে প্রায় দশ বৎসর পরে জোড়াদীঘিতে আসিয়াছে। বিকালবেলা সে তাহার ভাইকে বলিল—চল্ কৃষ্ট, একবার গ্রামটা ঘুরে আসি।

এই বলিয়া সে ধোয়া ধুতি, বুকের কাছে প্লেট-লাগানো ধোয়া শার্ট পরিয়া, রূপাবাঁধানো ছড়িখানা হাতে প্রস্তুত হইল। কৃষ্ট রায় আসিলে দুজনে বাহির হইয়া পড়িল

দু'জনে চলিতে চলিতে ব্রজ রায় জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে, কৃষ্ট, গাঁয়ে এত জঙ্গল হ'ল কেন রে?

কৃষ্ট রায় বলিল—দাদা, তুমি দশ বৎসর পরে আসছো, গাঁয়ে যে ইতিমধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

ব্রজ রায় ভাইয়ের পত্রে এবং জোড়াদীঘির কোনো কোনো লোকের মুখে গ্রামের জমিদারদের কলহ-বিবাদের কতক কতক সংবাদ পাইয়াছিল—কিন্তু সমস্ত ব্যাপার জানিত না।

কৃষ্ট রায় বলিল—দাদা, জোড়াদীঘি কি আর আছে!

ব্রজ রায় বলিল—বেশ স্পষ্ট দেখছি আছে, তবে নাই কিসের?

কৃষ্ট রায় বলিল—শ্মশানে আনলে মানুষটা যেমন থাকে, তেমনি আছে। যা দেখছো জোড়াদীঘির শ্মশান।

ব্রজ রায় বলিল—শ্মশানও যে এর চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। বাবুরা গ্রামটা পরিষ্কার করায় না কেন?

—বাবুরা! কৃষ্ট রায় বড় দুঃখে হাসিল। তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল—বাবুদের আর কি কিছু আছে?

ব্রজ রায় বলিল—মামলা-মোকদ্দমায় টাকাপয়সা খরচ হয় বটে, তাই ব'লে গ্রামটা পরিষ্কার রাখবে না?

কৃষ্ট রায় কণ্ঠের পূর্বতন খাদে বলিল—বাবুদের সে শক্তিও বুঝি নেই।

বিস্মিত ব্রজ রায় বলিল—কি রকম?

কৃষ্ট রায় বলিল—রকম প্রায় ষোল আনাই। বাবুদের জমিদারি, পত্তনী সমস্ত গিয়েছে।

—সমস্ত?—ব্রজ রায় চমকিয়া উঠিল।

—প্রায় সমস্তই। প্রথমে গেল পত্তনী সম্পত্তি। পাঁচ সাত বছরের বাকি খাজনা জ'মে এত ভারী হয়ে উঠেছিল যে তা আর শোধ করতে পারলো না। খাজনার দায়ে পত্তনীগুলো গেল। গেল, কিন্তু সব খাজনা শোধ হ'ল না। শেষে পত্তনী খাজনার বাকি অংশের বাবদ নালিশ ক'রে মালিকরা বাবুদের জমিদারী সম্পত্তিগুলো পর্যন্ত নীলাম করে নিলো!

—বলিস কি রে! ব্রজ রায় এ সমস্তর কিছুই জানিত না!

সে বলিল—তাহলে রাউতনি, সোনারপুর, ইসলামপুর সব গিয়েছে? সোনার সম্পত্তি রে, সোনার সম্পত্তি। আমি অনেকদিন ওসব মহালের নায়েবি করেছি। এক দিনে কিস্তির খাজনা আদায় হ'ত, এক ডাকে পাঁচ হাজার প্রজা এসে খাড়া হ'ত। কিছুই নেই? কিস্তির সময়ে পরগনায় হাতী যেতো। হাতী ক'রে আমি টাকা চালান দিয়েছি।

এমন সময়ে তাহারা পিলখানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রজ রায় বলিল—এই তো পিলখানা!

কৃষ্ট বলিল—ওই পিলখানা পর্যন্তই—হাতীটা?

—যেখানে জমিদারি সেখানে হাতী। দুইজনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তারপরে দুইজনে পথের যে অংশ দিয়া চলিল, তাহার দুই পাশে ভগ্ন গোয়াল, শূন্য আস্তাবল, খসিয়া-পড়া অতিথিশালা, ভাঙিয়া-পড়া নহবৎখানা! ব্রজ রায় দুই দিকের দৃশ্য দেখিয়া স্বল্পক্ষণের মধ্যেই বাবুদের অবস্থা বুঝিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন হইল না!

ব্রজ রায় শুধাইল—বাবুদের বাড়িগুলোর অবস্থা কিরকম?

কৃষ্ট বলিল—সেবারের ভূমিকম্পে প্রায় সমস্তই গিয়েছে।

এমন সময়ে তাহাদের চোখে পড়িল দ'শানির সেই দেউড়িটা উদ্ধত অভিমানের মতো মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে কিন্তু দু'পাশের প্রাচীরের আকাশপথে ভিতরের ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়—ধ্বংসস্তূপ আর তাহার উপরের বট অশ্বত্থ প্রভৃতির জঙ্গল।

ব্রজ রায় বলিল—ছ'আনির বাবু কোথায়?

কৃষ্ট বলিল—তিনি কল্‌কাতায় চ'লে গিয়েছেন, শুনেছি সেখানে চাকরি-বাকরি করেন।

—আর দশানির বাবু?

—তিনি গাঁয়েই আছেন। তবে বড় বের হন না। জোড়াদীঘি গ্রামের অংশটুকু এখনো তাঁর আছে, তবে শুনতে পাই নাকি সেটুকু আর বেশি দিন নয়!

ব্রজ রায় শুধাইল—কিন্তু গাঁয়ের সব লোক গেল কোথায়? চারিদিকের ভিটে যে পতিত দেখছি।

কৃষ্ট রায় বলিল—দাদা, লোকে আর কি সুখে গাঁয়ে থাকবে? নদী গিয়েছে, বিষম ম্যালেরিয়া।

—নদী গিয়েছে? সে কি রকমের?

—চলো না দেখবে।

ইতিমধ্যে তাহারা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রজ রায় চমকিয়া উঠিয়া বলিল—সত্যই তো নদী গেল কোথায়? সব যে শুকনো!

কৃষ্ট রায় বলিল—এই রকমই। আজ পাঁচ সাত বছর হ'ল বর্ষার জল আসা বন্ধ। কোথায় নাকি পদ্মার উপরে পুল গেঁথেছে তাই এই দশা। আর ধূপোনের মোহানা পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয়েছে। আগে বর্ষায় জল আসতো, মাস দুই তিন থাকতো। এখন তা-ও বন্ধ। দেখছো তো কচুরিপানার তেজ! নদী গিয়েছে, জমিদার গিয়েছে, গাঁয়ে লোকে আর থাকে কোন্ সুখে। ম্যালেরিয়া লেগে কতক মরলো, বাকি সব উঠে চ'লে গেল। এখন যারা

আছে উপায় নেই ব'লে আছে, উপায় হ'লে আজ এখনি উঠে চ'লে যায়— এমন তাদের মনের ভাব!

দুইজনে নীরবে অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে শীতের সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল। কচুরিপানা-বোঝাই নদীগর্ভ হইতে একপ্রকার বিষাক্ত নিশ্বাস উঠিতে লাগিল, যতদূর দেখা যায় কোথাও কোনো জনপ্রাণী নাই, সব কেমন পরিত্যক্ত, পলাতক ভাব! একটা কালপেঁচা অদূরের বৃক্ষশির হইতে ডাকিতে লাগিল। অন্ধকারের রাজমন্ত্রী হুতুম হুম হুম আরম্ভ করিল। মলিন সূর্যাস্ত নদীর পরপারে নির্বাপিতপ্রায় চিতাগ্নির মতো মিলাইয়া আসিল, কুয়াশা চাপিয়া আসিল।

ব্রজ রায় বলিল—চল্, একবার মাণিক খুড়োকে দেখে আসি।

কৃষ্ট বলিল—মাণিক খুড়ো? সে তো আজ সাত বৎসর গত হয়েছে!

গ্রামের অবস্থা দেখিয়া এবং শুনিয়া ব্রজ রায়ের বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তবে চল্ ভজহরির দোকানে যাই।

কৃষ্ট বলিল—তার ছেলেটা আছে। দাসও মরেছে।

—তবে চল্ টোলের দিকে যাই!

—সেখানে কেউ নেই! ভট্‌চায মারা যাবার পরে তার স্ত্রী উঠে চ'লে গিয়েছে।

—নীলু ঘোষ?

—সে আছে বটে। কিন্তু সেখানে না যাওয়াই ভালো।

—কেন রে?

—সে একরকম পাগলের মতো হয়েছে।

—কেন?

কৃষ্ট বলিল—সে অনেক কষ্টে একটা দালান গেঁথেছিল, একদিন রাত্রে ভূমিকম্প হয়ে তার দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, নাতনি, নিজের স্ত্রী সব চাপা প'ড়ে মারা গেল! নীলু ঘোষ সেদিন বাড়িতে ছিল না, তাই মরেনি, পরের দিন বাড়ি ফিরে এসে দেখেশুনে সেই-যে পাগল হয়ে গেল, আজও

সারেনি! সারাদিন কেবল বকছে—'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব'—আর হাঃ হাঃ ক'রে হাসছে! লোক দেখলেই ডাকে, বলে, এসো এসো গীতার মাহাত্ম্য শুনে যাও! পরকালে অশেষ পুণ্য! আর ইহলোকে···হাঃ হাঃ হাঃ!

ব্রজ রায় বলিল—এ যে মৃতের রাজ্য হয়ে উঠলো রে।

কৃষ্ট বলিল—তাই তো হ'ল দেখছি।

ব্রজ বলিল—কৃষ্ট, তুই আমার সঙ্গে কাশী চল্। এখানে থেকে আর কাজ নেই।

কৃষ্ট বলিল—দাদা, বিশ্বনাথ আমার কপালে, কাশীপ্রাপ্তি লেখেননি! যে-কটা দিন বাঁচি এখানেই থাকবো।

ব্রজ বলিল—ভাবলাম কবে মরি একবার জন্মস্থানটা দেখে আসি। এখন মনে হচ্ছে না এলেই ভাল হ'ত। কি দেখবো ভেবে এসেছিলাম আর কি দেখলাম! অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে ব'সে সন্ধ্যার রসুনচৌকি শুনি, সম্মুখে দেখি গঙ্গার নীল জলে বেণীমাধবের ধ্বজার ছায়া, কত দেশ-বিদেশের নৌকা যাতায়াত করছে, মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উঠছে, চারদিকে গীতাপাঠ হচ্ছে, কথকতা হচ্ছে, তুলসীদাসের রামায়ণ গান হচ্ছে—কিন্তু আমি কি দেখতাম জানিস—জোড়াদীঘি গ্রাম; আমি কি শুনতাম জানিস—জোড়াদীঘির হাটের কোলাহল, এমনকি নাকে যেন এখানকার ভাট ফুলের গন্ধটা অবধি পেতাম। মুক্তি আমার হয়নি, মুক্তির ইচ্ছাই হয়নি, তা কি বুঝতে পেরেছি? তাই বিশ্বনাথ কৌশলে একবার গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন। নতুবা দশ বৎসর পরে আসতে যাবো কেন? বিশ্বনাথ বুঝিয়ে দিলেন, দেখে আয় তোর স্বর্গের কি দশা হয়েছে!

তারপরে সে আত্মধিক্কারের কণ্ঠে বলিল—আমার মুক্তিও হ'ল না, স্বর্গও গেল।

কৃষ্ট রায় বলিল—দাদা, আমি অত তত্ত্বকথা বুঝি না। আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই. জোড়াদীঘিই আমার থাক্।

ব্রজ বলিল—তাই থাক্। তবু তোর সান্ত্বনা আছে। আমার দুইই গেল। এবার কাশী ফিরে গিয়ে দেখি বিশ্বনাথ দয়া করেন কি না। স্বর্গ তো গেল, এবারে মুক্তি পাই কিনা দেখি।

কৃষ্ট রায় বলিল—স্বর্গ যাবে কেন দাদা? আমার স্বর্গের ধারণা কি জানো? জোড়াদীঘির মতো একখানা পোড়ো গ্রাম, যেখানে সন্ধ্যা না হ'তেই রাত নিযুতি হয়, আর অবিরাম ঝিল্লীধ্বনির মাঝে প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডেকে ওঠে, যেখানে রাতের চেয়ে দিন বেশি নির্জন, যেখানে দিনের চেয়ে রাত্রি অধিক মুখর, যেখানে মানুষে শ্বাপদে এত ঘনিষ্ঠতা যে কেউ কাউকে ভয় করে না, যেখানে অন্ন প্রচুর কেবল অন্নী নেই, যেখানে পলাতকা ভিটেয় হলুদের চাষ, চাষের ক্ষেত অকর্ষিত, যেখানে মানুষের অভাবে রোগে মানুষ মরে না, সেই সর্বজনের পরিত্যক্ত, পরিস্পৃষ্ট, বিস্মৃতপ্রায় একখানা গ্রামই স্বর্গ ব'লে আমার বিশ্বাস। অন্য কোনো স্বর্গে আমি শান্তি পাবো না, অন্য কোনো স্বর্গে আমি যেতে চাই না।

ব্রজ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুই স্বর্গ না পাস শান্তি পেয়েছিস! তবে এখানেই থাক্।

এইরূপে কথা বলিতে বলিতে দুইজনে অন্ধকার পল্লীপথ দিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

২

জোড়াদীঘি সম্বন্ধে কৃষ্ট রায়ের মন্তব্য মোটেই অত্যুক্তি নয়। দশানি ও ছ'আনির বহু-প্রসারিত অট্টালিকাশ্রেণী আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত।

এই ভগ্নস্তূপের উপরে উপরে, ফাঁকে ফাঁকে, যেখানে সুযোগ পাইয়াছে তরুলতা গুল্ম বনস্পতি অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানুষের উত্তরাধিকারীরূপে শৃগাল, শূকর, সর্প এবং চামচিকার দল সেখানে অধিষ্ঠিত। ভগ্নপ্রায় কড়িকাঠগুলাতে চামচিকার দল দিনের বেলায় নিম্নমুখে ঝুলিয়া থাকে,

রাত্রিবেলা তাহারা পাখার ফড় ফড় শব্দে দল বাঁধিয়া ওড়ে, চাঁদের আলোয় মাটিতে তাহাদের ছায়া নড়ে, আর লুব্ধ শৃগালের দল সেই ছায়া শিকারে ক্ষিপ্ত হয়। শূকরের দল কর্কশ ঘুৎকারে নিরেট অন্ধকারকে করাতে চিরিবার আয়াস করে, আর একটানা ঝিঁঝির ঝঙ্কার নতুন মাথুর পালার খঞ্জনী বাজাইতে থাকে। দিনের বেলা সেই ভগ্নপুরী নিশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া থাকে, কেবল দমকা বাতাস খসিয়া-পড়া ঝরোখার বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে করুণ নিশ্বাস ধ্বনিত করিয়া তোলে আর ঝুলিয়া-পড়া দরজা-জানলার পাল্লাগুলি বাতাসে খুট খাট শব্দ করিয়া গভীর সমর্থন জানায়। বহু বর্ষার অবাধ বর্ষণে পথঘাট শ্যামল পিচ্ছিল, মানুষের পা পড়ে না, শৃগাল কুকুর তীক্ষ্ণ নখচিহ্ন রাখিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়, যেখানে চৌধুরী রূপসীরা অপরাহ্ণে বসিয়া চুল বাঁধিত সেখানে একান্তে আজ ঢোলকলমির ফুল ফুটিতেছে, ভাঙা মণ্ডপের দেয়ালে বন্য যূথীর লতা উঠিয়াছে, বাতাসে ছিন্নভিন্ন ফুলগুলি দেবতার শূন্য বেদীর উপরে বর্ষিত হয়। লুব্ধ গোধিকার সশব্দ সঞ্চরণে বিষধর সর্পের দল বিবর আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। ভগ্নস্তূপের গায়ে গায়ে প্রকৃতির শ্যামল প্রলেপ; মানুষের কাজের অসম্পূর্ণতা পূরণের ভার প্রকৃতি লইয়াছে। মানুষের কাজ শেষ হইলে প্রকৃতির কাজ আরম্ভ হয়। ভুলিয়াও জনপ্রাণী সেখানে প্রবেশ করে না, রাখালেরাও নয়। তাহাদের দলচ্যুত গোরুবাছুরও বুঝি এদিকে আসে না। হারাইয়া-যাওয়া গোরু-বাছুর খুঁজিবার উদ্দেশ্যেও গ্রামের লোক এখানে আসিতে চায় না। যেখানে একদা সকলে সানন্দে যাতায়াত করিত, আজ সেই স্থানকে তাহাদের বড়ই শঙ্কা। মানুষ বনকে ভয় করে না, কিন্তু পরিত্যক্ত জনপদকে তাহার বড় ভয়। মানুষ নির্জীব পাষাণমূর্তিকে তো ভয় করে না, তবে নির্জীব মানবদেহটাকে তাহার এত ভয় কেন? পরিত্যক্ত পুরী, শূন্য অট্টালিকা একপ্রকার অপার্থিব ব্যক্তিত্ব লাভ করে, সে শূন্য হইয়াও শূন্য নয়, পরিত্যক্ত হইয়াও অধ্যুষিত, নির্জীব হইয়াও প্রাণবান্। ভূতের ব্যক্তিত্ব তখন তাহাকে অবলম্বন করে।

আবার রাত্রিবেলা দশানির ভগ্নপুরী নূতন ব্যক্তিত্বে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে। তখন সেখানে নানাপ্রকার অলৌকিক শব্দ ধ্বনিত হয়, জোনাকির আলোতে ছায়াময় কাহারা যাতায়াত করে, দেহহীনের পদশব্দ শোনা যায়। শূকরে ঘুৎকার করে, আর চামচিকা ও বাদুড়ের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশকে উচ্চকিত করিতে থাকে। শীতের সন্ধ্যার কুয়াশা-জমা নিশ্বাসরোধী অন্ধকারে অট্টালিকার বিদীর্ণ শিখরে বসিয়া হুতুমপেঁচা গম্ভীর আওয়াজের হাতুড়ি ঠুকিতে থাকে—কালপেঁচা অতীত অভিজ্ঞতার সমর্থনে ডাকিয়া ডাকিয়া মরে। অসংখ্য স্মৃতির স্রোত নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মানুষের জগতের সীমান্তে এই মানব-বিহীন পুরী।

এই বৃহৎ বাড়ির এক প্রান্তে খানদুই খড়ের ঘরে কীর্তিবাবু সপরিবারে বাস করে। তাহার চালচলন দরিদ্রের, কিন্তু প্রাচীরে ঘেরা বলিয়া লোকে তা'র নিদারুণতা জানিতে পায় না। একটুখানি পরিষ্কার জমিতে লাউ-কুমড়োর মাচায় ফল ফলে, একটুখানি শাক-সব্জির বাগান, গোটা কয়েক লঙ্কাগাছে লঙ্কা পাকিয়া লাল হয়।

দশানির দেউড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আর ঘড়ি বাজে না, প্রহরে প্রহরে আর ডঙ্কা বাজে না, ছাপরার দারোয়ানের দল আর সন্ধ্যাবেলা তুলসী-দাসের রামায়ণ গান করে না, কাছারির ঘরে আমলা-গোমস্তার দল নাই, সেখানে পাড়ার লোকের গোরুছাগল বৃষ্টিতে আসিয়া আশ্রয় নেয়। দশানির ভগ্ন শিব-মন্দির প্রণত পূজার্থীর মতো উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ছ'আনির নবীননারায়ণ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। সেখানে অগণ্যের ভিড়ে সে মাথা লুকাইয়াছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের ভাগ্যে সে সান্ত্বনাটুকু জোটে নাই, সে নিজেই একটা ভগ্নস্তূপের মতো পড়িয়া আছে, যদি একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হইতে পারিত! কীর্তিনারায়ণ ভাবে নবীননারায়ণ ভাগ্যবান্! দারিদ্র্যের চেয়েও অধিকতর শোচনীয় অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি।

নবীননারায়ণ কলিকাতায় গিয়া মাথা লুকাইয়াছে—সেখানে কে কাহাকে চেনে, সেখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, স্রোতকে স্রোত ঠেলা মারিতেছে, সেখানে নিত্য নূতনের ভিড়, সেখানে আজকার তলে গতকল্য চাপা পড়িতেছে, সেখানে কান্নাকে হাসি দিয়া লুকাইতে, দুঃখকে সুখের ছদ্মবেশ পরাইতে, অতীতকে বর্তমানে পরিণত করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না। যেখানে নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব, নিত্য নূতন সমস্যা, সেখানে অদ্যতনের কটাহে চিরন্তনের পাক চলিতেছে। কলিকাতা চিরপ্রবহমাণা নদী।

জোড়াদীঘি পুরাতন সরোবর। চারিদিকের কূলে আবদ্ধ, কতকালের সংস্কারে পঙ্কিল, সেখানে অতীত চিরন্তন হইয়া আছে, অদ্য সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না, অতীত সেখানে বর্তমান। সেখানে মাথা লুকাইবার স্থান কোথায়? সেই দীঘিতে পঙ্ক ও পঙ্কজ দুইয়েরই আশ্রয়। সেখানে অতল স্নেহ, অপার করুণা, অগাধ শীতলতা এবং স্নিগ্ধ পঙ্কজ ও গম্ভীর পঙ্ক। বাঙলা দেশের গ্রাম দূর হইতে মধুর, কাছে হইতে কষায়, বাস্তবে মলিন, কল্পনায় উজ্জ্বল। বাঙলার অদৃষ্টাকাশে বাঙলার পল্লী নিষ্কলুষ ধ্রুবতারা! ধ্রুবতারায় কি মরুভূমি নাই, রুক্ষ গিরিমালা নাই, অন্তর্দাহী বহ্নিবাষ্প নাই? কল্পনা ও বাস্তবে কি ভেদ ঘুচিবে না?

নগরগুলি স্বর্ণমৃগীর সন্ধানে প্রধাবিত, পল্লী স্বর্ণপদ্ম ফুটাইয়া নিশ্চল—এ দুইয়ে হেরফের ঘুচিবে কবে? স্বর্ণপদ্মের স্বর্ণ যেমন মায়া, স্বর্ণমৃগের স্বর্ণও তো তেমনি মিথ্যা। তাই বলিয়া দুই-ই কি সমান অবাস্তব? অন্তত শিল্পে মায়ার স্থান আছে, মিথ্যার স্থান কোথায়?

দুর্লভ চৌকিদার নামে একজন মুসলমান জোড়াদীঘিতে বাস করিত। এক সময়ে সে চৌকিদারি করিত। তারপর ফকিরি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। অল্পকালের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল চাকুরির চেয়ে ভিক্ষাতে লাভ বেশি, খাটুনি অনেক কম। তখন সে স্থায়ী-ভাবে ভিক্ষা আরম্ভ করিল এবং এই উপলক্ষ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার স্ত্রী-পুত্র কেহ ছিল না। গ্রামে খানদুই ঘর মাত্র ছিল। গ্রাম ত্যাগ করিবার পরে অল্পকালের

মধ্যেই তাহার ঘর দু'খানা পড়িয়া গেল। তাহার বড় ক্ষতি হইল না, কেন না, গ্রামে সে কখনো কদাচিৎ মাত্র ফিরিত। কালেভদ্রে যখন আসিত, অপরের বাড়িতে আশ্রয় লইত। আহারের অভাবও হইত না, দশানির বাড়িতে আসিয়া পাত পাতিয়া বসিলেই হইল। একবার সে ভিক্ষা করিতে করিতে মক্কা যাইবার মানসে বাহির হইল। সে মক্কা পর্যন্ত পৌছিতে পারিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে জোড়াদীঘিতে আট দশ বৎসর অনুপস্থিত ছিল। এবারে যখন সে গ্রামে আসিল তখন গ্রামের বিরাট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সে তাহার কিছুই জানিত না।

গ্রামে আসিয়া ভাবিল একবার বড়বাবুর সহিত দেখা করা উচিত; সে এখন ফকির হইলেও গ্রামের বাবু তাহার জমিদার তো বটে, তাহা ছাড়া সে যখন গ্রামে আসিত কীর্তিনারায়ণ তাহাকে খানদুই নূতন কাপড়, কয়েকটা টাকা দিতেন। সে কিছুদিন দশানির বাড়িতে চাকুরি করিয়াছিল।

দুর্লভ খিড়কি-দরজা দিয়া কীর্তিনারায়ণের নতুন বৈঠকখানার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কীর্তিবাবু তখন একখানা তক্তপোষের উপরে বসিয়া সংবাদপত্রে মুদ্রিত এক বিজ্ঞাপনের মহিলার নাকের নীচে কালি দিয়া গোঁফ সংযোজন করিতেছিল। দুর্লভ সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই কীর্তিনারায়ণ চমকিয়া উঠিল এবং একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি কাগজ কলম ফেলিয়া ভীত ত্রস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। দুর্লভ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিল, বাবু আর বাহির হইল না, তখন সে একবার চারিদিকের অবস্থা চাহিয়া দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া দিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

দুর্লভ গ্রামে আসিয়া শুনিয়াছিল যে বাবুদের অবস্থা আর আগের মতো নাই — কিন্তু এমন যে হইয়াছে তাহার কিছুই জানিত না। আগে জানিলে কখনই সে যাইত না। দুর্লভ অনেক দেশ অনেক লোক দেখিয়াছে, সংসারের গতিবিধি সে যেমন বোঝে গ্রামের স্থায়ী লোকদের তেমন বুঝিবার কথা নয়। সে বেশ বুঝিতে পারিল বাবু তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় পলায়ন করিল। যাহারা

গ্রামে আছে তাহাদের অভ্যস্ত দৃষ্টির কাছে বাবুর লজ্জা নাই, কিন্তু বহুকাল পরে আগত তাহার দৃষ্টিতে বড়বাবু যে নিজের দারিদ্র্য আবার নূতন করিয়া দেখিল—একথা দুর্লভ বুঝিতে পারিল। তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—হা আল্লা, এ কি করলাম! আর তুমিই বা এ কি করেছো?

সেই দিনই সে জোড়াদীঘি ত্যাগ করিল—আর কখনো সে গ্রামে ফেরে নাই।

নবীননারায়ণ তাহার কলিকাতার বাসায় সারাদিন একাকী বসিয়া থাকে। কীর্তিনারায়ণের মতো তাহার দারিদ্র্য নিশ্ছিদ্র নহে, তাহা হইলে সে কলিকাতায় থাকিতে পারিত না। যতদিন তাহার জোড়াদীঘির বিষয়সম্পত্তি বাড়িঘর অক্ষুণ্ণ ছিল গ্রামের আসক্তি সে কদাচিৎ অনুভব করিত। কিন্তু আজ যখন তাহার সেখানে কিছু নাই বলিলেই হয়, প্রতি মুহূর্তে অন্তরের শিরা-উপশিরার মধ্যে সে গ্রামের টান অনুভব করে। ক্ষতস্থানই অনুভূত হয়। জানালা দিয়া সে দেখিতে পায় পথে অগণ্য পথিক, ট্রাম, বাস্ কতরকম যানবাহনের অবিরল আনাগোনা। সে দেখিতে পায় কৃষ্ণচূড়ে গুলমোরের একটানা রক্তিমা, আরো উচ্চে অদৃশ্য কারখানার চিমনির ধোঁয়ার প্রলেপবিস্তার, তারও উচ্চে নির্মেঘ নীলিমায় প্রসারিত-পক্ষ চিলের সন্তরণ! সে দেখিতে পায় নদীর পরপারে বন ঝাউগুলি বাতাসে দুলিতেছে, গোটা দুই বক এক পা এক পা করিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে, কচুরিপানার প্রগাঢ় শ্যামলের উপরে বেগুনী ফুলের গুচ্ছ! তাহার চোখে ভাসিয়া ওঠে টোকা-মাথায় কৃষাণ লাঙলের উপরে ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়া চাষ করিতেছে, মাঠের অপর প্রান্তে একখানা বোঝাই গোরুরগাড়ি গাছপালার আড়ালে একবার লুক্কায়িত একবার প্রকাশিত; সে দেখিতে পায় দূরবর্তী বটগাছের তলে জনকয়েক লোক আসিয়া মাথার মোট নামাইয়া বসিল।

তাহার কানে আসে জেলেনৌকার বৈঠা ফেলিবার ছপাছপ শব্দ, মোটরের

হুঙ্কার, হাটের কোলাহল, 'ওরে আজ কি মাঠ থেকে গোরু আনতে হবে না', 'টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফ, বড় গোলমাল!' কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্র তন্তুতে তাহার চিন্তার বয়ন চলিতে থাকে। জোড়াদীঘির প্রেত তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে! সে শুনিতে পায়—অনেক পড়েছো, এবার ওঠো। সে চমকিয়া উঠিয়া দেখে—মুক্তামালা।

মুক্তামালা বলে—প'ড়ে প'ড়েই দেখছি শরীর নষ্ট করবে।

নবীন বলে—কই, পড়লাম আর কোথায়?

তাহার কথা মিথ্যা নয়, বইখানা উপুড় করিয়া রক্ষিত, বইয়ের কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে।

মুক্তামালা তাহার স্বামীর নীরব দুঃখের সমস্ত ইতিহাস জানে, কিন্তু কখনো সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, কারণ তাহাতে নবীনের দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। নবীন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সে এড়াইয়া যায়।

আজ নবীন বলিল—মুক্তি, নিজের দোষে সব নষ্ট করলাম!

মুক্তামালা বলিল—কি যে বলো! আমাদের ছেলেমেয়ে নেই, এত বিষয়-সম্পত্তির কি-বা প্রায়োজন ছিল?

নবীন বলে—নষ্ট করবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মুক্তি, তুমি বুঝবে না পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করবার কি দুঃখ!

মুক্তামালা বলে—তুমি তো ভালো করতেই গিয়েছিলে—

নবীন বলে—ভালো করবার পন্থা না জেনে ভালো করতে গিয়েছিলাম!

প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে মুক্তামালা একখানা টাইমটেব্‌ল আনিয়া নবীনের সম্মুখে ফেলিয়া বলে—নাও, দেখো, ছোটনাগপুর কিংবা সাঁওতাল পরগনায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাক্‌।

নবীন নড়ে না। আগের উৎসাহ তাহার নাই।

মুক্তামালা বলে—সেখানে খরচ অনেক কম।

খরচের প্রশ্নে নবীন সক্রিয় হইয়া ওঠে। মুক্তামালার অলঙ্কারগুলি সে নষ্ট করিয়াছিল, আর উদ্ধার করিতে পারে নাই। মুক্তামালার মুখে টাকার

প্রশ্নের সে সঙ্কোচ অনুভব করে। সে তাড়াতাড়ি টাইমটেব্‌ল দেখিতে বসে।

মুক্তামালা বলে—বাদলিও সঙ্গে যাবে।

৩

ছ'আনির ভগ্ন বাড়িতে একাকী জগার মা বাস করে। নবীন তাহাকে কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল—জগার মা বলিল—না, বাবা সে হবে না। যে-কটা দিন বাঁচি, এখানেই থাকবো।

তারপরে স্বগতভাবে বলে—কর্ত্রা মরবার সময়ে বাড়ির ভার আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, আমি কি অন্যখানে যেতে পারি।

এই বলিয়া সে চাবির গোছা নাড়ে।

জগার মা চাবির গোছা লইয়া একখানা লাঠি ভর করিয়া বাড়ির ঘরদোর তদারক করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা হইলে একটা তেল-প্রদীপের আলোয় দেখিয়া বেড়ায় দরজাগুলি বন্ধ আছে কি না! অধিকাংশ ঘরের দরজাই আছে—তাহার বেশি আর কিছু নাই। কোনো দরজা খোলা দেখিলে সন্তর্পণে সে চাবি আঁটিয়া দেয়। প্রাচীর-ভাঙা, ছাদ-ধ্বসিয়া-পড়া দরজায় তালা বন্ধ করিতে করিতে সে বলে—যতদিন জগার মা বেঁচে আছে, তোমার বাড়ি-ঘর খোয়া যাবে না কর্ত্রী, সব ঠিক থাকবে।

গাঁয়ের লোকে বলে বুড়ি পাগল হয়ে গিয়েছে।

কথাটা কখনো কোনো সূত্রে তাহার কানে আসিলে সে বলে—পাগল হয়ে গিয়েছি! কই কোনো পাগলের চাবির গোছা এমন ঠিক থাকে? কেউ আমার কাছে থেকে চাবির গোছা ঠকিয়ে নিক তো! দেখবো তারা কেমন মাথা-ঠিক লোক! পাগল হয়ে গিয়েছে! জগার মা পাগল হয়ে গিয়েছে!

তারপরে সে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—নিন্দুকে বলে ঘরবাড়ি সব ভেঙে গিয়েছে! হাঁ, একটু পুরনো হয়েছে। একি তোদের

হঠাৎ-নবাবের বাড়ি যে ঝক ঝক করবে? কত কালের পুরনো ঘর—পুরনো টাকাতেই ময়লা পড়ে।

তারপরে হাসিয়া বলে—পাগলই বলো আর ছাগলই বলো, চাবির গোছা আমার ঠিক আছে।

তারপরে পরলোকগত কর্ত্রীর উদ্দেশে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলে—তোমার কোনো ভয় নেই কর্ত্রী! যতদিন জগার মা আছে তোমার বাড়ি-ঘর-দোর কিচ্ছু খোয়া যাবে না।

সন্ধ্যা আসন্ন হইলে তেল-প্রদীপ লইয়া লাঠি ঠুকঠুক করিয়া ঘর-দ্বার পর্যবেক্ষণ করিতে সে বাহির হয়। দরজার কাছে মাটিতে তেল-প্রদীপটি রাখিয়া গুচ্ছ হইতে একটা চাবি বাছিয়া লয়, সেটা চোখের অত্যন্ত নিকটে ধরিয়া একবার দেখে, তারপরে মর্চেধরা কুলুপে আচ্ছা করিয়া ঘুরাইয়া আপন মনে বলে—ঠি—ক আছে! তারপর আবার ক্ষীণ আলোয় ভাঙাবাড়ির দেয়ালে ভৌতিক ছায়া নিক্ষেপ করিয়া সে অন্য ঘরের দিকে রওনা হয়। সবগুলি ঘর না দেখিয়া তাহার বিশ্রাম নাই।

পাড়ার কোনো মেয়ে জগার মার সহিত দেখা করিতে আসিলে বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিত, চীৎকার করিয়া ডাকিত—ও বিন্দি, ও ক্ষান্ত, ও সৌদামিনি! নাঃ কেউ সাড়া দেয় না। সবাই জানিত, চৌধুরীবাড়ির ঐশ্বর্য যেখানে, এইসব ভূতপূর্ব দাসীর দলও সেইখানে গিয়াছে। সবাই জানিত, কেবল বুড়ি স্বীকার করিত না। মনে মনে সে কি সত্যই জানিত না?

একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া দিতে দিতে বলিত, নাঃ পোড়ারমুখীরা পাটি, মছলন্দ সব কোথায় যে রেখে গিয়েছে, আমি বুড়ো মানুষ কি খুঁজে পাই!

সবাই বলিত, থাক্ দিদি, আমরা এখানেই বসছি, আমারা গরিব মানুষ, মছলন্দে আমাদের কি দরকার?

বুড়ি বলিত, তোদের যেন দরকার নেই, তাই ব'লে চৌধুরীবাড়িতে কি মাটিতে বসতে দিতে পারি?

সন্ধ্যাবেলা কেহ আসিলে বুড়ি বলিত, শোন তো দিদি, দেউড়ির চাতুখোরগুলো ডঙ্কা বাজাচ্ছে কি না! আমার আবার কানের যে দশা হয়েছে কিছুই শুনতে পাই না।

সবাই বলিত, দিদি ডঙ্কা বাজাচ্ছে ব'লে বাজাচ্ছে--কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল। একটু থামতে ব'লে দাও।

বুড়ি হাসিয়া বলিত—আমি থামতে বললেই কি থামবে, চৌধুরীবাড়ির নিয়ম মতো বাজবেই। আজ আড়াই শ' বছর এক নিয়মে দেউড়িতে ডঙ্কা বেজে আসছে।

দেউড়িতে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে—আর ডঙ্কার ভাঙা খোলটাতে বৃষ্টির জল জমিয়া আছে। এমনিভাবে বুড়িতে আর গাঁয়ের লোকে একপ্রকার নিদারুণ অভিনয় চলিত। সবাই পরস্পরকে শুধাইত, বুড়ি কি বুঝিতে পারে না? কেহ বলিত, নব্বই বছর বয়সে বোধশক্তি থাকে না; কেহ বলিত, বুড়ি ঘাগি সব বোঝে। কিন্তু কেহই তাহার ভুল ভাঙাইত না। সেই জনশূন্য ধনশূন্য, ভগ্নপুরীতে চৌধুরীবাড়ির লুপ্ত মহিমাকে এই বৃদ্ধা সযত্নলালিত মোহ দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

তারপরে একদিন, এই উপন্যাসের ঘটনাসীমার অনেক দিন পরে, বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। শূন্য বাড়ির জীর্ণ এক কন্থার উপরে শুইয়া নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা বিকারের ঘোরে চীৎকার করিতে লাগিল—সব গেল কোথায়? পোড়ার-মুখোঁরা সব গেল কোথায়? এখনি যে কর্ত্রী-ঠাকরুন আসবে?

তারপরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া চীৎকার করিত—ওরে মছলন্দখানা পেতে দে—পেতে দে, কর্ত্রী এসেছেন। এই দেখো বউ, তোমার চাবির গোছা আমি সাবধানেই রেখেছি, কাউকে দিইনি। এই নাও, তোমার চাবি তুমি নাও। তোমার চাবি তুমি নাও।—এই রকম চীৎকার করিতে করিতে তাহার মুষ্টি হইতে চাবির গোছা মাটিতে পড়িয়া ঝন্ করিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িল।

এই প্রথমবার চাবির গুচ্ছ তাহার মুষ্টিচ্যুত হইল, জীবিত থাকিতে চাবির

গোছা সে কাহারো হাতে দেয় নাই, মৃত্যুকালে বুঝি স্বয়ং কর্ত্রীকেই দিয়া গেল।

জগার মার মৃত্যুতে এইবার সত্য সত্যই ছ'আনির ঐশ্বর্যদীপ নিভিল। যাহা নাই, কেবল পরম বিশ্বাসের বলেই যেন তাহাকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

৪

ব্রজ রায়ের কাশীযাত্রার পূর্বরাত্রে তাহার ও কৃষ্ট রায়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। দুইজনেই অপত্নীক। রান্না ও আহার তাহাদের শেষ হইয়াছিল, জিনিসপত্র বাঁধাছাদাও অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, এখন শয়নের আগে দুইজন বসিয়া গল্প করিতেছিল।

কৃষ্ট রায় বলিল—দাদা, তুমি কাশীতে থাকো, অনেক সাধুসন্ন্যাসী মানুষ দেখেছো, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া সে শুধাইল—আচ্ছা, দাদা, একটা গাছ কাটলে একটা গ্রাম ধ্বংস হবে কেন ?

ব্রজ রায় বলিল—ভাই, কাশীতে যে সবাই সাধু সজ্জন এমন নয়। তবে হাঁ, মস্ত শহর, অনেকদিন আছি, নানা রকম লোক দেখেছি বটে।

সে বলিতে লাগিল, আমি যে বাসায় থাকি সেখানে আরো কয়েকজন ভদ্রলোক থাকেন। তাঁদের মধ্যে একজন সরকারী চাকুরে আছেন, পেন্সন নিয়ে কাশীবাস করছেন। এক সময়ে তিনি সরকারী বন-বিভাগে কাজ করতেন। তাঁর কাছে বনের গল্প শুনতে পাই—জন্তু-জানোয়ারের, পাহাড়ী লোকের। একদিন তাঁকে শুধিয়েছিলাম—আচ্ছা, সরকারের এত টাকা খরচ ক'রে বন-জঙ্গল রক্ষা করবার দরকার কি ? তিনি বললেন—বলেন কি ! এ'কে শুধু সরকারী খেয়াল মনে করবেন না। তারপরে বললেন—একটা কথাই ধরুন না কেন, এই বনগুলো আছে ব'লে আপনাদের নদীনালাগুলো আছে। এই কথা শুনে আমরা—আসরে আরো লোক ছিল—অবাক হয়ে বললাম, সে আবার কি ?

তিনি হেসে বললেন—এই তো। আপনারা না জেনে মিছিমিছি সরকারকে দোষ দিচ্ছেন। পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোকে রক্ষা না করলে পাহাড়ের বালু আর মাটি বর্ষায় গ'লে গ'লে পাহাড়ের নীচেকার নদী সব পলি প'ড়ে ভ'রে উঠবে। এমন কত উঠেছে। কত গভীর নদী শুকনো খালে পরিণত হয়ে গিয়েছে।—কথাটা আমাদের কাছে নতুন, কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

এই পর্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া বলিল—তবেই দেখো, গাছ কাটলে নদী ভরাট হয়ে যায়, নদী ভরাট হয়ে গেলে চারিদিকের জনপদ শুকিয়ে ওঠে, ম্যালেরিয়া দেখা দেয়।

কৃষ্ণ রায় সব শুনিয়া বলিল—বেশ, তা না হয় হ'ল। কিন্তু জোড়াদীঘির বুড়ো অশথ আর তেমন নয়।

ব্রজ রায় বলিল,—তেমন নয় বটে, কিন্তু যে গাছ কাটলে জনপদ শূন্য হয়, সেই বংশেরই তো গাছ। একদল মানুষ মারলে দোষ, আর একটা মানুষ মারলে দোষ নয়?

কৃষ্ণ রায় বলিল,—তবে দাদা, তুমি বিশ্বাস করো যে, বুড়ো অশথ কাটবার ফলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল?

ব্রজ রায় বলিল,—এইবারে মুস্কিল বাধালে। দূরে থেকে অনেক জিনিস বিশ্বাস করি, কাছে গেলে গোল বেধে যায়। যদি কারো মুখে শুনতাম বা কোনো বইয়ে পড়তাম যে, একটা প্রাচীন গাছ কাটবার ফলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল, তবে নিশ্চয় অবিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এ যে একেবারে কাছের ঘটনা।

—তাই অবিশ্বাস করছো?

ব্রজ রায় বলিল—অবিশ্বাস করবো কেমন ক'রে? চোখের সম্মুখে দেখছি যে।

—তবে কি?

ব্রজ রায় বলিল—কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করি, তার মানে বিশ্বাস করি যে,

আকাশের গ্রহগুলোর প্রভাব মানুষের জীবনের উপরে কাজ করছে। আর গ্রামের একটা গাছের প্রভাব গ্রামের উপরে থাকবে তা অবিশ্বাস করবো কোন্ বিশ্বাসের বলে ?

কৃষ্ট রায় শুধাইল—এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় ?

ব্রজ রায় বলিল—ভাই, অনেক জেনে বুঝেছি যে সব জানা যায় না। মানুষের জীবন যদি গণিতের পুঁথির মতো নিছক জানা দিয়ে তৈরি হ'ত, তবে কি বিপদই না হ'ত। কোথাও একটুখানি ফাঁক না থাকলে নিশ্বাস ফেলবো কোন্ পথে ?

কৃষ্ট রায় বলিল—সেই পথেই যে ঝড় আসে।

ব্রজ রায় বলিল—বলো বাতাস আসে। আমিও তো সেই কথাই বলছি—জীবনধারণের বাতাস আসে।

ক্রমে আলোচনার সূত্র এমন স্থানে আসিয়া পড়িল যেখানে জল অনেক ! ব্রজ রায় ও কৃষ্ট রায়ের পক্ষে দুস্তর। অগত্যা তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ট বলিল—দাদা, একটা কথা মনে হচ্ছে. হেসো না যেন। মানুষ মরলে তার অস্থি গঙ্গাতে দেয়, নইলে তার মুক্তি হয় না। আমাদের বুড়ো অশথ তো গাছ মাত্র ছিল না, তুমি কাশী যাবার সময়ে তার এক টুকরো কাঠ নিয়ে যাও, কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিয়ো।

ব্রজ রায় বলিল—অশথ কাটা হয়েছে সে কতদিনের কথা। তার কাঠ কি এখনো আছে ?

কৃষ্ট রায় বলিল—থাকাই সম্ভব। সে গাছ কেউ সরায় নি। কারণ কাটবার পরদিন থেকেই বাবুদের দাঙ্গা বেধে উঠলো। যেখানকার গাছ সেখানেই প'ড়ে আছে।

ব্রজ বলিল,—তাতে আর আপত্তি কি। কাল সকালে উঠে দু'জনে যাবো। গঙ্গায় দিলে ভালো না হোক, মন্দ হবে না।

কৃষ্ট রায় বলিল,—ভালো হ'তেও বাধা নেই। এইমাত্র তুমি তো বললে, কে থোক কি হয় কে জানে।

মিশাইয়া যায়, চৌধুরীগণ একদা যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল—মানবজীবন-স্রোতে তাহা তেমনি ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—যে মানবজীবন-স্রোতের স্বাভাবিক গতি ওই কৃষাণের, রাখালের, পথিকের জীবনে অনাড়ম্বরলীলায় প্রবাহিত।

সমাপ্ত